জাহাঙ্গীরনামা

শচীন্দ্রলাল রায়
অধ্যাপক সোমেন্দ্রলাল রায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৫
—আট টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : শ্রীঅজিত গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

শচীন্দ্রলাল রায়ের লেখা—

দাবী দাওয়া
নেশার ঘোরে
গেঁয়ো
জহর ও অমৃত
রক্তের সম্বন্ধ
কমল বন
বাবরের আত্মকথা
বাবরনামায় ভারতকথা

সোমেন্দ্রলাল রায়ের লেখা—

A short history of the far East
A short history of the middle East
মুর্শিদাবাদ পরিচিতি
মুর্শিদাবাদের কথা ও কাহিনী
বর্ণমালার জন্মকথা (যন্ত্রস্থ)

জাহাঙ্গীরনামা

রাজ্যাভিষেক

[তাঁকেই—যাঁর নাম সমস্ত অস্তিত্বশীল পদার্থের শীর্ষে লেখা, যাঁর মহিমাগাথা জগৎ-প্রাচীরে ও বিশ্ব-ফটকে খোদাই করা,—সেই শাশ্বত পরিকল্পককে যিনি একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ করে মহাশূন্যের বুকে স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও জীবনী-শক্তির বীজ সৃষ্টি করেছিলেন,—সেই সর্বশক্তিমান স্থপতিকে যিনি আমাদের মাথার ওপর একের পর এক নভোস্তর বিছিয়ে রেখেছেন ও তাঁর শক্তির ঐশ্বর্যে এই ভূগোলক মণ্ডিত করে রেখেছেন, তাঁরই প্রতি আমাদের যতিহীন প্রশংসাবাণী এবং অসীম কৃতজ্ঞতা নিবেদিত হোক।

আর আমাদের ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদ—যিনি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সব চেয়ে মহান, যিনি মানবজাতিকে ভ্রমের কুহকজাল থেকে মুক্ত করে সত্য ও কর্তব্য-পরায়ণতার মহান পথে চালিত করেছেন, যাঁকে আল্লা দান করেছেন সমস্ত পার্থিব ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতা ও অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে শীর্ষ স্থান, যীশু স্বয়ং এনেছেন যাঁর শুভ আগমনবার্তা, ইজরাইলের সেই মহান বিধান-বিদ্, ঈশ্বর-বিঘোষিত পয়গম্বর যাঁর স্বর্গীয় আলোক-ধারা থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ আহরণ করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে জানাই অগণিত প্রণতি।]

আল্লার অসীম অনুগ্রহে হিজরি ১০১৪ সনে, জামাদা-স্-সানি মাসের ২০শে তারিখ, বৃহস্পতিবার (ইংরাজি ১৬০৫, ২৪শে অক্টোবর) আমার আটত্রিশ বছর বয়সে রাজধানী আগ্রায় সিংহাসনে উপবেশন করি।

আমার পিতার আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্তানই জীবিত ছিল না। তিনি দরবেশ ও সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে অনবরত এই প্রার্থনাই জানাচ্ছিলেন যে তাঁরা যেন আল্লার দরবারে এই আরজি পেশ করেন যাতে তাঁর একটি পুত্র রক্ষা পায়। খাজা মুইনউদ্দিন চিস্তি ভারতবর্ষের সাধু ফকিরদের শিরোমণি ছিলেন। আমার পিতা মনে করেছিলেন যে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তিনি তাঁর পবিত্র আস্তানায় নিজে হাজির হবেন। তিনি শপথ করেছিলেন যে যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন তাহলে তিনি দীনহীনের মত আগ্রা থেকে পদব্রজে ১৪০ ক্রোশ দূর মহামান্য চিস্তির পবিত্র সমাধিস্থলে গমন করবেন।

হিজরি ৯৭৭ সনে রবিউল আওয়াল মাসের ১৭ই তারিখ (৩১শে আগস্ট,

১৫৬৯) বুধবার, দিনের সাতঘড়ি পার হওয়ার পর যখন তুলারাশি ২৪ ডিগ্রিতে, সেই সময় সর্বশক্তিমান আল্লা তাঁর গুপ্ত শূন্য স্থান থেকে এই পৃথিবীতে আমাকে পয়দা করলেন।

যে সময় মাননীয় পিতা একটি পুত্রসন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, সেই সময় সেখ সেলিম নামে একজন দরবেশ—যিনি সর্বদাই আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এবং জীবনের নানাস্তর অতিক্রম করে যিনি দিব্য অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন—আগ্রা জেলায় সিক্রি নামে একটি পল্লীগ্রামের কাছে এক পাহাড়ের ওপর বাস করছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের তাঁর ওপর অসীম বিশ্বাস ছিল। আমার পিতা দরবেশদের ওপর অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। একদিন ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কটি পুত্রসন্তান হবে। সেখ জবাবে বলেন—সেই মহান দাতা যিনি মুখ ফুটে না বললেও মনের ইচ্ছা পূরণ করেন তিনি তোমাকে তিনটি পুত্র দান করবেন। পিতা বললেন—আমি এই শপথ করছি যে তোমার অনুগ্রহের জোরে আমার প্রথম পুত্র জন্মালে তাকে আমি তোমার নামে সঁপে দেব যাতে তোমার আশীর্বাদ ও দয়া তার রক্ষক হয়। সেখ তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে বলেন—আমি তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আরও বলি তোমার পুত্র জন্মালে আমি আমার নিজের নাম তাকে দেব।

মায়ের প্রসবকাল উপস্থিত হলে পিতা তাঁকে সেখের আবাসে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানেই আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের পর আমার নাম দেওয়া হয় সুলতান সেলিম। কিন্তু আমার বাবাকে তাঁর সুরাপানের অবস্থাতেই হোক অথবা তাঁর স্বাভাবিক শান্ত অবস্থাতেই হোক কখনই আমাকে মহম্মদ সেলিম অথবা সুলতান সেলিম বলে ডাকতে শুনিনি। সব সময়ই ডাকতেন সেখ বাবা বলে। আমার মহামান্য পিতা আমার জন্মস্থান সিক্রিকে তাঁর ভাগ্যের দ্যোতক মনে করে সেখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। চোদ্দ-পনেরো বছরের মধ্যে হিংস্র জন্তুপূর্ণ সেই পাহাড়ী জায়গাটি নানা সুশোভিত উদ্যান, অট্টালিকা, উচ্চ জমকালো প্রাসাদ এবং নানা মনোহর স্থানে পূর্ণ হয়ে উঠলো। গুজরাট জয়ের পর এই স্থানের নাম হলো ফতেপুর।

আমি সম্রাট হওয়ার পর রুমের সম্রাটের রীতি অনুসারে আমার নাম পরিবর্তন করার ইচ্ছা হলো। আমি যেন আল্লার গুপ্ত জগৎ থেকে একটা প্রেরনা লাভ করলাম। যখন রাজার কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে বশে রাখা—তখন

আমার নাম হওয়া উচিত জাহাঙ্গীর অর্থাৎ পৃথিবীর অধীশ্বর এবং আমার সম্মানজনক পদবী হওয়া উচিত—নুরউদ্দিন, কারণ আমার সিংহাসনে প্রথম উপবেশনকালে মহান আলোর উৎস সূর্য তুঙ্গস্থানে অবস্থান করে পৃথিবীতে উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি যখন সম্রাট-পুত্র ছিলাম তখন ভারতবর্ষের সাধুসন্তদের কাছে শুনেছিলাম যে সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর কোনও এক নুরউদ্দিন এই সাম্রাজ্যের শাসক হবে। সেই জন্য আমার নাম ও পদবী নিলাম—নুরউদ্দিন জাহাঙ্গীর পাদসা। এই ব্যাপারটি আগ্রায় ঘটেছিল—সুতরাং সেই স্থানের কিছু বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

হিন্দুস্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধ শহরগুলির মধ্যে একটি প্রধান শহর আগ্রা। যমুনা নদীর তীরে একটি পুরাতন দুর্গ ছিল এইখানে। আমার জন্মের পূর্বেই পিতা পুরাতন দুর্গটি ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে কাটা লাল পাথরে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন—যার তুল্য আর একটি—যাঁরা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন তাঁরা আর কোথায়ও দেখেননি। দুর্গটি নির্মাণ করতে পনেরো-ষোলো বছর লেগেছিল। দুর্গটির চারটি ফটক, দুইটি সৈন্যদের বহির্গমনের জন্য। এটি নির্মাণ করতে পঁইত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়—যা বর্তমান পারস্যের মূল্যমানে এক লক্ষ পনেরো হাজার 'তুমান' এবং তুরাণের মুদ্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ 'খানি'র সমান। নগরটি যমুনা নদীর দুই তীর ব্যাপী। পশ্চিম তীরেই জনবসতি বেশী। এদিকে জনপদের বিস্তৃতি সাত ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশ। অপর তীরে অর্থাৎ পূর্বতীরের জনঅধ্যুষিত অঞ্চল দৈর্ঘ্যে এক ক্রোশ এবং প্রস্থে আধ ক্রোশ। এই নগরের অট্টালিকার সংখ্যা ইরাক, খোরাসান ও মাওয়ারাণনাহার (ট্রান্স্ অক্সিয়ানা)—এই তিনটি দেশের সমস্ত নগরে যতগুলি অট্টালিকা আছে তার সংখ্যা যোগ করলে যা হয় তার সমান। এখানে অনেকেই তিন-চারতলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। এখানকার জনসংখ্যা এমন বিপুল যে গলিতে এবং বাজারে গা বাঁচিয়ে নড়াচড়া করাই কঠিন। এই নগরের পূর্বদিকে কনোজ, পশ্চিমে নাগর, উত্তরে সম্বল এবং দক্ষিণে চান্দেরি।

হিন্দুদের গ্রন্থে লেখা আছে—কালিন্দ্ নামে একটি পাহাড় থেকে যমুনা নদীর উৎপত্তি। অত্যধিক শীতের জন্য এখানে কোনও মানুষ যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই নদীর উৎসস্থল খিজরাবাদ পরগণার নিকটস্থ একটি পর্বত।

আগ্রার আবহাওয়া গরম ও শুষ্ক। চিকিৎসকরা বলেন যে এখানকার

হাওয়া মনে অবসাদ এবং দেহে দুর্বলতা আনে। যাদের শ্লেষ্মার ধাত এবং যারা মনমরা প্রকৃতির তারা ছাড়া এখানকার আবহাওয়া আর কারও পক্ষে সহ্য হয় না। এই জন্যই এই রকম ধাত ও স্বভাবের জন্তুরা যেমন হাতী, মোষ এবং এই জাতীয় প্রাণীর পক্ষে জায়গাটি উপযুক্ত।

লোদি আফগানদের রাজত্বের আগে আগ্রা একটি জনবহুল শহর ছিল। এখানকার একটি দুর্গের বর্ণনা কবি মামুদের একটি গীতি কবিতায় পাওয়া যায়। গজনির স্থলতান মামুদের পুত্র মাস্থদ, তাঁর পুত্র স্থলতান ইব্রাহিম, তাঁর পুত্র মামুদের এই দুর্গজয়ের প্রশস্তিরূপে তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন।

"ধূলির আস্তরণে ঢাকা আগ্রা দুর্গ দেখা গেল—
যেন একটি পর্বত,
দুর্গ-শীর্ষের প্রাকার যেন পর্বতের চূড়া।"

যখন সিকেন্দার লোদি গোয়ালিয়র আক্রমণ করার মতলব করেন সেই সময় তিনি স্থলতানদের রাজধানী দিল্লী থেকে আগ্রায় আসেন। সেই সময় থেকেই আগ্রার জনসংখ্যা ও সমৃদ্ধি বেড়ে যায়, আর সেই সময় থেকেই দিল্লীর স্থলতানদের রাজধানী হয় আগ্রা। সর্বশক্তিমান আল্লা ভারতের শাসনভার এই বিখ্যাত পরিবারের হাতে ন্যস্ত করলে, ভূতপূর্ব সম্রাট বাবর সিকেন্দার লোদির পুত্র ইব্রাহিমকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত এবং হিন্দুস্থানের রাজাদের শীর্ষস্থানীয় রাণা সঙ্গকে পরাজিত করার পর যমুনা নদীর পূর্ব তীরে একটি উর্বর স্থান নির্বাচিত করে একটি স্থন্দর উদ্যান (চারবাগ) নির্মাণ করেন। তার সৌন্দর্য ম্লান করতে পারে এমন উদ্যান খুব কমই আছে। তিনি এই বাগানের নাম দেন 'গুলআফসান্' (পুষ্পঝরা)। এই বাগানের মধ্যে একটি ছোট্ট অট্টালিকা নির্মাণ করেন কাটা লাল পাথর দিয়ে। তার এক পাশে মসজিদ নির্মাণ শেষ করে মনে করেছিলেন এখানে একটি বড় প্রাসাদ তৈয়ার করবেন। তাঁর সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করার আর সময় পাননি।

এই আত্মকথায় যেখানে 'সাহিব কিরাণি' কথাটির উল্লেখ থাকবে সেটা আমির তাইমুর গুরগানের উদ্দেশ্যে লেখা বুঝতে হবে। তেমনি 'ফারদুস মাকানি' হচ্ছেন বাবুর পাদ্সা। 'জন্নত আসিয়ানি' হুমায়ুন পাদ্শা, 'আরস্ আসিয়ানি' হচ্ছেন আমার মহামান্য পিতা জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর পাদ্সা গাজি।

আগ্রা ও তার পাশাপাশি জায়গায় তরমুজ, আম ও অন্যান্য ফল বেশ ভাল জন্মায়। আমি আমের খুব ভক্ত। আমার পিতা (আরস্ আসিয়ানি)-র

রাজত্বকালে অন্য দেশের যে সব ফল তখনও ভারতে জন্মাতো না তাও এখানে পাওয়া যেত। নানা রকমের আঙ্গুর—সাহিবি, হাব্‌সি, কিস্‌মিসি কোনও কোনও শহরে পাওয়া যেত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লাহোরের বাজারে আঙ্গুর পাকার সময় প্রত্যেক রকমের ও জাতের আঙ্গুর বিক্রি হয়। ফলের মধ্যে একটি—যা এ দেশের লোকে বলে আনানস্ (আনারস)—অত্যন্ত সুগন্ধি ও সুস্বাদু। ফলটি এ দেশের না হলেও এখন হাজারে হাজারে আগ্রার গুলআফসান উদ্যানে জন্মাচ্ছে।

সুগন্ধি ফুলের কথা বলতে গেলে যে কেউ সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার ফুলের চেয়ে ভারতবর্ষের ফুলের গন্ধই বেশী পছন্দ করবে। এখানে এমন অনেক ফুল আছে যার সঙ্গে পৃথিবীর কোনও ফুলেরই তুলনা চলে না। প্রথম হচ্ছে—চম্পা। এই ফুলের গন্ধ অত্যন্ত মধুর। দেখতে অনেকটা জাফরান (কুঙ্কুম) ফুলের মত। রং—শ্বেত আভাযুক্ত পীত। এই ফুলের গাছ সুসমঞ্জস ও বড়, শাখা-পত্র-পল্লবে শোভাময় এবং ছায়াবহুল। যখন ফুল ফোটে, একটা গাছের ফুলেই সারা বাগান গন্ধে ভরে যায়।

চম্পাকে হার মানায় কেওড়া ফুল। এই ফুলের গঠন ও আকৃতি বিশেষ ধরনের। এই ফুলের গন্ধ এমন তীব্র যে কস্তুরির গন্ধও এর কাছে পরাস্ত হয়। আর এক জাতের ফুল হচ্ছে—রাইবেল। গন্ধে সাদা জুঁই ফুলের মত। এই ফুলের দুই বা তিনটি পাঁপড়ি। আর এক জাতের ফুল হচ্ছে—মুলসরি (বকুল)। এই ফুলের গাছও দেখতে সুন্দর, সুষমাময় এবং ঝাপড়া। ফুলের গন্ধও খুব চমৎকার। আর এক জাতের ফুল—কেতকী। স্বভাবে কেওড়ার মত। কেওড়ার কাঁটা আছে কিন্তু কেতকীতে কাঁটা নাই। তা ছাড়া, কেতকী পীতাভ কিন্তু কেওড়ার রং সাদা। এই দুই জাতের ফুল এবং চামেলি—যা পারস্য অথবা আফগানিস্থানের শ্বেত জুঁইয়ের মত—যা থেকে এখানকার লোক সুগন্ধি তেল ও নির্যাস তৈয়ার করে। আরও বহু জাতের ফুল আছে যার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখানে গাছের মধ্যে আছে সাইপ্রেস (ঝাউ-জাতীয়), দেবদারু, চনার, সাদা পপলার এবং উইলো। এসব গাছের কথা হিন্দুস্থানের কেউ আগে ভাবতেও পারে নি। এখন এসব গাছ প্রচুর জন্মাচ্ছে। চন্দন গাছ যা জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে দেখা যেত—তা এখানকার বাগানে এখন ভালই জন্মাচ্ছে।

আগ্রার অধিবাসীরা হাতের কারুকাজ শেখার এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের বিশেষভাবে চেষ্টা করে। নানা ধর্ম ও মতের প্রচারক এই শহরে বসবাস করার জন্য জমায়েত হয়েছে।

*

* *

আমার রাজ্যাভিষেকের পর আমার প্রথম আদেশ হলো—ন্যায়-বিচার-শৃঙ্খল ঝুলানো। এর উদ্দেশ্য এই যে যদি ন্যায়বিচারের জন্য যে সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত আছে তারা যদি কোনও বিচারপ্রার্থীর অভিযোগের তদন্তে দেরি করে অথবা কপটতা অবলম্বন করে তাহলে সেই বিচারপ্রার্থী এখানে এসে শৃঙ্খলে নাড়া দিলে যে শব্দ হবে তা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে।

ন্যায়-শৃঙ্খলের ব্যাপারটি হলো এই। আদেশ দিলাম—ত্রিশ গজ লম্বা একটি খাঁটি সোনার শৃঙ্খল তৈয়ার করে তাতে ষাটটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিতে হবে। এর ওজন হলো ভারতীয় চার মণের সমান যা ইরাকের বিয়াল্লিশ মণ। শৃঙ্খলের এক প্রান্ত বাঁধা হলো আগ্রা দুর্গের শা' বুর্জের ওপরের প্রাচীরের ফোকরের সঙ্গে আর এক প্রান্ত নদীর ধারে পোঁতা একটি প্রস্তরখণ্ডে।

আমি আরও বারোটি 'দস্তুরুল আমল' (আচরণ বিধি) অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য সমগ্র রাজ্যে আদেশ জারি করলাম।

(১) তাম্‌ঘা ও মিরবহরি (নদীকর) নামে এবং অন্য নামে যে সব কর যা প্রদেশ ও জেলার জায়গীরদাররা নিজ নিজ স্বার্থে আদায় করতে অভ্যস্ত ছিল তা আদায় করার নিষেধাজ্ঞা জারি।

(২) যে সব পথে চুরি ডাকাতি প্রায়ই হয় এবং যে সব রাস্তা মানুষের বসতি থেকে দূরে সেখানের নিকটবর্তী জায়গীরদাররা সরাই (বিশ্রামাগার) নির্মাণ, মসজিদ তৈয়ার ও কূপ খনন করবে। এই ব্যবস্থায় সেখানে জনসাধারণ যাতায়াতের প্রেরণা অনুভব করবে এবং সরাইয়ে পথযাত্রীরা থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। এই সব বিপদসঙ্কুল পথ যদি খালিসা এস্টেট অর্থাৎ খাস পরিচালনাধীন স্থানের মধ্যে পড়ে তা হলে ঐ স্থানের শাসক (মুৎসুদ্দি) ঐ কাজগুলি করার ভার নেবে।

(৩) ব্যবসায়ীদের না জানিয়ে অথবা তাদের অনুমতি না নিয়ে কোনও রাস্তার ওপর পণ্যদ্রব্যের বস্তা খোলা চলবে না।

(৪) আমার রাজ্যে কাফের কিংবা মুসলমান যারই মৃত্যু হোক, তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীতে বর্তাবে। অন্য কেউ এই ত্যক্ত সম্পত্তিতে কোনও বাধাসৃষ্টি করতে পারবে না। যদি কেউ উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যায় তাহলে তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিদর্শক এবং পৃথক

অছি নিযুক্ত করতে হবে যাতে সুব্যবস্থার দ্বারা ঐ সম্পত্তির আয় থেকে আইনানুগ ব্যয় করা যায়—যেমন মসজিদ নির্মাণ, সরাই স্থাপন, ভাঙা সেতু মেরামত এবং পুষ্করিণী ও কূপ খনন।

(৫) কেউ সুরা, ধানিমদ কিংবা অন্য কোনও রকম নেশার জিনিস তৈয়ার করতে পারবে না। আমি অবশ্য নিজে সুরাপান করি আমার আঠারো বছর বয়স থেকে। আমার বয়স এখন আটত্রিশ। এখনও আমি ঐ অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। যখন আমি সুরাপান করতে আরম্ভ করি আমি দিনে কখনও কখনও কুড়ি পেয়ালা পর্যন্ত পান করতাম। ক্রমে ক্রমে সুরা আমার ওপর এমন নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো যে আমি মাত্রা কম করার জন্য চেষ্টা শুরু করি। সাত বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় পনেরো পেয়ালা থেকে পাঁচ-ছয় পেয়ালায় নামিয়ে আনি। সুরাপানের সময়টা আমার হরেক রকম ছিল। কখনও দিনের তিন-চার প্রহর বাকি থাকতে আরম্ভ করতাম, কখনও বা রাতে কিংবা দিনের যে কোনও সময়। তারপর আমি শুধু রাতেই পান করতাম। এখন আমি খাদ্য হজম করার জন্য সুরাপান করি।

(৬) কারও বাড়ি কেউ দখল করতে পারবে না।

(৭) আদেশ জারি করি যে কোনও লোকের শাস্তি স্বরূপ নাক ও কান কাটা চলবে না।—আমি নিজেও আল্লার নামে এই শপথ গ্রহণ করি যে আমিও কখনও এইরূপ অঙ্গচ্ছেদের শাস্তি দেব না।

(৮) আদেশ দিই—সরকারী খাস জমির পরিচালক অথবা কোনও জায়গীরদার কোনও রায়তের জমি দখল করতে পারবে না এবং নিজ জমি হিসাবে তা চাষ করতে পারবে না।

(৯) সরকারী আদায়কারী কর্মচারী অথবা কোনও জায়গীরদার যে সব পরগণায় তাদের কর্মস্থান সেখানে কারও সঙ্গে অনুমতি ব্যতীত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে না।

(১০) বড় বড় শহরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং পীড়িতদের সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করার আদেশ দিই। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমস্ত ব্যয় খালিসার (খাস তালুকের) আয় থেকে নির্বাহ হবে এই হুকুমও দিই।

(১১) আমার মহান পিতার নিয়মানুসারেই এই আদেশ জারি করি যে আমার জন্মদিবস রবিঅল-আওয়াল মাসের ১৮ই তারিখ থেকে আমার বয়স তখন যত বৎসর গুণতিতে ততদিন সাম্রাজ্যের জনসাধারণ খাদ্যের জন্য কোনও

পশু হত্যা করতে পারবে না। সপ্তাহে দুইদিন—বৃহস্পতিবার যেদিন আমার রাজ্যাভিষেক হয় ও রবিবার—যেদিন আমার পিতার জন্ম হয়, পশু হত্যা নিষেধ করি। আমার পিতা রবিবার দিনটিকে তাঁর জন্মদিন হিসাবে অত্যন্ত পবিত্র দিন বলে মনে করতেন। আরও একটি কারণ হচ্ছে এই দিনটি সূর্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং এই দিনেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এটি এমন একটি দিন যে দিনে তাঁর সাম্রাজ্যে কোনও পশু হত্যা হতো না।

(১২) আমি সাধারণ ভাবে এই আদেশ দিই যে আমার পিতার আমলের কর্মচারীদের পদ ও জায়গীর আগের মতই বহাল থাকবে। পরে ব্যক্তিবিশেষের গুণানুসারে তাদের মন্‌সব শতকরা কুড়ি থেকে তিনশ এমন কি চারশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আহদিদের ভাতা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং গৃহভৃত্যদের বেতন শতকরা কুড়িভাগ বৃদ্ধি করি। আমার পিতার হারেমের পর্দানসীন মহিলাদের তাঁদের অবস্থা ও মর্যাদানুযায়ী ভরণ-পোষণ ভাতা শতকরা কুড়ি থেকে একশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কলমের এক আঁচড়ে আমার প্রজাসাধারণের নিষ্কর এবং আইমাদের (মোল্লা মৌলবিদের) লাখেরাজ যা তারা পূর্ব দলিল অনুসারে ভোগ করছে তাদের পূর্ব শর্ত বজায় রাখি। ভারতবর্ষের সৈয়দদের মধ্যে সব চেয়ে খাঁটি সৈয়দ, যিনি অনেকদিন আমার পিতার আমল থেকে সদর (ধর্মযাজক)—এই মহান পদ অলঙ্কৃত করে আছেন সেই মিরাণ সদর জাহানকে আদেশ দিই যে তিনি যেন প্রত্যেকদিন যে সব লোক সত্যই দান পাওয়ার যোগ্য তাদের আমার কাছে হাজির করেন। যে সব কয়েদীরা দীর্ঘ দিন কারাগারে অথবা দুর্গে আটক ছিল তাদের মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিই।

শুভ সময় ঠিক করে নানা ওজনের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নির্মাণের আদেশ দিই। প্রত্যেক ধরনের মুদ্রার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা হয়। যেমন, একশ তোলার মোহরের নাম নূর সাহি ; ৫০ তোলার—নূর সুলতানি ; ২০ তোলার নূর দৌলত ; ১০ তোলার—নূর করম ; ৫ তোলার—নূর মিহির ও ১ তোলার নূর-জাহানি। এর অর্ধেক (১/২ তোলা)—নাম নূরানি ও ১/৪ তোলা—নাম রওয়াজি।

রৌপ্যমুদ্রার নাম দেওয়া হয়—একশ তোলার কেকিব-ই-তালি (অদৃষ্ট নক্ষত্র); ৫০ তোলার—কেকিব-ই-ইকবাল (ঐশ্বর্য নক্ষত্র); ২০ তোলার কেকিব-ই-মুরাদ (কামনা নক্ষত্র); ১০ তোলার—কেকিব-ই-বস্‌ত (সৌভাগ্য নক্ষত্র); ৫ তোলার—কেকিব-ই-সাদ (শুভ নক্ষত্র); এবং ১ তোলার

জাহাঙ্গীরি। আধা জাহাঙ্গীরির নাম রাখি—সুলতানি এবং সিকির নাম নিসারি (মুদ্রাবর্ষী)। 'দাম'-এর নাম রাখি—খইর-ই-কবুল (গ্রহণযোগ্য)। অনুরূপ ওজনের তাম্রমুদ্রা প্রচলিত করে সেগুলিরও এক-একটি পৃথক নাম দেওয়া হয়।

একশ, পঞ্চাশ, কুড়ি ও দশ তোলার মোহরের সামনের দিকে আসাখানের এই কবিতাটি মুদ্রিত করার আদেশ দিই :

'লিখে দিল উজ্জ্বল অক্ষরে সৌভাগ্য-কলম—
—শা নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর নাম।'

এই কবিতার পংক্তির মধ্যে 'কলিমা' লেখা হয়। মোহরের অপর পিঠে এই কবিতাটি মুদ্রিত করা হয় যাতে মুদ্রা প্রচলনের তারিখ পাওয়া যায়।

এই মুদ্রা পৃথিবীকে করিছে উজ্জ্বল
সূর্যের রশ্মির মত।

আর মুদ্রার তারিখ হয়
'আফতাব-ই-মামলা কৎ' (সাম্রাজ্যের সূর্য)।

[আফতাব-ই-মামলা কৎ—কথাগুলির মধ্যে হিজরা সন ১০১৪ সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে]

এই কবিতার পংক্তির মধ্যে—টাকশাল, হিজরা সন ও আমার রাজত্বের বৎসর উৎকীর্ণ করা হয়।

নুরজাহানি মোহর—যা অনুরূপ ওজনের সাধারণ মোহরের চেয়ে ওজনে শতকরা কুড়ি ভাগ বেশী—তার ওপর আমির-উল-ওমরার নিম্নলিখিত দ্বিপদী কবিতাটি মুদ্রিত করার আদেশ দিই—

"আকবর বাদশার পুত্র শা নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর।
রবি ও চন্দ্রের আভা দিয়ে স্বর্ণ-মূল করেছে উজ্জ্বল।"

কবিতাটির অর্ধভাগ মুদ্রার এক এক পিঠে মুদ্রিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে টাকশালের নাম, হিজরা সন ও রাজত্বের বছর। জাহাঙ্গীরি সিক্কার—যা সাধারণ সিক্কার চেয়ে শতকরা কুড়িভাগ ওজনে ভারী—মূল্যমান নির্দিষ্ট হয় এক টাকা। এর ওজনও নুরজাহানি মুদ্রার সমান করা হয়। (অর্থাৎ এক তোলা—তবে একটি সোনার, অপরটি রূপার)। এক তোলার ওজন পারস্যের ও তুরাণের আড়াই মিস্‌কলের সমান।

আমার রাজ্যাভিষেকের তারিখ নিয়ে যে সব কবিতা লেখা হয়েছে তার

সবগুলি এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু আমার গ্রন্থশালা ও চিত্রশালার অধ্যক্ষ এবং আমার পুরাতন কর্মচারী মক্তব খাঁয়ের কবিতার কথা উল্লেখ করেই সন্তুষ্ট থাকবো।—

"জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দ্বিতীয় প্রভু
শাহান শা জাহাঙ্গীর,
বসেছেন সুখের সিংহাসনে
নিরপেক্ষতার ন্যায়দণ্ড হাতে নিয়ে।
ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, অর্থ, মহিমা, বিজয়—
তাঁরই সেবার জন্য আনন্দে দাঁড়িয়ে আছে
তাঁহারই সম্মুখে, কটিদেশ শক্ত করে।
রাজ্যাভিষেক হলো তখন—
যখন ঐশ্বর্যলক্ষ্মী মাথা লুটিয়ে দিল
'সাহিব-কিরাণ-ই-সানির' পদতলে।

['সাহিব-কিরাণ-ই-সানি'—শব্দগুলি ১০১৪ সংখ্যাটি প্রকাশ করছে।]

পুত্র খসরুকে এক লক্ষ মুদ্রা দিই যাতে সে এই টাকা দিয়ে দুর্গের বাইরে ভূতপূর্ব খান্‌খানান মুনিম খাঁয়ের বাড়িটি মেরামত করে নিতে পারে।

[মুনিম খাঁ হুমায়ুন ও আকবরের সময় একজন উঁচুপদের কর্মচারী ছিলেন।]

পাঞ্জাবের শাসনভার সৈয়দ খাঁর ওপর দেওয়া হলো। তিনি একজন বিশ্বস্ত আমির এবং বিবাহ সম্পর্কে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আছে। তিনি মোগল বংশসম্ভূত। তাঁর পূর্বপুরুষরা আমার পূর্বপুরুষদের অধীনে কাজ করতেন। তাঁর বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমি সংবাদ পাই যে তাঁর খোজারা দুর্বল ও দরিদ্র প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে সংবাদ পাঠাই যে আমার ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড ধনী ও দরিদ্রকে সমভাবে দেখবে। কেউ যদি কারও ওপর অত্যাচার করে, অত্যাচারী বড় ও ছোট যেমনই হোক সমান শাস্তি পাবে। এর পর যদি কোনও অত্যাচার এবং পীড়ন তাঁর লোকজন দ্বারা চলতে থাকে তাহলে অনুগ্রহ পাওয়ার পরিবর্তে তিনি কঠোর শাস্তি ভোগ করবেন।

আমি প্রথমে সেখ ফরিদ বুখারিকে একটি সম্মানসূচক পোশাক, রত্ন-খচিত তরবারি, রত্নখচিত দোয়াতদান ও কলম উপহার দিই। তারপর

তাঁর পূর্বপদে বহাল রাখি। আমার পিতার আমলে তিনি মিরবক্সি পদে ছিলেন। তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বলি—'এখন থেকে আপনাকে সাহিবা-স্-সইফ-ওয়া-ল-কলম (তরবারি ও কলমের সর্দার) বলে সম্মান করবো।'

আমার পিতার রাজত্বের শেষ সময় তিনি মুকিমকে 'ওয়াজির-খাঁ' উপাধি দান করে তাঁর সাম্রাজ্যের উজিরের পদ দেন। আমিও সেই উপাধি ও পদ বহাল রেখে তাঁকে সেই কাজেই নিযুক্ত রাখি।

খাজা ফথ্উল্লাকে সম্মানসূচক পোশাক দান করে পূর্বের মতই বক্সির পদে বহাল রাখি। আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালে আবদুর রেজ্জাক মামুরি বিনা কারণে আমার চাকরি ত্যাগ করে বাবার কাছে চলে গেলেও তাঁকে পূর্বের মত বক্সিপদেই বহাল রাখি। তাঁকেও একটি সম্মানসূচক পোশাক দিই। আমিন-উদ্দৌলা আমি সম্রাটপুত্র থাকার সময় বক্সিপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে মহামান্য পিতার কাছে চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অপরাধের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমি তাঁকে 'আতিস-ই-বেগি'র (গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক) পদেই বহাল রাখি। এই পদেই তিনি বাবার অধীনে কাজ করতেন। মোটের ওপর পিতার আমলে সদরে ও মফস্বলে যে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের সেই পদ ও মর্যাদাতেই বহাল রাখি।

সেরিফ খাঁ তাঁর শৈশবকাল থেকেই আমার কাছে ছিলেন। আমি সম্রাট-পুত্র থাকাকালেই তাঁকে খাঁ পদবীতে ভূষিত করেছিলাম। এলাহাবাদ ত্যাগ করে মহামান্য পিতার সেবা করার জন্য চলে আসার সময় তাঁকে একটি ডঙ্কা ও তুমান তোঘ্ (চমরের লেজের নিশান) উপহার দিয়েছিলাম। তাঁকেও আড়াই হাজারি মনসবদারিতে উন্নীত করে বেহার প্রদেশ পরিচালনার ভার দিই। এই প্রদেশের ওপর সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই ওপর অর্পণ করে তাঁকে সেখানে পাঠাই। রজব মাসের ৪ঠা তারিখ আমার রাজ্যাভিষেকের পঞ্চদশ দিবসে তিনি আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হন। তাঁর আগমনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন যে তাঁকে একাধারে আমার ভাই, পুত্র, বন্ধু এবং সহচররূপে দেখি। তাঁর অন্তরঙ্গতা, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা ও নানা কাজে অভিজ্ঞতার ওপর আমার গভীর আস্থা থাকায় তাঁকে প্রধান উজির পদে অভিষিক্ত করি।—তাঁকে পাঁচ হাজারি মনসবদারিতে উন্নীত করে 'আমির-উল-উমরা'—এই মহান পদবীতে ভূষিত করি। আমার কর্মচারীদের সমস্ত পদবীর তুলনায় এই পদবীই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পদগৌরব

অনুযায়ী তাঁকে উচ্চতর মনসবদারিতে বহাল করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নিজেই এই আবেদন জানান যে যতদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ না দেখাতে পারবেন ততদিন 'পাঁচ হাজারি'র চেয়ে উন্নততর মনসবদারি গ্রহণ করবেন না।

পিতার আমলের কর্মচারীদের আনুগত্যের বাস্তব পরিচয় তখনও আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়নি। তবে তাঁদের অনেকেরই কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি ও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল যা স্বয়ং আল্লার দরবারে অনুমোদন লাভ করে না এবং যা তাঁর সৃষ্ট মানুষদেরও রুচিকর নয়। সেই সব কর্মচারীরাও আমার ব্যবহার দেখে নিজেরাই লজ্জিত হলেন।

আমার রাজ্যাভিষেকের দিন সকলের দোষত্রুটি ক্ষমা করে মনে মনে এই সঙ্কল্প করেছিলাম যে অতীত কার্যের জন্য আমি কাউকেই শাস্তি দেব না। কিন্তু আমার অন্তর থেকে তাদের ওপর সন্দেহের বীজ তখনও উৎপাটিত হয়নি দেখে আমি আমির-উল-উমরাকেই আমার অভিভাবক ও রক্ষক বলে ধারণা করলাম—যদিও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই তাঁর ভৃত্যদের একমাত্র রক্ষক—বিশেষ করে রাজাদের। কারণ, তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। তাঁর পিতা আব্দুল সামাদাকে—তাঁর তুল্য চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী সেকালে আর কেউ ছিলেন না—সম্রাট জন্নত আসিয়ানি (হুমায়ুন) 'সিরিণ কলম' (মনোরম কলম) উপাধি দেন এবং তাঁর দরবারে একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি সিরাজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। আমার মহান পিতা অতীত কাজের জন্য তাঁকে খুবই সম্মান ও ভক্তি করতেন।

আমার পিতার আমলের অতি বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজা মানসিংহ। তাঁর বিখ্যাত পরিবারের সঙ্গে আমার পিতার আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় —কারণ তিনি তাঁর পিসিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন। আমি তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করি—যাঁর গর্ভে আমার পুত্র খসরু ও আমার সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সুলতানুন্নেসা জন্মগ্রহণ করে। তাঁকে আমি পূর্বপদে অর্থাৎ বাংলা দেশের শাসকপদে বহাল রাখি। কতকগুলি অন্যায় কার্যকলাপের জন্য আমার কাছ থেকে তিনি এরূপ অনুগ্রহ পাওয়ার নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সম্মানসূচক পোশাক হিসাবে একটি 'চারকাব' (হাত কাটা জামা), একটি রত্নখচিত তরবারি এবং

আমার নিজস্ব একটি অশ্ব তাঁকে উপহার দিয়ে তাঁর শাসনাধীন প্রদেশ বাংলায় পাঠিয়ে দিই—যে প্রদেশ পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখার হিম্মত রাখে। তাঁর পিতার নাম রাজা ভগবান দাস। তাঁর পিতামহ রাজা বিহারীমল কাছোওয়া রাজপুতদের মধ্যে প্রথম আমার পিতার চাকরিতে প্রবেশ করার সম্মান অর্জন করেন এবং বিশ্বাসে, বান্ধবজনোচিত সততায় ও সাহসিকতায় তাঁর জাতির অন্য সকলকে অতিক্রম করেন।

আমার রাজ্যাভিষেকের সময় যখন অধীনস্থ সমস্ত অভিজাত ব্যক্তি তাঁদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাকে সম্মান জানাতে আসেন তখনই আমার মনে হয়েছিল যে সেই সব সৈন্য আমার পুত্র পরভেজের অধীনে দিয়ে রাণার বিরুদ্ধে (রাণা প্রতাপের পুত্র—অমর সিং) ধর্মযুদ্ধের জন্য পাঠাব। কারণ, এই রাণাই হচ্ছে হিন্দুস্থানের একজন দুষ্ট বিধর্মী কাফের যে সমস্ত অসৎ কাজের নেতা। আমার পিতার সময় রাণার বিরুদ্ধে ঘন ঘন সৈন্য পাঠানো হয়েছে কিন্তু তাকে তাড়ানো যায়নি।

শুভক্ষণে আমার এই পুত্রকে সম্মানসূচক জমকালো পোশাক, রত্নখচিত কটি-তরবারি ও ছোরা, বহুমূল্য চুনিখচিত মুক্তার মালা—যার মূল্য বাহাত্তর হাজার শিকা, ইরাক ও তুর্কির ঘোড়া ও প্রসিদ্ধ হাতী উপহার দিয়ে তার ওপর ন্যস্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বিদায় দিলাম। এই কাজে কুড়ি হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সেনানায়কও নিযুক্ত করা হলো। এঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন—আসফ খাঁ। আমার পিতার আমলের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। অনেকদিন বক্সীপদে নিযুক্ত থাকার পর তিনি দেওয়ান-বা-ইস্তিকলাফ (সর্বক্ষমতাধারী দেওয়ান) পদে উন্নীত হন। তাঁকে আমির পদের গৌরব বর্ধিত করে উজিরের পদে অভিষিক্ত করি। আড়াই হাজারি থেকে পাঁচ হাজারি মনসবদারিতে উন্নীত করে তাঁকে পরভেজের অভিভাবক রূপে সঙ্গে দিই। তাঁকে সম্মানসূচক পোশাক, রত্নখচিত কটি-তরবারি, একটি ঘোড়া ও একটি হাতী দিয়ে সম্মানিত করে এই আদেশ দিই যে—তিনি প্রয়োজন মত যে সব আদেশ দেবেন তা ছোট বড় সমস্ত মনসবদারকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। আব্দুর রজ্জাক মামুরিকে বক্‌সি ও আসফ খাঁয়ের কাকা মুখতর বেগকে পরভেজের দেওয়ান নিযুক্ত করি। রাজা বিহারী-মলের পুত্র পাঁচ হাজারি মনসবদার রাজা জগন্নাথকে একটি সম্মানসূচক পোশাক ও রত্নখচিত কটি-তরবারি উপহার দিই।

রাণার জ্ঞাতিভাই রাণা শঙ্করকে আমার পিতা রাণা পদবীতে ভূষিত করে তাঁকে খসরুর সঙ্গে দিয়ে রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানোর মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়েই পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই রাণা শঙ্করকে সম্মানসূচক পোশাক ও রত্নখচিত তরবারি উপহার দিয়ে পরভেজের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় পাঠাই।

রাজা মানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র মাধো সিং ও রাওয়াল মাল দরবারিকে পতাকা উপহার দিই। কারণ এই যে—তাঁরা ছিলেন সেখাবৎ রাজপুত এবং আমার পিতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাঁদের দুইজনকেই তিন হাজারি মনসবদারি পদ প্রদান করি।

সেনা রুকুনউদ্দিন আফগানিকে আমি সম্রাটপুত্র থাকার সময়েই সের খাঁ পদবী দিয়েছিলাম। তাঁকে পাঁচশ থেকে সাড়ে তিন হাজারি মনসবদারিতে উন্নীত করি। সের খাঁ আফগান জাতির একজন সর্দার এবং অত্যন্ত সাহসী পুরুষ। উজবেগদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর একটি হাত কাটা যায়। সেখ আবুল ফজলের পুত্র আব্দুর রহমান, রাজা মানসিংহের পৌত্র মহা সিং, সাদিক খাঁয়ের পুত্র জহিদ খাঁ, ওয়াজির জামিল ও কারা খাঁ তুর্কিকে দুই হাজারি মনসবদারিতে উন্নীত করে এবং তাঁদের প্রত্যেককে সম্মানসূচক পোশাক ও অশ্ব উপহার দিয়ে যুদ্ধযাত্রায় পাঠাই। মনোহরও এই যুদ্ধ-অভিযানে যোগ দেওয়ার অনুমতি পান। তিনি সেখাবৎ কাছোওয়া রাজপুত বংশীয়। তাঁর যৌবনকালে তিনি আমার পিতার কাছ থেকে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যদিও তাঁর সময় থেকে আদমের কাল পর্যন্ত তাঁদের জাতির কোনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে না তবুও এ কথা বলা ঠিক হবে যে তাঁর কিছু জ্ঞানবুদ্ধি ছিল। তিনি ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। তাঁর একটি দ্বিপদী কবিতার ভাবার্থ এই—ছায়াসৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, আমার প্রভু সূর্যের আলোয় পা রাখতে পারবে না।

আমার নিযুক্ত সমস্ত সেনানায়ক ও কর্মচারী প্রত্যেকের পদ ও মর্যাদার বিবরণ দিতে গেলে সেটা একটা বৃহৎ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমার ব্যক্তিগত ভৃত্য, অনুচর এবং আমিরদের পুত্ররা, অনেক খানজাদা ও অত্যুৎসাহী রাজপুত এই অভিযানে যাওয়ার জন্য আবেদন করে। এক হাজার 'আহদি'—যার অর্থ হচ্ছে একক ব্যক্তি, এই অভিযানের জন্য নিযুক্ত হয়। সংক্ষেপে

বলতে গেলে এমন এক সেনাবাহিনী গঠিত হলো যে তারা পরম সুহৃদ আল্লার ওপর আস্থা রাখতে পারলে পৃথিবীর যে কোনও শক্তিধর সম্রাটকে বিপর্যস্ত ও পরাজিত করতে সক্ষম হবে।

"নানা দিক থেকে সেনাদল এসে গেল—
পৃথিবীর বীর যোদ্ধাদের জীবনের প্রেরণায়
তারা বলীয়ান।
তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে
মৃত্যুভয় তাদের নেই।
বারিবর্ষণকে তারা তুচ্ছ করে,
আগুনের ভয়ে ভীত নয় তারা।
সাহসে তারা অদ্বিতীয়,
শক্তিতে তারা জনতার বল।
সহনশীলতায় তারা 'নেহাই'—
আক্রমণে তারা প্রস্তরের মত।"

যখন আমি সম্রাটপুত্র ছিলাম আমার বিশ্বাসের নজিরস্বরূপ আমার 'উজুক' সীলমোহরটি আমির-উল-উমরাকে দিই। (উজুক তাতারি শব্দ—অর্থ অঙ্গুরী)। এটি একটি ছোট গোলাকার সীল)। যখন তাঁকে বেহারে পাঠানো হয় সেই সময় সেই সীলটি পরভেজকে দিই। রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যখন সে বাইরে গেল তখন আগেকার ব্যবস্থা অনুসারে সেই সীলটি আবার আমির-উল-উমরাকেই প্রত্যর্পণ করি।

সাহিব জমালের (সৌন্দর্যের রাণী) গর্ভে পরভেজের জন্ম হয়। সাহিব জমাল জৈন্-খান্ কোকার জ্ঞাতিভগ্নী। আত্মীয়তার দিক দিয়ে জৈন্ খান কোকা মির্জা আজিজ কোকার সমতুল। আমার পিতার রাজত্বের ৩৪ বৎসরে পরভেজের জন্ম হয় কাবুলে। সে খসরুর চেয়ে দুই বছর দুই মাসের ছোট। এরপর আমার আরও কয়েকটি সন্তান হয় কিন্তু তাদের আল্লা তাঁর কাছে টেনে নেন। তারপর রাঠোর বংশীয় করম্‌সির গর্ভে আমার একটি কন্যা হয়। তার নাম রাখা হয়—বিহারবানু বেগম। মোটা রাজার কন্যা জগৎ গোসাঁইয়ের (যোধবাই) গর্ভে আমার পিতার রাজত্বের ছত্রিশ বছরে ৯৯৯ হিজরি সনে লাহোরে আমার পুত্র সুলতান খুরমের জন্ম হয়। তার জন্মে পৃথিবী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। [মহম্মদ হাদি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—শাজাহানের

পিতামহ আকবর তাঁর নাম রাখেন স্থলতান খুরম অর্থাৎ আনন্দের রাজকুমার। কারণ তাঁর জন্মে পৃথিবীতে আনন্দের বন্যা বয়।] তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণও বাড়তে থাকে। সে আমার অন্য সব ছেলেমেয়ের চেয়ে আমার পিতার দিকে বেশী দৃষ্টি দিত। আমার পিতাও তার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আমাকে তার গুণের কথা শুনিয়ে বলতেন যে তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোনও ছেলেমেয়ের তুলনাই হয় না। সে-ই ছিল তাঁর প্রকৃত নাতি।

খুরমের জন্মের পর আমার উপপত্নীদের গর্ভে আরও কয়েকটি সন্তান হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম দিই জাহান্দার ও আর একজনের নাম শাহরিয়ার।

এই সময় সৈয়দ খাঁয়ের কাছে থেকে আবেদন আসে যে মির্জা গাজির ছুটি মঞ্জুর করা হোক যাতে সে তার দেশে ফিরে যেতে পারে। মির্জা গাজি সিন্ধু প্রদেশ থাটার শাসকের পুত্র। আমি বলি যে আমার বাবা তার বোনের সঙ্গে খসরুর বিবাহ ঠিক করে গিয়েছেন। আল্লার দয়ায় এই বিয়ের ব্যাপার ভালভাবে চুকে গেলে তাকে সিন্ধুতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

সিংহাসনে বসার এক বছর আগে আমি মনস্থ করি যে শুক্রবার সন্ধ্যায় সুরাপান করবো না। আল্লার দরবারে আমি এইটুকু প্রত্যাশা করি, যতদিন বাঁচবো ততদিন তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় রাখবেন।

দিল্লীর ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য মির্জা মহম্মদ রিজা সবজ্ওয়ারিকে কুড়ি হাজার টাকা দিই। আমার সাম্রাজ্যের উজিরি আধা-আধি ভাগ করে এই দুইজনকে দিই—(১) খান বেগ তাঁকে আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালেই 'ওয়াজির-উল-মুলক' উপাধি দিয়েছিলাম, (২) ওয়াজির খান্ (মুকিম)।

চার হাজারি মনসবদার সেখ ফরিদ বুখারিকে পাঁচ হাজারির পদে উন্নীত করি। রামদাস কাছোওয়াকে আমার পিতা খুবই পেয়ার করতেন। তাঁকে দুই হাজারি থেকে তিন হাজারির মনসবদারিতে উন্নীত করি। মির্জা স্থলতান হোসেনের পুত্র এবং শা ইসমাইলের পৌত্র কান্দাহারের শাসক মির্জা রুস্তমকে বৈরাম খাঁয়ের পুত্র আবদার রহিম খানখানান এবং তাঁর পুত্র ইরাজ ও দারাকে ও দাক্ষিণাত্যের শাসকশ্রেণীর আরও কয়েকজন আমিরকে সম্মানসূচক পোশাক পাঠাই। মুয়াইদ্ বেগের পৌত্র ও আবদার রহমানের পুত্র বারখুরদার

কোনও আদেশ না পেয়েই আমার দরবারে আসায় তাকে তৎক্ষণাৎ তার জায়গীরে ফিরে যেতে আদেশ দিই। আমন্ত্রণ না পেয়েও সম্রাটের ভোজসভায় হাজির হওয়ার চেষ্টা মোটেই সৎ আচরণের পরিচয় নয়। এইরূপ প্রবৃত্তিকে বাধা না দিলে দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না, স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই যাবে।

আমার শুভ রাজ্যাভিষেকের পর এক মাস অতীত হলে লালা বেগ আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান। আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালে তাঁকে 'বাজ-বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিলাম। দেড় হাজারের মন্‌সব থেকে তাঁকে চার হাজারের মন্‌সব দান করি। তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ দুই হাজার টাকা দিয়ে বেহার সুবায় পাঠাই।

আমাদের পারিবারিক বিশেষ শ্রেণীর ভৃত্যের বংশে বাজবাহাদুরের জন্ম। তাঁর বাবার নাম নিজাম। তিনি সম্রাট হুমায়ুনের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

কেশোরাম মারু একজন রাজপুত। আনুগত্যে তিনি তাঁর স্বজাতি সম-সাময়িক অন্যান্য রাজপুতের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁকে দেড়হাজারি মন্‌সবদারিতে উন্নীত করি।

উলেমা ও ইসলামধর্মী জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দেশ দিই যে তাঁরা যেন পর-মেশ্বরের এমন বিশেষ বিশেষ নাম সংগ্রহ করেন যা সহজেই মনে রাখা যায় এবং যা আমার জপমালাতে সেই নামগুলি প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারি। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমি জ্ঞানী, সাধু, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করি।

কিলিজ খাঁ আমার মহামান্য পিতার আমলের একজন পুরাতন কর্মচারী। তাঁকে গুজরাট প্রদেশে কর্মে নিযুক্ত করে তাঁর খরচের জন্য এক লক্ষ টাকা দিই। মিরণ সদর জাহানকে দুই হাজারি থেকে চার হাজারি মন্‌সবে উন্নীত করি। আমি তাঁকে শৈশবকাল হতেই জানতাম—যখন আমি সেখ আবদু-ন-নবির কাছে 'চত্বারিংশ নীতিসূত্র' পড়তাম। তাঁর কথা আকবরনামায় বিস্তৃত-ভাবে লেখা আছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত মিরণ সদর জাহান আমার সঙ্গে একনিষ্ঠ ব্যবহার করে চলেছেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁকে আমার উপদেষ্টা বলে মনে করি। আমার মহান পিতার পীড়ার কিছু আগে এবং পীড়ার সময়েও যে সব মন্ত্রীদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভ বলে গণ্য করা হতো তাঁরা এবং উচ্চ-পদস্থ আমিররা প্রত্যেকেই যখন কি করে তাঁদের ব্যক্তিগত লাভ হবে এই চিন্তায় মশগুল এবং সাম্রাজ্যের ধ্বংস কিভাবে আনা যায় তার গুপ্ত মন্ত্রণায় উত্তেজিত—সেই সময়ও তিনি তাঁর নিজ কাজে অবহেলা করেননি এবং বরাবর

আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ইনায়েৎ বেগ আমার পিতার রাজত্বকালে 'দেওয়ানি বুই উতাৎ' (পূর্ত বিভাগের অধিনায়ক) ও সপ্তশতী মনসবদারির শ্রেণীতে ছিলেন। তাঁকে আমি ওয়াজির খাঁর স্থলে আমার সাম্রাজ্যের আধা-উজির করে দিই ও 'ইৎমাদুদ্দৌলা' এই উচ্চ পদবীতে ভূষিত করে দেড় হাজারির শ্রেণীতে উন্নীত করি। ওয়াজির খাঁকে সুবা বাংলার দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করে সেখানকার রাজস্ব ধার্য করার জন্য নির্দেশ দিই।

পতর দাসকে আমার পিতা রায়রায়ান উপাধি দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে রাজা বিক্রমজিৎ এই নতুন পদবীতে ভূষিত করি। বিক্রমজিৎ নামে ভারতবর্ষে এক মহান রাজা ছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে ভারতে মানমন্দির প্রথম স্থাপিত হয়। পতর দাসকে অস্ত্রনির্মাণ কারখানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে এই আদেশ দিই।—অস্ত্রাগারে সব সময়েই পঞ্চাশ হাজার হালকা কামান ও তিন হাজার কামানবাহী গাড়ি ব্যবহারের উপযুক্ত অবস্থায় মজুত রাখতে হবে। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। আমার পিতার চাকরিতে তিনি প্রথমে ছিলেন হাতী-শালার হিসাবরক্ষক। পরে দেওয়ানি ও আমিরি পদ-গৌরব তিনি লাভ করেন। সৈনিকের গুণাবলী ও শাসনকার্যে তাঁর নিপুণতার অভাব নাই।

খান আজমের (আজিজ কোকা) পুত্র খুরামকে দুই হাজারি থেকে আড়াই হাজারি মনসবে উন্নীত করি।

আমার ইচ্ছা ছিল যে আকবরি ও জাহাঙ্গীরি কর্মচারীদের অনেকেরই মনোবাসনা পূর্ণ হোক। আমি বক্সীদের জানিয়ে দিলাম যে যদি কোনও কর্মচারী তার জন্মস্থানকে জায়গীর রূপে পেতে চায় তাহলে সেই মর্মে যেন আবেদন দাখিল করে। চেন্‌গিজ-বিধি অনুসারে সেই প্রার্থিত সম্পত্তি তার নামে সনদবলে হস্তান্তর করে তাকে দখল দেওয়া যেতে পারে যাতে তার মনে ভবিষ্যতে কোনও পরিবর্তনের ভয় না থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষ প্রত্যেককে জায়গীর দান করে তাতে স্থায়ী অধিকার দিতেন। জায়গীরের ফার্মানে আল-তমঘা সীল অর্থাৎ লাল কালির (সিঁদুর) মোহর ছাপ দেওয়া হতো। আমি আদেশ দিই যে মোহর ছাপের জন্য নির্দিষ্ট স্থান 'তিলা পোষে' (সোনার পাত) ঢাকা থাকবে এবং সেইখানে মোহর ছাপ মারা হবে। আমি এই মোহর ছাপের নাম দিই—আলতুন তমঘা। [তুর্কি ভাষায় আল হচ্ছে সিঁদুর ও আলতুন—সোনা।] জাহাঙ্গীর বলছেন সীলের নাম 'আল্‌-তমঘা' পরিবর্তন

করে রাখলেন আলতুন্ তমঘা।

মির্জা স্থলেমানের পৌত্র মির্জা সারুখের পুত্রদের মধ্যে মির্জা স্থলতানকে নির্বাচন করে মহামান্য পিতার অনুমতি নিয়ে আমার চাকরিতে বহাল করি। মির্জা স্থলেমান ছিলেন মির্জা স্থলতান আবু সৈয়দের বংশধর (প্রপৌত্র)। তিনি দীর্ঘকাল বাদকসানে রাজত্ব করেছিলেন। মির্জা স্থলতানকে আমি পুত্রের মত দেখি। তাকে এক হাজারি মনসবদারি পদে উন্নীত করি।

রাজা মানসিংহের সর্বাপেক্ষা স্থযোগ্য পুত্র ভাও সিংহের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেড় হাজারি মনসবদারির পদে বসাই।

কাবুলের খায়উর বেগের পুত্র জমানা বেগ শৈশবকাল থেকে আমার পরিচারক ছিল। সে আমার সম্রাটপুত্র থাকার সময়েই 'আহদি' থেকে পঞ্চশতি মনসবদারি পেয়েছিল। তাকে আমি মহবৎ খাঁ উপাধি ও দেড় হাজারির পদ দিই। আমার ব্যক্তিগত কর্মসংস্থার বক্সিপদে তাকে স্থায়ীভাবে বহাল করি।

বুন্দেলা রাজপুত বংশীয় রাজা বীরসিংহ সাহসে, সততায় ও সরল আন্তরিকতায় তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি ও আত্মীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে আমি তিন হাজারি মনসবদারির পদ প্রদান করি। নিম্নলিখিত কারণে তাঁর এই উন্নতি ও সম্মান লাভ। আমার মহান পিতার জীবনের শেষ সময়ে হিন্দুস্থানের সেখ-জাদাদের মধ্যে জ্ঞানে ও শিক্ষায় সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেখ আবুল ফজল। তিনি বাহ্যতঃ তাঁর আন্তরিকতা ও অকপটতারূপ ঝুটা রত্নের ভেল্কি দেখিয়ে আমার পিতাকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং সেই রত্ন তাঁকে চড়া দামে বিক্রয় করেছিলেন। তাঁকে দাক্ষিণাত্য থেকে পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। আমার ওপর তাঁর মনোভাব বিরূপ থাকায় তিনি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে কথা বলতেন। এই সময় যখন নানাদিকে উত্তেজনা এবং ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এবং আমার পিতার উদার মন আমার ওপর সম্পূর্ণ তিক্ত হয়ে উঠেছে তখন একবার যদি তিনি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার স্থযোগ পান তাহলে আরও গণ্ডগোলের স্থষ্টি হবে এবং আমার পিতার সঙ্গে মিলনের আশা স্থদূরপরাহত হবে। সেইজন্য তাঁর পিতার দরবারে আগমন নিবারণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। বীরসিংহের দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর আসার পথ। তাঁকে বিদ্রোহী গণ্য করে আমি বীরসিংহকে একটি গোপন বার্তায় জানিয়ে দিই যে তিনি যদি এই ষড়যন্ত্র-

কারীর আসার রাস্তা বন্ধ করে তাঁকে হত্যা করতে পারেন তাহলে আমার কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ পাবেন। আল্লার দয়ায় যখন সেখ আবুল ফজল বীরসিংহ দেওয়ের দেশের পথে আসছিলেন তখন রাজা রাস্তা অবরোধ করে তাঁর সঙ্গের লোকদের সামান্য যুদ্ধের পরই ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। তাঁর ছিন্ন মস্তক এলাহাবাদে আমার কাছে পাঠানো হয়। এই ঘটনা পরলোকগত সম্রাটের ক্রোধের কারণ অবশ্যই হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে কোনও রকম বাধা না পেয়ে পিতার প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ধূলা চুম্বন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ক্রমে সম্রাটের মন থেকে আমার ওপর বিরূপ ভাব দূর হয়েছিল।

কাজউইনের মীর জিয়াউদ্দিনকে হাজার সেনার অধিনায়ক করে আস্তাবলের হিসাবরক্ষক পদে নিযুক্ত করি। আমি সম্রাটকুমার থাকার সময় সে আমার কাজ করত। সে আমার অনুগত ছিল। আদেশ দিই যে প্রতিদিন ত্রিশটি ঘোড়া আমার কাছে আনতে হবে যাতে আমি ঐ ঘোড়াগুলি উপহার দিতে পারি।

এই বংশের (তাইমুর) একজন প্রসিদ্ধ সাহসী বীর আলি আকবর সাহি। তাঁকে চার হাজারি মনসবদারির সম্মান দিয়ে সম্বল সরকার তাঁর জায়গীর হিসাবে প্রদান করি।

একদিন আমির-উল-উমরা (সরিফ খাঁ) কথার পৃষ্ঠে একটি মন্তব্যে আমাকে খুশী করেন। মন্তব্যটা এই—সাধুতা ও অসাধুতা শুধু টাকাপয়সা কিংবা জিনিসপত্রের বিষয় নিয়েই বোঝায় না। পরিচিত জনের যে গুণ নেই সেই গুণের কথা বলা এবং অপরিচিতের ভাল ভাল গুণের কথা শোনা গেলেও তা গোপন করা অসাধুতা। সত্য কথা বলতে গেলে পরিচিত বা অপরিচিতদের মধ্যে কোনও রকম পার্থক্য না করে তাদের সম্বন্ধে সত্য কথা বলাই সাধুতা।

পরভেজকে অভিযানে পাঠানোর সময় বলেছিলাম—'রাণা যদি নিজে অথবা তার বড় ছেলে করণ তোমার দরবারে এসে আনুগত্য জানিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে তাহলে তার রাজ্যের কোনও ক্ষতি করো না।' এই কথা বলার আমার দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, মাননীয় পিতার পবিত্র মনে ট্রান্স অক্সিয়ানা জয়ের ইচ্ছা সব সময়ই থাকলেও যখনই তিনি অভিযানের জন্য মন স্থির করেছেন তখনই একটা না একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি ভাবলাম—যদি রাণার সঙ্গে ঝামেলাটা মিটে যায় এবং আমার মন

থেকে এই বিপদের ভয় দূর হয় তা হলে আল্লার দয়ার ওপর নির্ভর করে পরভেজকে হিন্দুস্থানে রেখে আমার পূর্বপুরুষদের রাজ্যের দিকে যাত্রা করবো যেখানে এই সময় কোনও স্থায়ী শাসক নেই। আবতুল্লা খাঁ ও তাঁর পুত্র আবদুল মুমিন খাঁয়ের মৃত্যুর পর বাকি খাঁ এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ওয়ালি মহম্মদ খাঁয়ের আমলে এখানকার ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়, দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ শেষ করে সম্পূর্ণ দেশটাই আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে আনার ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। আমার পিতার সময়েই দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমার আশা, আল্লার অনুগ্রহে আমি এই দুই কাজই সম্পন্ন করতে পারব।

"যদি কোনও রাজা সাত রাজ্য করে অধিকার,
আরও রাজ্য জয়ে তার না হবে বিকার।"

সেকালের বাদাকসানের রাজা মির্জা সুলেমানের পৌত্র মির্জা সারুখ যিনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ (জাহাঙ্গীরের সংবোন সকোরুন্নিসার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়) এবং যিনি আমার পিতার আমলে পাঁচ হাজারি মনসবদারি পদে ছিলেন—তাঁকে সাত হাজারির পদ-মর্যাদা দিই। মির্জা চরিত্রে খাঁটি তুর্কি ও সরল হৃদয়। পিতা তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। যেখানে তিনি তাঁর নিজের ছেলেদের বসার আদেশ দিতেন মির্জাকেও তাদের সঙ্গে একই স্থানে বসার সম্মান দিতেন। বাদাকসানের লোকদের ক্ষতিজনক কাজ করার অভ্যাস থাকলেও তিনি কিন্তু কখনও ঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি এবং এমন কাজ করেননি যাতে কোনও অসন্তোষের কারণ ঘটতে পারে। মালব প্রদেশের ভার পিতা তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। আমিও স্থায়ীভাবে সেই ব্যবস্থা অনুমোদন করি।

নক্‌সিবন্দী পরিবারের খাজা আবদুল্লা আমার অধীনে চাকরি করার পূর্বে আহদি ছিল, পরে ক্রমশঃ এক হাজারির পদে উঠেছিল। কিন্তু কোনও রকম কারণ না দেখিয়েই সে বাবার কাছে চলে যায়। তাঁর কাছে সে যে পদবী ও জায়গীর পেয়েছিল আমিও তাতেই তাকে বহাল রাখি। যদিও আমি মনে করি যে আমার নিজের পরিচারক ও ভৃত্য বাবার কাজে যত বেশী ঢোকে ততই আমার সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আবদুল্লা আমার কোনও অনুমতি না নিয়েই এই কাজ করায় আমি তার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত

হয়েছিলাম। কিন্তু একথা ঠিক যে সে পুরুষোচিত গুণের অধিকারী ও কর্মঠ ব্যক্তি। যদি সে ঐ দোষটুকু না করত তাহলে তাকে নির্দোষ জওয়ান বলে গণ্য করা যেত।

মাওয়ারান-নাহারের প্রসিদ্ধ অধিবাসী আবুন্নবি উজবেগকে দেড় হাজারি মনসবদারি পদ প্রদান করি। ইনি আব্দুল মুমিন খাঁর আমলে মাসাদের শাসনকর্তা ছিলেন।

সেখ বাহার পুত্র সেখ হাসান তার শৈশবকাল থেকে আজ পর্যন্ত বরাবর আমার কাজে বহাল থেকে আমার পরিচর্যা করে আসছে। আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালেই সে 'মুকারব খাঁ' উপাধি পাওয়ার গৌরব লাভ করে। সে অত্যন্ত কর্মক্ষম ও চটপটে ছিল। শিকারের দীর্ঘপথ সে আমার পাশে পাশে চলত। তীর ও বন্দুক চালনায় সে অতি নিপুণ এবং শল্য চিকিৎসায় সে সময়ে সে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিল। তার পূর্বপুরুষরাও ছিলেন অস্ত্রোপচার বিদ্যায় কুশলী। তার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকায় তাকে আমার ভাই দানিয়ালের ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য পোষ্যদের আমার কাছে আনার জন্ত বুরহানপুরে পাঠাই এবং নরমগরম ভাষায় খানখানানকে তিরস্কার করে চিঠি লিখি। মুকারব খাঁ তার ওপর ন্যস্ত ভার অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুচারুভাবে সম্পন্ন করে। খান্খানান্ ও সেই স্থানের অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের মনে যে সন্দেহের বীজ ঢুকেছিল তা দূর করে এবং আমার ভাই তার যে সব ছেলেমেয়ে ও পরিবারবর্গ রেখে যায় তাদের এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি ও আসবাবপত্র নিয়ে নির্বিঘ্নে লাহোরে আমার কাছে পৌঁছে দেয়।

আমি নকিব খান্কে দেড় হাজারি মনসবদারের পদ দিই। তাঁর নাম—ঘিয়াসউদ্দিন আলি। আমার পিতা তাঁকে 'নকিব খান্' পদবীতে ভূষিত করেন। তাঁর কাজে ও পরামর্শে পিতার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। রাজ্যাভিষেকের কিছু পর থেকেই বাবা তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। এই ঘনিষ্ঠতার ফলেই 'আখুন্দ' বলে তাঁকে সম্বোধন করতেন। ইতিহাস ও জীবন-চরিত সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই। আজ পর্যন্ত জন-অধ্যুষিত পৃথিবীতে তাঁর মত ঘটনাপঞ্জী-লেখক পাওয়া যাবে না। সৃষ্টির আদি থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই জগতের চতুঃসীমাভুক্ত সমস্ত স্থানের ঘটনাবলী তাঁর জানা আছে। আল্লা কি আর কোনও ব্যক্তিকে এরকম

স্মৃতিশক্তি দিয়েছেন ?

মহামান্য সেখ সেলিমের বংশোদ্ভূত সেখ কবিরকে তাঁর সাহস ও পুরুষোচিত গুণাবলীর জন্য আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালে 'সাজাত খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি। এখন তাঁকে এক হাজারি মনসবদার শ্রেণীতে নির্বাচিত করি।

সাবান মাসের ২৭শে (২৮শে ডিসেম্বর, ১৬০৫) মানসিংহের পিতৃব্য ভগবানদাসের পুত্র অক্ষয়রাজের পুত্রেরা বিসদৃশ আচরণ করে। তাঁর পুত্র অভয়রাম, বিজয়রাম ও শ্যামরাম অত্যন্ত দুর্বিনীত। অভয়রাম অনেক বেয়াদবি করলেও আমি সে দোষ উপেক্ষা করি। এই সময় আমার কাছে সংবাদ আসে যে এই শয়তান আমার কাছে কোনও অনুমতি না নিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিজের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে এবং পরে সে আমার পরিবারের শত্রু রাণার কাছে পালিয়ে যাবে। আমি এই ব্যাপারটি রামদাস ও অন্যান্য রাজপুত সর্দারদের গোচরে আনি এবং বলি যে তাঁদের মধ্যে যদি কেউ ওদের জামিন হতে পারেন তাহলে সমস্ত দোষ ক্ষমা করে ওদের জায়গীর বহাল রাখতে সম্মত আছি। কিন্তু তাদের গুরুতর ঔদ্ধত্যের কুৎসিত স্বভাবের জন্য কেউই জামিন হতে চাইলেন না। আমির-উল-উমরাকে বলি যে যখন এঁরা কেউ জামিন হতে অস্বীকার করছেন তখন কেউ জামিন স্বরূপ না দাঁড়ানো পর্যন্ত তাদের দরবারের কোনও কর্মচারীর হেপাজতে রাখতে হবে। আমির-উল-উমরা তাদের ভার ইব্রাহিম খান্ কাকর—যিনি পরে দিলওয়ার খাঁ পদবীতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং মঙ্গলির দ্বিতীয় পুত্র হাতিম—যিনি শা'নওয়াজ উপাধি পান—এই দুইজনের ওপর অর্পণ করেন। যখন তারা সেই মূর্খদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বলে তখন তারা তা অস্বীকার করে এবং সমস্ত শিষ্টতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা সভৃত্য ঝগড়া ও মারামারি করতে প্রবৃত্ত হয়। আমির-উল-উমরা ব্যাপারটি আমাকে জানান। আদেশ দিই—তাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। তিনি তখন তাদের দূর করে দেওয়ার ভার নিজেই নেন। আমি সেখ ফরিদকে তাঁর পেছন পেছন পাঠাই। তরবারি হাতে একজন রাজপুত এবং ছোরা হাতে আর একজন আমির-উল-উমরার সামনে দাঁড়ায়। কুতুব নামে তাঁর একজন অনুচর ছোরা হাতে রাজপুতটিকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হয়। আমির-উল-উমরার একজন আফগান ভৃত্য

তরোয়ালধারী রাজপুতটিকে হত্যা করে। দিলওয়ার খাঁ খাপ থেকে ছোরা বের করে অভয়রামের দিকে এগিয়ে যান। অভয়রাম ও আরও দুইজন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। দিলওয়ার খাঁ এই তিনজনের একজনকে আহত করেন এবং তাদের দ্বারা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। কয়েকজন আহদি ও আমির-উল-উমরার লোক তাদের দিকে রুখে যায় এবং তিনজনকেই হত্যা করে। একজন রাজপুত তরবারি নিয়ে সেখ ফরিদের দিকে ধাওয়া করে। কিন্তু একজন হাবসি ক্রীতদাস তাকে ধরাশায়ী করে। এই গোলমালটা ঘটে প্রকাশ্য প্রাসাদের উঠানে। এই শাস্তির ব্যাপারটি যারা ফলাফল বিচার না করে কাজ করতে অভ্যস্ত তাদের প্রতি সাবধান-বাণীর মত। আবুন্নবি আমার কাছে নিবেদন করেন যে এ রকম ব্যাপার উজবেগদের দেশে ঘটলে দলের সমস্ত পরিবার এবং সম্পর্কিত লোকদের ধ্বংস করা হতো। উত্তরে আমি বলি—এদের প্রতি আমার পিতা অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করতেন, আমিও তাদের সঙ্গে তেমনি ব্যবহারই চালিয়ে যেতে চাই। তাছাড়া একজনের দোষে সকলকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

সেখ হোসেন জামি—যিনি এখন দরবেশি আসনে বসেছেন এবং যিনি সিরাজের দরবেশের একজন শিষ্য—আমার সিংহাসনে বসার ছয় মাস আগে লাহোর থেকে আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—সাধুসন্তরা সাম্রাজ্যের ভার আল্লার দরবারে নির্বাচিত ব্যক্তির (জাহাঙ্গীর) হাতে তুলে দিলেন। ভবিষ্যতের এই শুভ ঘটনাটি জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তিনি আশা করেন যখন এই ঘটনা ঘটবে তখন যেন আমি খাজা জ্যাকেরিয়ার (যিনি মধ্য এসিয়ার বিখ্যাত সাধু খাজা অহ্‌রের বংশসম্ভূত) সমস্ত দোষ ক্ষমা করি।

তাসবেগ কুরচি রাজ্যের একজন পুরাতন ভৃত্য। আমার পিতা তাঁকে 'তাজ খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি দুই হাজারির শ্রেণীতে ছিলেন। আমি তাঁকে তিন হাজারির পদে উন্নীত করি। তক্‌লা বেগ কাবুলিকেও দুই হাজারি থেকে তিন হাজারি মনসবদারি দিই। তিনি খুব কার্যক্ষম ও সাহসী। আমার কাকা মির্জা মহম্মদ হাকিমের চাকরিতে তিনি খুব আস্থা অর্জন করেছিলেন। আমার পিতার পুরাতন ভৃত্য আবুল কাশিম তামকিনকে দেড় হাজারির পদ দিই। তাঁর মত ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব অল্প লোকেরই আছে। তাঁর ছেলে ত্রিশটি। মেয়ের সংখ্যা অত না হলেও তার অর্ধেক তো

নিশ্চয়ই হবে।

সেখ সেলিমের পৌত্র সেখ আলাউদ্দিনকে দুই হাজারির পদে উন্নীত করে 'ইসলাম খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি। তার সঙ্গে আমার নিবিড় সম্বন্ধ। শৈশবকাল থেকেই সে আমার সাথে বড় হয়েছে। আমার চেয়ে তার বয়স হয়তো বছর খানেকের ছোট হতে পারে। সে খুব সাহসী এবং মোলায়েম স্বভাবের যুবক। তার পরিবারের অন্য সকলের চেয়ে সে সব দিক দিয়েই কীর্তিমান। এ পর্যন্ত সে কোনও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেনি। আমার প্রতি তার আনুগত্য এমন যে আমি তাকে আমার পুত্র বলে সম্মানিত করি।

সৈয়দ মামুদ খান বারহার পুত্র আলি আসগর বারহাকে—সাহসে ও কার্যদক্ষতায় তাঁর অন্যের সঙ্গে তুলনা হয় না—'সইদ খাঁ' উপাধি প্রদান করি। এই সম্মান লাভে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ হয়। সত্যই তিনি একজন সাহসী যুবক। যখনই আমি শিকারে কিংবা অন্য কোনও কাজে বাইরে গিয়েছি তিনি সর্বদাই আমার একজন বিশ্বাসী সহকারীরূপে সঙ্গে গিয়েছেন। তিনি জীবনে কোনও দিন কোনওরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেননি। যৌবনেই যখন তিনি সুরাজাতীয় পদার্থ বর্জন করে থাকতে পেরেছেন, তখন ভবিষ্যতে তিনি নিশ্চয়ই চারিত্রিক উচ্চ মহিমায় মণ্ডিত হতে পারবেন। তাঁকে আমি তিন হাজারি মনসবদারিতে প্রতিষ্ঠিত করি।

মহম্মদ কুলি খাঁ বারলাসের পুত্র ফারিদুনকে এক হাজারির পদ থেকে দুই হাজারিতে উন্নীত করি। ফারিদুন চাঘতাই বংশসম্ভূত। তার মধ্যে পুরুষোচিত বীর্য ও সাহসের অভাব নাই।

সেখ সেলিমের পৌত্র সেখ বেজিদকে দুই হাজারি থেকে তিন হাজারির পদে বহাল করি। যে মহিলা আমাকে সর্বপ্রথম স্তন্যপান করিয়েছিলেন এবং তাও একদিনের বেশী নয়—তিনি সেখ বেজিদের জননী।

*

* *

একদিন হিন্দু পণ্ডিতদের—যাদের হিন্দুরা জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে করেন, বলেছিলাম—"আপনাদের ধর্মের নীতি অনুসারে সর্বশক্তিমান পবিত্র ঈশ্বর দশ রকম বিভিন্ন শরীরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এই মতবাদ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিছুতেই মানতে পারে না। এই উদ্ভট কল্পনা মেনে নিতে হলে এই ধারণায় আসতে হয়—যে ভগবান কোনও সীমার মধ্যে আবদ্ধ নন তিনি

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব নিয়ে সময় সময় আবির্ভূত হন। এই সব শরীরে ভগবানের জ্যোতির আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল এই কথা বলাই যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলে সেই জ্যোতি তাঁর সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেই সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে, এই দশটি দেহেই শুধু তাঁর অস্তিত্ব ছিল এ কথা বলার কোনও অর্থ হয় না। যদি এই ভাবধারার অর্থ এই হয় যে ভগবানের বিশেষ কোনও গুণাবলী বিশেষ কারও ওপর আরোপ করা—তাহলেও সেটা কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক ধর্মে ও শাস্ত্রে এমন অনেক বিস্ময়কর ও ঐন্দ্রজালিক কার্য-সম্পন্নকারী মানবদের কথা আছে যাঁরা তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য লোকদের চেয়ে জ্ঞানে ও বাগ্মিতায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন।"

অনেক বাদ-প্রতিবাদ ও নানা ব্যাখ্যার পর তাঁরা কার্যকারণহীন, অবয়বহীন এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন। তাঁরা বললেন—আমরা যখন অবয়বহীন কোনও ব্যক্তিত্বের কল্পনা করতে অশক্ত হয়ে পড়ি তখন একটি আকারকে অবলম্বন করে ঈশ্বরকে ধারণায় আনা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। সেইজন্যই এই দশ অবতারের মূর্তিতে ঈশ্বরকে চিন্তা করতে এবং তাঁকে জানতে চাই। আমি তাঁদের বলি—এই সব আকার কিভাবে আপনাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে পারে?

আমার পিতা প্রত্যেক ধর্ম ও মতের লোকদের বিশেষ করে পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি নিরক্ষর হলেও সদাসর্বদা জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলোচনার ফলে তাঁর কাছে সব কিছুই এমন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে কেউই বুঝতে পারত না যে তিনি সত্যই নিরক্ষর। গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে এমন সূক্ষ্ম জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন যে তাঁর বিদ্যার অভাব কেউ ধারণাতেই আনতে পারত না।

তাঁর দেহসৌষ্ঠব ছিল এইরূপ। দৈর্ঘ্যের দিকে প্রবণতা থাকলেও তাঁর উচ্চতা মাঝারি রকমের। গায়ের আভা গমের মত। চোখের মণি ও ভ্রূ কালো। শরীরের রং ফর্সার চেয়ে কালোই বলা চলে। তিনি ছিলেন সিংহদেহী, প্রশস্ত বক্ষ, হস্ত ও বাহুর গঠন দীর্ঘ। নাসিকার বামপাশে লোম-যুক্ত জরুল ছিল। খুব সুন্দর দেখাত সেই জরুলটি, আকারে আধখানি মটরের মত। যাঁরা দেহতত্ত্ব বিষয়ে পারদর্শী তাঁদের মতে এই জরুল-চিহ্ন মহান সম্পদ ও অপরিমিত সৌভাগ্যের চিহ্ন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর। কথা বলবার কিংবা কিছু ব্যাখ্যা করবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে একটি বিশেষ

ঐশ্বর্য প্রকাশ পেত। তাঁর কার্যে এবং গতিবিধিতে এই পৃথিবীর লোকের মত ছিলেন না তিনি। তাঁর মধ্য দিয়ে যেন ঈশ্বরের মহিমাই প্রকাশ পেত।

"রাজোচিত গুণে, চরিত্র মাধুর্যে
তিনি ছিলেন মহীয়ান।
যেন, নিজের অঙ্গুরী তার অঙ্গুলিতে
পরিয়েছেন স্থলেমান।"

আমার জন্মের তিন মাস পর সম্রাটের এক উপপত্নীর গর্ভে আমার ভগ্নী সাহাজাদী খানমের জন্ম হয়। তাকে আমার পিতামহী (আকবরের মাতা) মরিয়ম মাকানিকে দেওয়া হয়। তারপর পিতার আর এক উপপত্নীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। তার নাম দেওয়া হয়—সা মুরাদ। পার্বত্য দেশ ফতেপুরে তার জন্ম হওয়ায় তার ডাকনাম ছিল—পাহাড়ি। মহামান্য পিতা তাকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য পাঠালে সে কুসঙ্গে মিশে অত্যধিক সুরাপানে অভ্যস্ত হয়। তার ফলে বেরার প্রদেশে জালানপুরের নিকট ত্রিশ বছর বয়সে মারা যায়। তার গায়ের রং ছিল ফরসা। দেহ শীর্ণ, গঠন দীর্ঘ। তার চলনে-বলনে আত্মশ্লাঘা ও কর্তৃত্বের ভাব ও কাজে পৌরুষ ও সাহসিকতা প্রকাশ পেত।

৯৭৯ হিজরা সনের জুমিদ-ন-আওয়াল মাসের ১০ই তারিখ রাতে (সেপ্টেম্বর ১৫৭২) পিতার আর এক উপপত্নীর গর্ভে তাঁর আর একটি পুত্রের জন্ম হয়। আজমীরে মহামান্য খাজা মুইনুদ্দিন চিস্তির পবিত্র সমাধিস্থানের সেখ দানিয়াল নামে এক পরিচারকের গৃহে তার জন্ম হওয়ায় তার নাম রাখা হয় দানিয়াল।

আমার ভাই সা মুরাদের মৃত্যুর পর পিতা তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে পাঠান এবং নিজেই তার পিছন পিছন যান। মহান পিতা যখন আসিরগড় দুর্গ অবরোধ করেন, সেই সময় তাঁর বিশিষ্ট কর্মচারী খান্‌খানান্‌, তাঁর পুত্রগণ এবং মির্জা ইউসুফ খাঁ আমেদনগর দুর্গও আক্রমণ করেন। ঠিক যখন আসির দুর্গের পতন হয় সেই সময়েই তাঁর বিজয়ী কর্মচারীরা এই দুর্গও দখলে আনেন। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে পিতা 'আরস্‌ আসিয়ানি' বুরহানপুর থেকে মর্যাদার সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে আসার সময় ঐ প্রদেশের কর্তৃত্ব দানিয়ালের ওপর অর্পণ করে তাকে দখল দিয়ে আসেন। দানিয়াল সা মুরাদের মতই কুপথে চলে অতি সত্বর তেত্রিশ বৎসর বয়সে অত্যধিক সুরাপানের ফলে মারা যায়। অদ্ভুত ভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। সে ছিল অত্যন্ত বন্দুকের ভক্ত। বন্দুক দিয়ে শিকার করতে সে খুব ভাল-

বাসত। সে তার একটি বন্দুকের নাম দিয়েছিল—'ইয়াকা-উ-জান্‌জা' (শববাহী শকটের মত)। নিজে এই দ্বিপদী কবিতাটি লিখে সেই বন্দুকের গায়ে খোদাই করিয়েছিল—

"তোকে নিয়ে শিকারের আনন্দে আমি পাই সতেজ নব প্রাণ।
তোর আঘাত যার গায়ে লাগে শববাহী শকটে তার স্থান।"

তার সুরাপানের মাত্রা চরম হয়ে উঠলে সেই কথা বাবার কাছে পৌঁছায় এবং বাবা খান্‌খানানকে ভর্ৎসনা করে চিঠি লেখেন। অবশ্য খান্‌খানান তাকে সুরাপান করতে নিষেধ করেন এবং তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য কয়েকজন সতর্ক অনুচর নিযুক্ত করেন। তার কাছে সুরা আনার যখন সমস্ত পথ বন্ধ হয় তখন সে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করে। তার ভৃত্যদের অনুনয় করে বলতে থাকে তার কাছে যে কোনও উপায়ে মদ নিয়ে আসতে। মুর্শিদকুলি খাঁ নামে তার একজন বন্দুকধারী সৈনিক তার কাছে সব সময়েই থাকত। তাকে সে বলে, 'ইয়াকা-উ-জান্‌জার নলের মধ্যে মদ পুরে নিয়ে আয়।' অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় সেই সৈনিকটি এই কাজ করতে সম্মত হয় এবং সেই বন্দুকের নলের মধ্যে চোলাই করা মদ ঢেলে নিয়ে আসে। বন্দুকটি অনেকদিন থেকেই বারুদের গুঁড়া মাখামাখি ও বারুদের গন্ধে ভরপুর ছিল। বন্দুকের লোহার মরিচা মদের জারকগুণে গলে মদের সঙ্গে মিশে যায়। রাজকুমার সেই মদ পান করা মাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

"অশুভ চিহ্ন যেন কেউ না টানে।
যদি টানে, নিজের ওপরেই পড়বে সে টান,
যেন ভেবে রাখে মনে।"

দানিয়াল ছিল সুদর্শন ও ব্যবহারে মোলায়েম। হাতী ও ঘোড়া সে খুব ভালবাসতো। কারও ভাল হাতী আর ঘোড়া আছে শুনতে পেলে তার কাছ থেকে না নিতে পারা পর্যন্ত তার মনে স্বস্তি থাকত না। হিন্দী গানও সে ভালবাসত। কখনও কখনও হিন্দুস্থানী ভাষাতে বিশুদ্ধ শব্দবিন্যাস করে সে কবিতা লিখত। সে কবিতাও খারাপ হতো না।

দানিয়ালের জন্মের পর বিবি দৌলত সাদের গর্ভে সকরুন-নিসা বেগম নামে এক কন্যা হয়। বাবার কাছে কাছেই সে মানুষ হয়েছিল। সেজন্য সব দিক থেকেই সে ভাল হতে পেরেছিল। তার স্বভাব ছিল সুন্দর। সকলের ওপরই তার দরদ ছিল। শৈশবকাল থেকেই সে আমাকে খুব

ভালবাসত। আমাদের ভালবাসার মত এমন ভালবাসা ভাইবোনদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। ছোট শিশুদের বুক টিপে এক ফোঁটা দুধ বের করবার যে রীতি আছে, সেই রীতি অনুসারে আমার বোনের বুক টিপে দুধ বের করা হলে, আমার মাননীয় পিতা আমাকে বললেন—'বাবা, তুই এই দুধ খা যাতে তোর এই বোনকে মায়ের মত মনে হবে।' আল্লা যিনি সকলের মনের গোপন কথা জানেন, তিনি অবগত আছেন—এই বোনের প্রতি আমার ভালবাসা ঠিক জননীর প্রতি সন্তানের ভালবাসার মত।

কিছু পরে সেই বিবি দৌলত সাদের গর্ভে পিতার আর একটি কন্যা হয়। বাবা তার নাম রাখেন আরাম বানু বেগম। সে স্বভাবে হয়ে উঠেছিল ক্রোধী এবং উত্তেজনাপ্রবণ। বাবা তাকে খুব ভালবাসতেন। তার অশিষ্টতাকেও তিনি দোষের বলে মনে করতেন না। তাঁর মহান দৃষ্টিতে এবং অতিরিক্ত মমতায় তার দোষগুলিও খারাপ বলে মনে করতেন না। বারবার তিনি আমাকে বলতেন—'বাবা, আমি যখন থাকবো না, তখন আমার কথা ভেবেই তোমার এই বোনের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। কারণ, তোমার এই বোনটি আমার অতিশয় ভালবাসার পাত্রী—হিন্দী ভাষায় যাকে "পিয়ারী" বলে। এর অশিষ্টতা ও ঔদ্ধত্য উপেক্ষা করে এর প্রতি স্নেহশীল থেকো।'

আমার বাবার সদ্‌গুণ মুখের কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে কোনও প্রশংসা অতিরিক্ত বলে গণ্য হতে পারে না। তাঁর আদর্শ চরিত্র ও মেজাজের ব্যাখ্যা করে যদি বই লেখা যায় তাহলে তাতে অতিশয়োক্তির সন্দেহ কেউ করতে পারবে না। পুত্র তার পিতা সম্বন্ধে যত বেশী কিছুই বলুক না কেন তাঁর অনন্ত গুণাবলীর সম্বন্ধে তবু অল্পই বলা হবে।

তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য, ধনরত্ন, গুপ্ত সম্পদ, যা গণনায় আনা যায় না এবং কল্পনাও করা যায় না,—তাঁর যুদ্ধহস্তী, আরবী অশ্ব—এসব অতুল ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে দীনতার ভাব থেকে এক চুলও অতিক্রম করেননি। তিনি নিজেকে মনে করতেন সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে দীনতম। তিনি এক মুহূর্তও ঈশ্বরকে ভোলেননি।

"সর্বদা সর্বস্থানে, সকলের মধ্যে, সকল অবস্থায়—
অন্তরের দৃষ্টি গোপনে স্থির করে রাখ, সেই প্রিয়ের দিকে।"

তাঁর অতুলনীয় শাসনপদ্ধতির প্রশস্ত আঙ্গিনায় সকল ধর্মমতের বিদ্বজ্জনের

স্থান ছিল। অন্যান্য স্থানে যেমন পারস্যে শুধু সিয়াদের, তুরস্ক ও তুরানে সুন্নিদের এবং হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্মের স্থান।

ঈশ্বর-অনুগ্রহের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমস্ত শ্রেণীর ও সকল ধর্মমতের অনুসরণ-কারীরই স্থান আছে। সেই একই নিয়মে ছায়ার রাজ্যেও (ঈশ্বর—আলো, রাজা—ছায়া) সেই আলোর রাজ্যেরই গুণ থাকা উচিত। তাঁর রাজ্যেও—যা লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত—বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবক্তাদের ভালমন্দ সবরকম ধর্মবিশ্বাসের স্থান ছিল। সেখানে সমস্ত ঝগড়া বিবাদ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুন্নি ও সিয়া একই মসজিদে, খ্রীষ্টান ও ইহুদী একই গির্জায় তাদের নিজ নিজ ধর্মমত অনুসারে উপাসনা করত।

তিনি প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ধর্মমতের, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের সৎ লোকের সঙ্গে মিশতেন। সকলের প্রতিই উদার ব্যবহার করতেন। রাত তিনি জেগে কাটাতেন। দিনে তিনি অল্পসময় ঘুমোতেন। দিনে-রাতে তিনি দেড় ঘন্টার বেশী ঘুমোতেন না। রাতে তিনি যতটা সময় জেগে থাকতেন ততটা সময়ই তাঁর জীবনে যোগ হলো বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর সাহস এবং নির্ভীকতা এমন ছিল যে তিনি প্রচণ্ড মদমত্ত হাতীর উপর চড়ে তাকে বশে আনতে পারতেন। যেসব খুনী পুরুষ-হস্তী স্ত্রী-হস্তীদের কাছে আসতে দেয় না এবং বাগে পেলে মাহুত ও স্ত্রী-হস্তীদেরও হত্যা করতে পারে —তাদেরও পিঠে চড়ার সাহস তিনি রাখতেন। তিনি কোনও প্রাচীর অথবা গাছের ওপর থেকে, যখন কোনও মত্ত হস্তী তার মাহুতকে হত্যা করে বন্ধনহীনভাবে সেই জায়গার কাছ দিয়ে যেত তখন তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের ওপর ভরসা করে তার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়তেন। সেই পাগলা হাতীর পিঠে চড়ামাত্র সে বশে আসত ও তার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এরূপ ব্যাপার অনেকবার দেখা গেছে।

চৌদ্দ বছর বয়সে পিতা সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিধর্মী হিমুকে আফগান শাসক উচ্চপদে বসিয়েছিল। সেই বিধর্মী সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর অসংখ্য হস্তী সংগ্রহ করে—যা হিন্দুস্থানের কোনও রাজারই তখন ছিল না —দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। হুমায়ুন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আকবরকে পাঞ্জাব প্রদেশের পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আফগানদের বিতাড়িত করতে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময়েই হুমায়ুন ছাদের ওপর থেকে পড়ে মারা যান।

আমার পিতার শিক্ষক বৈরাম খাঁ ঐ প্রদেশের আমির ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিদের একত্রিত করে একটি শুভদিনে লাহোরের নিকট কালান্থর পরগণায় তাঁকে সিংহাসনে বসান।

হিমু দিল্লীর কাছাকাছি এসে পৌছালে তার্দি বেগ শহরে যে বিশাল সৈন্য-বাহিনী ছিল তাদের একত্রিত করে হিমুকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করে। প্রস্তুতির পর দুই পক্ষই পরস্পরকে আক্রমণ করে। কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর তার্দি বেগ ও মোগলদের ওপরই পরাজয়ের গ্লানি নেমে আসে। আলোর সেনা আঁধারের সেনার কাছে পরাস্ত হয়।

"সব কিছু—সব যুদ্ধ সব দ্বন্দ্ব
ঘটে ঈশ্বর ইচ্ছায়।
তিনিই জানেন শুধু কার হবে জয়।
বীরের রক্তে আর সেনানীর পদ-পিষ্ট ধূলায়
মাটি হয় রাঙা, স্বর্গ কালো হয়।"

তার্দি বেগ খাঁ এবং পরাজিত আর সকলে মহামান্য পিতার শিবিরে আসার রাস্তা ধরে। বৈরাম খাঁ তার্দি খাঁকে অপছন্দ করতেন। তার এই পরাজয়ে মৃত্যুদণ্ডের অজুহাত পেয়ে গেলেন তিনি।

এই অভিশপ্ত বিধর্মীর মন জয়ের অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠলো। সে তার হস্তীযূথ ও সৈন্য নিয়ে দিল্লী থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের মানসে অগ্রসর হতে লাগলো। মহামান্য সম্রাট আকবরও সেই সময় তাঁর বিখ্যাত সেনাদল নিয়ে কালান্থর থেকে তাকে প্রতিরোধ করতে বেরিয়ে এলেন। অন্ধকারের সেনার সঙ্গে আলোর সেনা মুখোমুখি হলো পাণিপথের কাছে। ৯৬৪ হিজরা সনের মহরম মাসের ২রা তারিখ (১৫৫৬, ৫ই নভেম্বর) বৃহস্পতিবার যুদ্ধ হয়। হিমুর সেনাবাহিনীতে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, অপরপক্ষে বিজয়ী সেনাবাহিনীতে গাজির সংখ্যা চার-পাঁচ হাজারের বেশী নয়। সেদিন হিমু হাওয়াই নামে হাতীর পিঠে ছিল। হঠাৎ একটা তীর এই বিধর্মীর চোখে বিঁধে মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এলো। তার সেনাদল এই ব্যাপার দেখেই পালাতে শুরু করে। সহসা সা কুলি খাঁ মহরম কয়েকজন সাহসী লোক সঙ্গে নিয়ে আহত হিমু যে হাতীতে ছিল সেইখানে উপস্থিত হয়। সে হাতীর মাহুতের দিকে তীর ছোঁড়ার উদ্যোগ করতেই সে বলে উঠলো—আমাকে মেরো না। হিমু এই হাতীতেই আছে। কয়েকজন তৎক্ষণাৎ হিমুকে হাতী থেকে নামিয়ে এনে সম্রাটের সম্মুখে হাজির করলো। বৈরাম

খাঁ প্রস্তাব করলেন—যদি সম্রাট তরবারি দিয়ে নিজের হাতে এই বিধর্মীকে আঘাত করেন তাহলে পুরস্কার স্বরূপ তিনি গাজি (ধর্মযোদ্ধা) পদবী লাভ করবেন এবং এই পদবী রাজকীয় ফর্মানে ব্যবহার করতে পারবেন।

সম্রাট উত্তর দিলেন—'আমি অনেক আগেই একে কেটে টুকরো টুকরো করেছি।' এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন—'একদিন কাবুলে খাজা আবদুস্ সামাদ সিরিণ কলমের সামনে আমি একটি ছবি আঁকছিলাম। আমার তুলিতে এমন একটা আকৃতি আঁকা হলো যার দেহের এক-একটা অংশ কাটা কাটা ও ছাড়া ছাড়া। আমার কাছে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল—ছবিটি কার। আমার জিভের আগে এই কথা এসে গেল যে ছবিটা হিমুর মত দেখাচ্ছে।' হিমুর রক্তে নিজের হাত দূষিত না করে তিনি একজন ভৃত্যকে তার শিরশ্ছেদ করতে আদেশ দিলেন। পরাজিত সেনাদলে মৃত্যুসংখ্যা, চারদিকে নানা জায়গায় যারা মরে পড়েছিল, তাদের বাদ দিলেও হাজার পাঁচেক হবে।

আকবর বাদশার আর একটি সুপরিকল্পিত কাজ হচ্ছে—তাঁর গুজরাট বিজয় অভিযানে অতি দ্রুত সেখানে গমন। তখন সেখানে মির্জা ইব্রাহিম হোসেন, মির্জা মহম্মদ হোসেন ও সা মির্জা বিদ্রোহ করে এবং এই প্রদেশের সমস্ত আমীর ঐদিককার গুণ্ডাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আহমেদাবাদ দুর্গ আক্রমণ করে। এই দুর্গে মির্জা আজিজ কোকা রাজকীয় সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিলেন। মির্জার মা জিজি আংগার মনের ব্যাকুলতার কথা উপলব্ধি করে তিনি একদল সৈন্য নিয়ে রাজধানী ফতেপুর থেকে অবিলম্বে গুজরাটের দিকে রওনা হয়ে যান। যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে দুই মাস লাগার কথা সেই পথ কখনও ঘোড়ায়, কখনও উট, কখনও বা বলদের গাড়িতে চড়ে তিনি মাত্র নয়দিনে অতিক্রম করে সারনাথে পৌছান।

হিজরি ৯৮০ সনের জমিদা-ল-আওয়াল মাসের ৫ই তারিখ (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৫৭২) তিনি শত্রুশিবিরের কাছাকাছি পৌছে যান। তাঁর অনুগত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে রাত্রেই শত্রুশিবির আক্রমণ করা হোক। সম্রাট বলেন—রাতে চুপি চুপি আক্রমণ দুর্বল লোক ও শঠের আচরণ। তিনি তৎক্ষণাৎ রণডঙ্কা বাজাতে এবং তাঁর পেছন পেছন অশ্বারোহী সৈন্যদের এগোতে আদেশ দেন। সবরমতী নদীর তীরে এসে সৈন্যদের শৃঙ্খলার সঙ্গে নদী পার হতে বলেন। বীর সৈন্যদের

রণধ্বনি শুনে মহম্মদ হোসেন মির্জা উত্তেজিত হয়ে ব্যাপার কি জানার জন্য এগিয়ে আসেন। সুভান কুলি তুর্কিও একদল সাহসী লোক নিয়ে শত্রু সমাবেশের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য নদীর তীরে উপস্থিত হন। মির্জা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—এসব কাদের সৈন্য। সুভান কুলি উত্তর দেন—সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের সৈন্য এরা। সেই হতভাগ্য কিন্তু তাঁর কথা বিশ্বাস করেন না, বলেন যে তাঁর গুপ্তচররা চোদ্দ দিন আগেও সম্রাটকে ফতেপুরে দেখে এসেছে সুতরাং সুভান কুলির কথা মিথ্যা। সুভান কুলি উত্তরে বলেন—নয়দিন আগে সম্রাট এই অভিযানের জন্য ফতেপুর থেকে রওনা হন।

"এত তাড়াতাড়ি কি করে হাতীরা আসতে পারে?"—মির্জা জিজ্ঞাসা করেন।

"হাতীর দরকার কি?" সুভান কুলি উত্তর দেয়—"যুবক আর বীররা যারা খাড়া পাহাড়ে চড়তে পারে, যারা মত্ত হাতীর চেয়েও দুর্ধর্ষ ও বিখ্যাত তারাই এসেছে। এইবার রাজআনুগত্য ও বিদ্রোহ এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ বোঝা যাবে।"

মির্জা এই কথাবার্তার পর ফিরে গিয়ে তাঁর সৈন্যদের প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। সম্রাট অপেক্ষা করতে লাগলেন। অগ্রগামী সৈন্যদের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে শত্রুসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। তিনি তখন অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি বারংবার খান আজমকে এগিয়ে যেতে আদেশ দিলেও সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁকে বলা হলো যে শত্রুরা বিশেষ পরাক্রান্ত ও সংখ্যায় বেশী। যতক্ষণ না গুজরাট দুর্গ থেকে রাজসৈন্য এসে পৌছচ্ছে ততক্ষণ নদীর এই পারেই সম্রাটের অপেক্ষা করা উচিত। মহামান্য সম্রাট তার উত্তরে বলেন—'সব সময়ই বিশেষ করে এই ব্যাপারে আমি আল্লার ওপর বিশ্বাস রেখেছি। যদি রুটিন মাফিক কাজ করা আমার উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌছাতে পারতাম না। আমাদের শত্রু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আর দেরি করা চলে না।' এই বলে রক্ষাকবচ হিসাবে আল্লার উপর একান্ত নির্ভরতা বুকে নিয়ে তাঁর ঘোড়াটিকে জলের মধ্যে নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে নিলেন—পছন্দকরা বিশ্বস্ত সহচর যাদের তিনি আগেই তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাছাই করে রেখেছিলেন। নদী পার হওয়ার কোনও সুবিধাজনক জলপথ থাকার সম্ভাবনা না থাকলেও তাঁরা নিরাপদে নদী পার হয়ে এলেন। শিরস্ত্রাণ দেওয়ার জন্য অস্ত্রবাহী

রক্ষীকে ডাক দিতেই সে তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে আসার সময় তাঁর 'বুফে' (মুখঢাকা মুখোশ) ফেলে দেয়। এই ব্যাপার দেখে তাঁর সঙ্গীরা এটাকে একটা অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত বলে মনে করে। কিন্তু তিনি বলে উঠলেন—এটা খুবই মঙ্গলের ব্যাপারের ইঙ্গিত। কারণ, এতে আমার আসল মুখই দেখা যাবে। ইতিমধ্যে হতভাগ্য মির্জা তার পৃষ্টপোষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তার সৈন্য সাজিয়ে ফেলেছে।

খান আজম একথা কল্পনাতেই আনতে পারেননি যে সম্রাট এই প্রদেশে তাঁরই অনুগ্রহের ছায়া ফেলতে আন্তরিকতার সঙ্গে এত দ্রুত উপস্থিত হয়েছেন। এই সংবাদ তাঁর কাছে যারা জানাতে এসেছিল – তাদের কথা তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি যতক্ষণ না তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান। তারপর গুজরাটের রাজকীয় সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই সময় আসফ খাঁও তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান। দুর্গ থেকে সৈন্যরা বের হওয়ার আগেই গাছের আড়াল থেকে শত্রুসৈন্য বেরিয়ে আসে। সম্রাট আল্লার অনুগ্রহই তাঁর সাহসের অবলম্বন স্বরূপ মনে করে এইদিকে অগ্রসর হন। মহম্মদ কুলি খাঁ ও তার্দি খাঁ দিওয়ানা একদল সাহসী সেনা নিয়ে এগিয়ে এসে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই তাঁরা বল্‌গা ঘুরিয়ে নিলেন। ব্যাপার দেখে সম্রাট ভগবানদাসকে বলেন—'শত্রুর সংখ্যা অগণিত আর আমাদের সৈন্য অল্প। আমরা সবাই একদিল একমুখ হয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে আক্রমণ চালাবো। কারণ খোলা হাতের চেয়ে বদ্ধমুষ্টি অনেক শক্তি ধরে।' এই কথা বলে তিনি খোলা তরবারি হাতে নিয়ে 'আল্লা হো আকবর, ইয়া মুইন' (আকবরের আরাধ্য সিদ্ধপুরুষ মুইনউদ্দিন চিস্তির নাম তিনি যুদ্ধহুঙ্কারে উচ্চারণ করতেন)—এই ধ্বনি করতে করতে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ শুরু করলেন।

"হুঙ্কারে চলে গেল সময়ের জ্ঞান।
চীৎকারে ছিন্ন হলো স্বর্গের কান।"

দক্ষিণ, বাম ও কেন্দ্রস্থলের সৈন্যরা ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল। শত্রুপক্ষ তারা-বাজি (কেকিবাই—একরকম বাজি, ফুলঝুরি বাজির মত) ছুড়তে লাগল। সেগুলো কাঁটাঝোপের মধ্যে পাক খেয়ে বিষম অবস্থার সৃষ্টি করল, ফলে শত্রুপক্ষেরই একটা বিখ্যাত হাতী ভয় পেয়ে এমন ভাবে ছুটতে লাগল যে শত্রু-সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। এই অবস্থা দেখে কেন্দ্রের

রাজকীয় সৈন্যরা এগিয়ে এসে মহম্মদ হোসেন আর তার দলবলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সম্রাটের চোখের সম্মুখেই মানসিং দরবারি তার বিপক্ষকে পরাস্ত করে। এই যুদ্ধে রঘুদাস কাছোয়া তার জীবন উৎসর্গ করে। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মহম্মদ ওয়াফা আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। আল্লার অনুগ্রহে—যিনি তাঁর অনুগত ভৃত্যদের রক্ষা করেন, এবং মহামান্য সম্রাটের সাহস ও সৌভাগ্যের জোরে শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই বিশাল জয়ের জন্য কৃতজ্ঞতায় সেই পরম দয়ালু স্রষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে মুখ আকাশের দিকে তুলে ধরে তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

একজন কালোয়াৎ (গায়ক) সম্রাটকে জানায় যে সইদ খাঁ কোকলতাস রাজ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাঁর জীবন-রত্ন উৎসর্গ করেছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়—যখন মহম্মদ হোসেন মির্জা কতকগুলি ইতর লোক নিয়ে সৈন্যব্যূহের মধ্যভাগ আক্রমণ করে সেই সময় সইদ খাঁ তার সম্মুখীন হন। বীরের মত যুদ্ধ করে তিনি শহিদ হন। মির্জা নিজেও আহত হয়। উল্লিখিত কোকলতাস জইন্ খাঁ কোকার বড় ভাই।

একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা লিখছি। এই যুদ্ধের আগের দিন যখন সম্রাট আহার করছিলেন সেই সময় তিনি হাজারাকে বলেন—কোন্ পক্ষ জিতবে কাঁধের ফলা দেখে বল দেখি। হাজারা কাঁধ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করায় পারদর্শী ছিল। সে বলে—জয় আপনারই হবে। কিন্তু আপনার সেনাপতিদের মধ্যে একজন যুদ্ধে শহিদ হবে।

সইদ খাঁ কোকা বলেন—'এই সৌভাগ্য যদি আমার ভাগ্যে ঘটে রে!'

'অনেক বাক্য মনে করি ঠাট্টা বলে।
তাই ফলে যায় গ্রহ বিরূপ হলে।'

মির্জা মহম্মদ হোসেন ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু তার ঘোড়ার পা কাঁটাঝোপে আটকাতেই সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। গদা আলি নামে সম্রাটের একজন আহদি তাকে দেখতে পায়। তাকে তার ঘোড়ার সামনের দিকে বসিয়ে সম্রাটের কাছে নিয়ে আসে। তাকে আটক করার গৌরব দুই-তিন জন দাবী করলে সম্রাট মির্জাকেই জিজ্ঞাসা করেন—কে তাকে বন্দী করেছে? সে উত্তরে বলে—সম্রাটের নিমক। এই সময় সে জল খেতে চায়। তার হাত পিছনদিকে বাঁধা ছিল। সম্রাট সামনের দিকে বাঁধতে হুকুম দিলেন। ফরহাত খাঁ নামে তাঁর একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস তার মাথায় আঘাত করায়

সম্রাট তার কাজ অনুমোদন না করে তাঁর নিজের জন্য রাখা পানীয় জল আনিয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

এ পর্যন্ত মির্জা আজিজ কোকা ও তাঁর সেনারা দুর্গের বাইরে আসেনি। মির্জাকে বন্দী করার পর সম্রাট ধীরে ধীরে আমেদাবাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি মির্জাকে রায়রায় সিং রাঠোর নামে একজন রাজপুত সর্দারের হাতে অর্পণ করে তাকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসতে বলে যান। ইতিমধ্যে ইখ্‌তি ইয়ারুল নামে একজন প্রভাবশালী গুজরাটি সর্দার প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য এসে পড়ে। রাজসৈন্যদের মধ্যে তখন ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। রাজ-জনোচিত সাহস ও মেজাজের অধিকারী সম্রাট বিপক্ষ সৈন্যের উপস্থিতি দেখে রণডঙ্কা বাজানোর আদেশ দিলেন। সাজাত খাঁ, রাজা ভগবানদাস ও আরও অনেকে শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি হয়ে আক্রমণ চালালেন। শত্রুপক্ষ মির্জা মহম্মদ হোসেনকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে আশঙ্কা করে রায়রায় সিংয়ের লোকেরা উপরি উল্লিখিত রাজার (ভগবানদাস) উপদেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে তার শিরশ্ছেদ করে। পিতা তাকে হত্যা করতে চাননি। ইখ্‌তিইয়ার-উল-মুলকের সেনারা বিতাড়িত হলো, আর সে নিজে ঘোড়ার পিঠ থেকে কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ে গেল। সুরাব বেগ তুর্কি তার মাথা কেটে নিয়ে আসে। সংখ্যা কম হলেও এই সেনারাই আল্লার অনুগ্রহে ও তাঁরই ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে এই অসম যুদ্ধে জয়ী হলো।

এই রকম অভাবিত ভাবেই বহু দেশ বিজয়, চিতোর ও রণ্‌ভাস ভোরের ন্যায় হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার, খান্দেশ প্রদেশের বশ্যতা, আসির দুর্গ জয় ও অন্যান্য প্রদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি বীর রাজকীয় সৈন্যদের পরাক্রমে সম্পন্ন হলো।

চিতোরের যুদ্ধে সম্রাট নিজের হাতে দুর্গাধ্যক্ষ জিৎমলকে হত্যা করেন। বন্দুক চালনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যে বন্দুক দিয়ে তিনি জিৎমলকে বধ করেন তার নাম 'সংগ্রাম'। এই বন্দুকে তিনি তিন-চার হাজারের মত পশুপক্ষী শিকার করেছিলেন। আমি তাঁর উপযুক্ত শিষ্য বলে গৌরব বোধ করি। সমস্ত ব্যসনের মধ্যে বন্দুক চালনাই আমার প্রধান। একদিনে বন্দুকের গুলিতে আমি আঠারোটি হরিণ শিকার করেছি।

মহামান্য পিতা যে সব কঠোর নিয়ম পালন করতেন তার মধ্যে একটি

হলো পশুমাংস না গ্রহণ করা। বছরে তিন মাস তিনি মাংস খেতেন এবং অবশিষ্ট নয় মাস স্থফি সম্প্রদায়ের বিধিমাফিক খাদ্যেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি পশুহত্যা পছন্দ করতেন না। কতকগুলি নির্দিষ্ট দিনে ও কয়েকটি মাসে তিনি রাজ্যে পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। যে সব দিনে ও মাসে তিনি মাংস খেতেন না তা আকবরনামায় উল্লেখ আছে।

যেদিন ইতিমাদু-দ-মুল্‌ককে দেওয়ানের পদ প্রদান করি সেই দিনেই মুইজজুল্-মুলক্‌কে দেওয়ানি-ই-বুইউতাতের (অট্টালিকা-তত্ত্বাবধায়ক) ভার অর্পণ করি। শেষোক্ত ব্যক্তি বাখার্জের (মাসাদ) সৈয়দ বংশীয়। আমার পিতার আমলে তিনি কুরকরাকের (পশুলোম দপ্তর) হিসাবরক্ষক ছিলেন।

আমার রাজ্যাভিষেক উৎসবের সময় একদিনেই একশ আকবরি ও জাহাঙ্গীরি কর্মচারীদের উচ্চপদ এবং জায়গীর দান করি। সিংহাসনে উপবেশন করার পর প্রথম রমজান্ ইদ আরম্ভ হলে আমার পুণ্য সিংহাসন থেকে নেমে 'ইদগায়' আসি। সেখানে অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছিল। যথারীতি প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর প্রাসাদে ফিরে আসি। 'রাজার কাছ থেকে ভিক্ষুকের কাছে অনুগ্রহ নেমে আসে'—এই প্রবচন অনুসারে কিছু অর্থ ভিক্ষায় ও দানে বিতরণ করার আদেশ দিলাম। কয়েক লক্ষ পয়সা (দাম) দোস্ত মহম্মদ (পরে খাজা জাহান)-কে দেওয়া হয়। সেই অর্থ সে ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। জালালউদ্দিন হোসেন আঞ্জু (শব্দকোষ সঙ্কলক), মির্জা সদর জাহান ও মির মহম্মদ রিজা সবজাওয়ারি—প্রত্যেককে শহরের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় খয়রাতির জন্য এক লক্ষ দাম দেওয়া হয়। সেখ মহম্মদ হোসেন জামির দরবেশদের কাছে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাই। আদেশ দিই যে প্রহরীদের মধ্যে একজন প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার দাম যেন ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করে।

খানখানানকে একটি রত্নখচিত তরবারি উপহার পাঠাই। জামালুদ্দিন আঞ্জুকে তিনহাজারি মনসবদারিতে উন্নীত করি। সদর অফিসের ভার মিরণ সদর জাহানের উপর দেওয়া হয়। আমার পিতার পালিত ভগ্নী হাজি কোকাকে নির্দেশ দিই যে তিনি যেন এমন স্ত্রীলোকদের আমার কাছে প্রাসাদে উপস্থিত করেন যারা জমি ও অর্থ পাওয়ার উপযুক্ত। মহম্মদ সাদিক খাঁয়ের পুত্র জাহিদ খাঁকে দেড় হাজারি থেকে দুই হাজারি মনসবদারি প্রদান করি।

একটা রীতি ছিল—কাউকে হাতী কিংবা ঘোড়া দান করা হলে নকিব ও

মির আখুরামরা (আস্তাবলের কর্মচারী) সেই ব্যক্তির কাছ থেকে জিলাওয়ানা (ঘোড়ার লাগামের জন্য অর্থ) আদায় করত। আমি আদেশ দিই যে এই অর্থ সরকার থেকেই দিতে হবে যাতে লোকে (দানগ্রহীতা) এ ধরনের কর্মচারীদের দাবি ও জুলুম থেকে মুক্ত থাকে।

এই সময় বুরহানপুর থেকে আমার পরলোকগত ভাই দানিয়ালের হাতী ও ঘোড়া শালবাহন আমার কাছে নিয়ে আসে। হাতীর মধ্যে 'মস্ত আলস্ত' নামে একটা মর্দা হাতী আমার কাছে সব চেয়ে ভাল মনে হলো। আমি তার নাম রাখি—'নূর গজ'। এই হাতীর শরীরে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যেত। এর দুই কানের পাশে ছোট তরমুজের আকারের দুইটি মাংসপিণ্ড জন্মেছিল। হাতীর যৌন উত্তেজনার সময় যেরকম মদক্ষরণ হয় এই মাংসপিণ্ড থেকেও সেইরকম ফোঁটা ফোঁটা রস বের হতো। তা ছাড়া এর কপালের ওপরটা অন্য হাতীর চেয়ে আরও উঁচু। হাতীটি সত্যই চমৎকার এবং দেখার মত।

আমার পুত্র খুররাম (সাজাহান)-কে মণিখচিত জপমালা দিই। আমার আশা এই যে জাগতিক ও আত্মিক ব্যাপারে তার মনের কামনা সিদ্ধ হবে।

আমার রাজ্যে আমি কোটি কোটি টাকার শুল্ককর রদ করি। হিন্দুস্থানে প্রবেশপথে কাবুল একটি বড় শহর। সেখান থেকে ভারতে ঢোকার প্রবেশ-করও (সাইর-জিহাত) আমি তুলে দিই। এই কর থেকে এক কোটি তেইশ লক্ষ দাম আদায় হতো। কাবুল ও কান্দাহার প্রদেশ থেকে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক (জকাত) আদায় হতো। এই করই এই প্রদেশগুলির প্রধান রাজস্ব ছিল। এই প্রাচীন কর আমি তুলে দিই। এতে ইরাণ ও তুরাণের লোক খুবই উপকৃত হয়।

বেহার সুবায় আসফ খাঁয়ের জায়গীরটি বাজবাহাদুরকে দেওয়ায় পাঞ্জাবের একটি জায়গীর আসফ খাঁকে দেওয়ার আদেশ দিই। তিনি আমাকে জানান যে তাঁর আগেকার জায়গীরে অনেক বাকিবকেয়া পড়ে আছে। জায়গীর পরিবর্তন হওয়ায় তাঁর পক্ষে পুরানো জায়গীর থেকে বকেয়া খাজনা আদায় করা কঠিন হবে। আমার কোষাগার থেকে তাঁকে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার আদেশ দিলাম। আরও আদেশ দিই যে বাজবাহাদুরের কাছ থেকে তাঁর জায়গীরের বকেয়া খাজনা সরকারী রাজস্ব হিসাবে আদায় হবে।

সরিফ আমুলিকে আড়াইহাজারি মনসবদারিতে উন্নীত করি। তিনি পবিত্র অন্তঃকরণ ও খোশমেজাজের লোক। তাঁর মধ্যে বর্তমান বিজ্ঞানের

জ্ঞান কণামাত্রও ছিল না কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চাঙ্গের কথা এবং গভীর জ্ঞানের ভাব ব্যক্ত হতো। ফকিরের পোশাকে তিনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন এবং অনেক মহাত্মাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্বন্ধে অনেক সারবান কথা তাঁর মুখস্থ আছে। কিন্তু এটা তাঁর কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অনুশীলনে নয়। মহামান্য পিতার আমলে দরিদ্র ও সাধুর পোশাক ত্যাগ করে তিনি আমীরি ও সর্দারি লাভ করেন। তাঁর উক্তিগুলি অত্যন্ত জোরালো। কথাবার্তায় বাগ্মিতা ও পবিত্রতা প্রকাশ পায় যদিও তিনি আরবী ভাষা জানেন না। তাঁর রচনাবলী উদ্দীপনা ও প্রেরণা দান করে।

সা কুলি খাঁর আগ্রাতে একটি উদ্যান ছিল। তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় আমি এইটি হিন্দল মির্জার কন্যা রুকাইয়া সুলতান বেগমকে দিই। তিনি আমার পিতার সম্মানীয়া পত্নী (প্রথমা বিবাহিতা পত্নী)। আমার পুত্র খুররামকে পিতা এঁরই তত্ত্বাবধানে রাখেন। খুররাম যদি তাঁর নিজের ছেলেও হতো—তার চেয়েও হাজার গুণ ভালবাসা সে তাঁর কাছে পেয়েছিল।

নওরোজ উৎসব

হিজরা ১০১৪ সনের জিস্কদ সালের ১১ই তারিখ মঙ্গলবার রাত্রে (১১ই অথবা ১২ই মার্চ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে) মহান জ্যোতিষ্ক রবি মীন রাশি থেকে তাঁর উচ্চস্থান মেষ রাশিতে গমন করেন। আমার শুভ রাজ্যাভিষেকের পর এই প্রথম নওরোজ। আদেশ দিই যে প্রাসাদস্থ আমার নিজ ব্যবহারের কক্ষগুলি ও জনসাধারণের প্রবেশাধিকারের জন্য উন্মুক্ত সুবৃহৎ কক্ষের বারান্দাগুলি মনোরম সাজে সাজাতে হবে যেমন আমার পিতার আমলে সূক্ষ্ম রেশমের কাপড় দিয়ে সাজানো হতো। নওরোজের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যখন সূর্য আসেন মেষের ঊনবিংশ ডিগ্রীতে, জনসাধারণ আনন্দ ও ভোগের বন্যায় গা ভাসিয়ে দেয়। সকল জাতি ও ধর্মের গায়ক ও বাদকরা এক জায়গায় একত্রিত হয়। ভারতের নর্তক-নর্তকী ও যাদুকর যারা নৃত্যকলা ও যাদুবিদ্যায় দেবদূতদেরও বিমোহিত করতে পারে তারাই জনতার মন আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরিয়ে তুললো। হুকুম দিলাম—যদি কেউ সুরাপান করতে বা উত্তেজক দ্রব্য খেতে চায় তাকে যেন কোনও রকম বাধা দেওয়া না হয়।

“পেয়ালা-বরদার ! ভর্তি করেছ পেয়ালা
সুরার-আলোয়।
গাও চারণ গাও,—আমার ইচ্ছা পূরণই
পৃথিবীর আদেশ।”

পিতার সময় এই প্রথা চলতি ছিল যে উৎসবের সতেরো-আঠারো দিনে এক-একদিন এক-একজন সম্ভ্রান্ত কর্মচারী সম্রাটকে বাছাই করা নানা দ্রব্য, যেমন মণিমুক্তা, মণিমুক্তার তৈরী জিনিস, বহুমূল্য পশমী বস্ত্রাদি, হাতী ও ঘোড়া উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর গৃহে আহ্বান করবেন এবং সম্রাটও কষ্টস্বীকার করে তাঁর সভায় গমন করবেন। তাঁর কর্মচারীদের উৎসাহ বর্ধন ও সম্মান দানের জন্য তিনি যেতে সম্মত হবেন। তিনি একবার সমস্ত উপহারের দিকে চেয়ে দেখবেন এবং যেটি তাঁর ইচ্ছা সেইটি গ্রহণ করে অন্য সমস্ত উপহার উৎসবের উদ্যোক্তাকে ফেরত দেবেন।

আমার অন্তর তখন সৈন্য ও প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় পূর্ণ থাকায়

এ বছর আমি সকলের উপহার দ্রব্যই প্রত্যর্পণ করি। কেবলমাত্র অল্প কয়েকজন আমার সব সময়ের সঙ্গী অনুচরদের মনস্তুষ্টির জন্যই কয়েকটি জিনিস গ্রহণ করি। এই সময়ের মধ্যে আমি কয়েকজনকে উচ্চপদ প্রদান করি। খান আফগানকে দেড় হাজারির পদ দিই। পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের জমিদার রাজা রাওকে—যিনি সম্রাটপুত্র থাকার সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমার প্রতি সমান আনুগত্য দেখিয়ে আমার কাজ সম্পাদন করে আসছেন—দেড় হাজারি মনসবদারি থেকে সাড়ে তিন হাজারিতে উন্নীত করি। রাণা শঙ্করকে তার খরচের জন্য বারো হাজার টাকা দিই।

আমার রাজত্বের প্রারম্ভে সেই মুজাফ্ফর গুজরাটির এক পুত্র সেই দেশের রাজার বংশধর বলে নিজেকে জাহির করে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে আমেদাবাদ নগর এবং তার নিকটবর্তী স্থান আক্রমণ করে লুটতরাজ শুরু করে। কয়েকজন সর্দার যেমন ইব্রাহিম বাহাদুর উজবেগ ও রায় আলি ভাটি—যাঁরা সেখানকার প্রসিদ্ধ ও সাহসী লোক ছিলেন এই বিদ্রোহের সময় হত হন। অবশেষে ছয় সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাজা বিক্রমজিৎ এবং আরও কয়েকজনকে গুজরাটের সৈন্যদের সাহায্যের জন্য পাঠাই। ঠিক হয় বিদ্রোহীরা বিধ্বস্ত হবার পর যখন ওদিককার অবস্থা শান্ত হয়ে আসবে তখন রাজা বিক্রমজিৎ গুজরাটের সুবেদার হবেন। কিলিজ খাঁ যিনি আগে এখানকার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি দরবারে ফিরে আসবেন। রাজসৈন্যরা পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের একতার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তারা নানা দিকের অরণ্যে আশ্রয় নিল। দেশে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরে এলো। এই জয়ের বার্তা আমার দরবারে এসে পৌছালো শুভ নওরোজের সময়।

এই সময়ই আমার পুত্র পরভেজের কাছ থেকে সংবাদ আসে যে রাণা থানা মণ্ডল থেকে পালিয়েছে। এই জায়গা আজমীর থেকে ত্রিশ-চল্লিশ ক্রোশ দূরে। তার পেছনে একদল সৈন্য ধাওয়া করেছে। আশা করা যায় জাহাঙ্গীরের সৌভাগ্যেই রাণাকে এইবার পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। নওরোজের শেষ উৎসবের দিন রাজ্যের অনেক কর্মচারী অনুগ্রহ লাভ করেন ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পুরাতন কর্মচারী পিশরু খাঁ হুমায়ুনের সঙ্গে পারস্য থেকে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পারস্যের রাজা সা তমাস্‌পই তাঁকে হুমায়ুনের সঙ্গে পাঠান। তাঁর নাম ছিল—মিহিতার সাদৎ। আমার পিতার সময় তিনি ফরসিখানার

দারোগা ও এই দপ্তরের প্রধান ছিলেন। তাঁর মত কর্মী এই দপ্তরে না থাকায় আমার পিতা তাঁকে 'পিশরু খাঁ' (কর্মী) উপাধি দেন। যদিও তিনি নিম্নপদের কর্মচারী ও কারিগরশ্রেণীর ছিলেন—কিন্তু দীর্ঘদিনের কাজের কথা বিবেচনা করে তাঁকে দুই হাজারি মনসবদারির শ্রেণীতে বসাই।

আমার রাজ্যাভিষেকের প্রথম বৎসরের মাঝামাঝি খসরুর পলায়ন

যৌবনের উত্তেজনার বশে, দূরদৃষ্টির অভাবে এবং অভিজ্ঞতাহীন অপদার্থ সঙ্গীদের প্ররোচনায় আমার পিতার অসুস্থ অবস্থায় খসরুর মনে নানা অসার কল্পনা উদিত হয়। তার এইসব অদূরদর্শী সঙ্গীরা তাদের কৃত অপরাধ ও কুকর্মের প্রাবল্যে ক্ষমার অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তারা মনে করেছিল যে খসরুকে তাদের ক্ষমতা দখলের অস্ত্রস্বরূপ তৈরী করে তারই মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে। তারা এই সত্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল যে রাজ্য পরিচালনার কাজ এবং পৃথিবী শাসন কতকগুলি অপদার্থ ও বুদ্ধিহীন লোকের দ্বারা হতে পারে না। ন্যায়পরায়ণ স্রষ্টিকর্তা রাজ্য পরিচালনার কাজ তারই উপর অর্পণ করেন যাকে তিনি এই মহৎ কার্যের উপযুক্ত বলে মনে করেন এবং তাকে এই সম্মানের পরিচ্ছদে ভূষিত করেন।

"আল্লা দেন সম্পদ
তাঁরই চিহ্নিত মানুষকে।
সে সম্পদ কি কেড়ে নিতে পারে কেউ ?
রাজমুকুট আর রাজাসন কি কেনা যায় ?
আল্লা যাকে পরিয়েছেন রাজমুকুট—
সে মুকুট কেড়ে নেওয়া পাপ।"

ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন রাজদ্রোহীদের ব্যর্থ কল্পনা তাদের অপমান ও অনুশোচনার কারণ হয়। আল্লার সিংহাসনের কাছে নিয়ত প্রার্থনাশীলের ওপরই এই রাজ্যের পরিচালনার ভার বহাল থাকে। খসরুর উন্মনা ও হত-বুদ্ধিকর ভাব আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তার ওপর আমার স্নেহবশতঃ তার মন থেকে ভীতি ও আতঙ্ক দূর করারও ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই লাভ হলো না। পরিণামে যাদের ভাগ্য বিপর্যয় নিশ্চয় ঘটবে এমন কয়েকজনের পরামর্শে জিলহিজ্জা মাসের ৮ই তারিখ রবিবার (৬ই এপ্রিল ১৬০৫) রাতের দুই ঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর খসরু পরলোকগত সম্রাটের (আকবর) সমাধিস্থলে যাওয়ার ভান করে তার সদাসঙ্গী ৩৫০ জন অশ্বারোহীকে সঙ্গে

নিয়ে আগ্রা দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই একজন আলো-বরদার তার পরিচিত ওয়াজির-উল্-মুলককে খসরুর পলায়নের কথা জানায়। উজির তাকে আমির-উল-উমরার কাছে নিয়ে যায়। এই সংবাদ সত্য বলে অনুমান করে তিনি আমার নিজ কক্ষের দরজার কাছে এসে একজন খোজাকে বলেন—'আমার সেলাম সম্রাটকে জানিয়ে বল যে আমার একটি অতি প্রয়োজনীয় জরুরী নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করতে হবে। সম্রাট যেন এখুনিই বাইরে আসেন।' এই ব্যাপারটির আভাস আমি ধারণাতেও আনিনি। মনে করলাম—গুজরাট কিংবা দাক্ষিণাত্য থেকে বোধ হয় কোনও সংবাদ এসেছে। বাইরে এসে তাঁর কাছ থেকে এই সংবাদ শুনে জিজ্ঞাসা করি—কি করা উচিত এখন? আমি নিজেই রওনা হব না খুররামকে পাঠাব?

আমির-উল-উমরা নিবেদন করলেন, আদেশ পেলে তিনিই যেতে পারেন। আমি বললাম—তাই হোক।

কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন—'আমার উপদেশ যদি তিনি শুনেও না ফিরে আসেন তাহলে আমার কি করা উচিত হবে?'

তাঁর কথা শুনে আমি বলি—যদি সে ঠিক রাস্তায় চলতে অস্বীকার করে তবে আপনার বিবেচনা মত যে কাজই করবেন তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। সম্রাটের কাছে পুত্র কিংবা জামাতার কোনও বিশেষ খাতির নাই। রাজার কেউই আত্মীয় নয়।

এইসব কথা বলবার পর তাঁকে বিদায় দিয়েই আমার মনে হলো খসরু তাঁর ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তা ছাড়া তাঁর পদগৌরব এবং তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা তাঁর সমকক্ষ সমসাময়িক ব্যক্তিদের ঈর্ষার কারণ হয়েছে। হয়তো এই সুযোগে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধ্বংস করবে। এই কথা বিবেচনা করে মুইজুল-মুল্ককে তাঁর কাছে পাঠিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলি। তাঁর জায়গায় সেখ ফরিদ বকশীকে নিযুক্ত করে আদেশ দিই যে তিনি যেন উপস্থিত মনসবদার ও আহদিদের সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে রওনা হয়ে যান। কোতোয়াল ইতিমাস খাঁকে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত করে পাঠাই। স্থির করি যে আল্লার ইচ্ছা থাকলে ভোর হলেই আমিও রওনা হব। মুইজুল-মুল্ক আমির-উল-উমরাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

এই সময় আমেদ বেগ খাঁ ও দোস্ত মহম্মদ খাঁকে কাবুলে যাওয়ার জন্য

পাঠাই। তারা সিকান্দ্রা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এটা খসরুর রাস্তার ওপর পড়ে। সে সেখানে পৌঁছালে তারা (আমেদ বেগ ও দোস্ত মহম্মদ) আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপার বুঝতে পারে। তারা তৎক্ষণাৎ সিকেন্দ্রা থেকে ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে যে খসরু পাঞ্জাবের রাস্তা ধরেছে এবং খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমার তখন মনে হলো সে হয়তো পথ পরিবর্তন করে অন্য কোথায়ও যেতে পারে। তার মামা মানসিংহ তখন বাংলায়। আমার অনেক কর্মচারীরই মনে হয়েছিল যে খসরু হয়তো সেইদিকেই যাবে। আমি চারদিকে সঠিক সংবাদ আনার জন্য লোক পাঠাই এবং নিশ্চিত সংবাদ পাই যে সে পাঞ্জাবের দিকেই যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে প্রভাত হলো। আল্লার মহিমা ও অনুগ্রহের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে ঘোড়ার পিঠে চড়েবসি। আমার যাত্রার উদ্যোগের কোনও প্রতিবন্ধক হলো না।

> "দুঃখ যাকে করে অনুসরণ,
> জানে না সে কেমন সে পথ—
> যে পথে সে করিবে ভ্রমণ।
> সে জানে শুধু—
> হতাশা নিয়ে যায় তাকে তাড়া করে।
> জানে না সে—
> কার সাথে করে বিচরণ,
> কাকে বা সে পেছনে ফেলে রাখে।"

শহর থেকে তিন ক্রোশ দূর মহামান্য পিতার সমাধিস্থলে পৌঁছিয়ে তাঁর মহান আত্মার কাছে অভয় ভিক্ষা করলাম। ঠিক এই সময়েই মির্জা সারুখের পুত্র মির্জা হাসানকে বন্দী করে আমার কাছে আনা হয়। সে খসরুর কাছে যাওয়ার মতলব করেছিল। আমি তাকে প্রশ্ন করলে সে অস্বীকার করতে পারলো না। তার হাত বেঁধে হাতীর পিঠে তুলতে আদেশ দিলাম। সেই মহান আত্মার কাছে আমার প্রার্থনার প্রথম শুভফল এটা।

দুপুরবেলা অসহ্য গরম। কিছুক্ষণের জন্য গাছের ছায়ায় বসি। খান আজমকে বলি আমাদের ধৈর্য এতদূর যে এখন পর্যন্ত ভোরে যেটুকু আফিং খাওয়ার অভ্যাস এবং যা প্রত্যুষে সর্বপ্রথম খাওয়ার নিয়ম, তা খেতে ভুলে গেছি। আর আমাদের এই বিস্মৃতির কথা কেউ মনে করিয়ে দেয়নি। তাহলে

কল্পনা করা যায়, আমাদেরই যদি এই অবস্থা তাহলে সেই ভ্রষ্ট রুচিজ্ঞানহীন খসরুর মনের অবস্থা কি।

আমার মনোবেদনা এই। আমার পুত্র কোনও সঙ্গত কারণ ও যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও আমার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়ে শত্রুতাচরণ করছে। যদি আমি তাকে আটক করার কোনও চেষ্টা না করি তা হলে এ দেশের ঝগড়াটে আর বিদ্রোহী মনোভাবসম্পন্ন লোকেরা তাকে হাতের পুতুল করে হাঙ্গাম বাধানোর চেষ্টা করবে অথবা সে নিজেই উজবেগ অথবা পারস্যবাসীদের কাছে যেয়ে তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এতে আমার সরকার ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠবে। এইজন্য তাকে বন্দী করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। অল্প একটু বিশ্রাম করেই আগ্রা থেকে কুড়ি ক্রোশ দূর মথুরা পরগণা থেকে আরও দুই তিন ক্রোশ এগিয়ে এই পরগণারই একটি গ্রামের পুকুরের ধারে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি।

খসরু মথুরায় পৌঁছানোর পর তার হুসেন বেগ বাদাক্‌সির সঙ্গে দেখা হয়। হুসেন বেগ আমার পিতার কাছ থেকে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছিল। সে কাবুল থেকে আমার কাছেই আসছিল। বাদাক্‌সিদের স্বভাবই হচ্ছে দাঙ্গাবাজি, আচরণ রাজদ্রোহকর। খসরু তার সঙ্গে মোলাকাত ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই মনে করল। সে হোসেন বেগকে বাদাক্‌সানের যে দুই-তিন শ' লোক তার সঙ্গে আসছিল তাদের সেনাপতি ও চালক নির্বাচিত করে।

যাদের সঙ্গে এই দলের দেখা হয়েছে তাদেরই ঘোড়া ও জিনিসপত্র তারা লুঠ করেছে। এই বদমায়েশরা ব্যবসায়ী ও মালবহনকারীদের জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। যেদিকেই এরা গিয়েছে সেখানকার স্ত্রী ও শিশুরাও এদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। খসরু নিজের চোখেই প্রতি মুহূর্তে এই অত্যাচার দেখেছে—যে অত্যাচার তারই পিতৃপুরুষদের রাজত্বে ঘটেছে। এইসব শয়তানদের কদর্য কাজ লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই সে প্রতি মুহূর্তে হাজারবার মৃত্যুকামনা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এই অবস্থাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং এই কুকুরদের কাজে সায় দিয়েছে। সৌভাগ্য এবং দৈব তাকে সাহায্য করলে তার কাজে অনুতপ্ত হয়ে যে কোনও রকম ছলনার আশ্রয় না নিয়ে আমার কাছেই ফিরে আসত। আল্লা যিনি সমস্ত গোপন রাজ্যের খবর রাখেন তিনি নিশ্চয় জানতেন যে আমি তার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে তাকে এমন অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখাতাম যে তার মনেও এক চুল

পরিমাণ বিরোধের ভাব ও ভীতি থাকত না। পরলোকগত সম্রাটের জীবনকালেই কয়েকজন রাজদ্রোহীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা তার মনে জেগেছিল। সে একথাও জানত যে তার মনের ভাবটাও আমি বুঝে ফেলেছি। সুতরাং আমার দয়া ও স্নেহের প্রতি তার কোনও বিশ্বাস ছিল না। পুত্রের ব্যবহারে ও চালচলনে এবং তাঁর ভাই মাধো সিংহের কদর্য আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আমার স্ত্রী আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালেই আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর গুণাবলী ও মহত্ত্বের কথা কি লিখব? অদ্ভুত বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি। আমার প্রতি তাঁর অনুরাগ এত গভীর ছিল যে আমার একটি কেশের জন্য তিনি হাজার পুত্র, হাজার ভাই ত্যাগ করতে পারতেন। খসরুকে তিনি প্রায়ই লিখে পাঠাতেন এবং বিশেষ জোর দিয়ে জানাতেন যেন সে আমার প্রতি অকপট হয় এবং আমাকে ভালবাসে। যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর উপদেশে কোনও ফল হবে না এবং পুত্র যে কত দূর বিপথে যাবে তাও যখন অজ্ঞাত, তখনই তিনি রাজপুত চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ তেজের প্রাবল্যে ঘৃণায় প্রাণত্যাগ করাই মনস্থ করলেন। তাঁর মন অনেক সময়েই বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। এই ভাবটা তাঁদের বংশগত। তাঁর পূর্বপুরুষ ও ভাইদের মধ্যে কারও কারও উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা গেছে। আবার কিছুদিন পরই এ ভাবটা চলে যেত। হিজরা ১০১৩ সনের জিলহিজ্জা মাসের ২৬শে তারিখ (৬ই মে ১৬০৫) যখন আমি শিকারের জন্য বাইরে আছি তখন তিনি মনের উত্তেজনায় খানিকটা আফিং খান এবং খুব তাড়াতাড়ি মারা যান। তাঁর অপদার্থ পুত্রের এখনকার ব্যবহার যেন তিনি তখনই জানতে পেরেছিলেন।

আমার যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম বিবাহ। খসরুর জন্ম হলে আমি তাঁকে শা বেগম উপাধি দিই। তাঁর ছেলের এবং ভাইয়ের আমার প্রতি অসদাচরণ তিনি সহ্য করতে পারেননি। জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন। এইভাবে তিনি এখনকার দুঃখ থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার প্রবল ভালবাসার জন্য এই মৃত্যুতে আমি এমন মুহ্যমান হয়ে পড়ি যে কয়েকদিন কোনও রকম আনন্দ উপভোগ করিনি, যেন আমার জীবনের অস্তিত্বই ছিল না। চারদিন অর্থাৎ বত্রিশ প্রহর কোনও খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিনি। আমার মহামান্য পিতা এই কথা জানতে পেরে আমাকে স্নেহপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লেখেন। সেই চিঠি আমার অর্থাৎ তাঁর অনুগত শিষ্যের হাতে এলো—সঙ্গে একটি সম্মানসূচক

পোশাক ও সদ্য-বাঁধা পাগড়ী। দেখে মনে হলো যেন সেটা সদ্য মাথা থেকে খুলে পাঠিয়েছেন। তাঁর এই অনুগ্রহ আমার শোকের আগুনে জল ছিটিয়ে দিল। আমার অস্থির শোকদগ্ধ অন্তর শান্ত হয়ে এলো। এই ঘটনাগুলি বর্ণনা করার ইচ্ছা আমার এইজন্য হয়েছে যে কোনও দুর্ভাগ্যই এর চেয়ে বেশী নয়, যদি পুত্রের অসঙ্গত আচরণ ও অশিষ্ট ব্যবহার মাতার মৃত্যুর কারণ হয় ও পুত্র বিনা কারণে পিতার অবাধ্য হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কতকগুলি অলীক কল্পনা মনে পোষণ করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এগিয়ে না আসে। এই রকম কাজের শাস্তিবিধান করার যিনি কর্তা সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই অবাধ্য পুত্রের এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে সে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে ধরা পড়ে এবং বিশ্বাসের স্থান থেকে চ্যুত হয়ে তাকে আজীবন কারাবাস ভোগ করতে হয়।

"পান-মত্ত আচরণ করে যদি সজ্ঞান পুরুষ
তার পা পড়ে ফাঁদে আর গলায় জড়ায় ফাঁস।"

সংক্ষেপে এই কাহিনী বলছি। জিলহিজ্জা মাসের ১০ই তারিখ মঙ্গলবার আমি হোদলে আসি। শেখ ফরিদ বক্‌শী ও একদল সাহসী লোককে খসরুকে অনুসরণ করার জন্য নিযুক্ত করি। তারাই বিজয়ী সেনার অগ্রগামী দলরূপে গণ্য হয়। দোস্ত মহম্মদ পরিচর্যার জন্য আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর পূর্বেকার কাজ ও পাকা দাড়ির (বার্ধক্য) কথা বিবেচনা করে তাঁকে আগ্রা দুর্গে স্ত্রীলোকদের ও কোষাগারের ভার নেওয়ার জন্য ফেরত পাঠানো হয়। আগ্রা ত্যাগ করার সময় নগরের ভার ইৎমাদু-দ্-দৌল্লা ও ওয়াজির-উল্-মুলকের ওপর দিয়ে এসেছিলাম। দোস্ত মহম্মদকে বলি—'আমরা পাঞ্জাবে যাচ্ছি। এই প্রদেশ ইৎমাদু-দ্-দৌল্লার দেওয়ানির অন্তর্ভুক্ত। তুমি সেখানে পৌঁছিয়েই তাঁকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আর মির্জা মহম্মদ হাকিমের ছেলেদের বন্দী করে তাদের ওপর নজর রাখবে। তারা এখন আগ্রাতেই আছে। কারণ, নিজের ঔরসজাত পুত্রই যখন এমন গর্হিত কাজ করতে পারে তখন ভাইপো আর জ্ঞাতি ভাইদেরই আর বিশ্বাস কি।' দোস্ত মহম্মদ যাওয়ার পর মুইজ্জুল-মুল্‌ক বক্সী নিযুক্ত হয়।

বুধবার পালওয়ালে আসি। বৃহস্পতিবার ফরিদাবাদে, ১৩ই শুক্রবার দিল্লীতে পৌঁছাই। পথের ধুলোপায়েই আমি মহামান্য হুমায়ুনের সমাধিস্থানে পৌঁছিয়ে আমার উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করি। নিজের হাতে দরিদ্র ও দরবেশদের অর্থ বিতরণ করি। তারপর মহান ফকির শেখ

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মসজিদে এসে তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করি। দরিদ্র ও দরবেশদের মধ্যে বিতরণের জন্য কিছু অর্থ জামাহুদ্দিন হোসেন আঞ্জুকে এবং কিছু অর্থ হাকিম মজফ্ফরকে দিই। ১৪ই তারিখ শনিবার নরেলা সরাইয়ে অবস্থান করি। খসরু তার যাওয়ার পথে এই বিশ্রামাগার ধ্বংস করেছিল।

আসফ খাঁয়ের ভাই আকামোল্লা আমার পরিচারক হওয়ার গৌরব অর্জন করায় তার পদ বৃদ্ধি করে এক হাজার পদাতিকের সঙ্গে তিনশ' অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক করি। যাত্রাপথে সব সময়ই সে আমার কাছে থাকত। আমার রাজকীয় সেনাদলের মধ্যে কোনও কোনও আইমাকের খসরুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে সন্দেহ করে এবং সেই জন্য তাদের মনে প্রতারণা ও রাজদ্রোহমূলক কাজ করার ইচ্ছা জন্মাতে পারে ভেবে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য তাদেরই সর্দারদের হাতে দুই হাজার টাকা দিই যাতে তারা জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে ওঠে। পথে ফকির ও ব্রাহ্মণদের দান করার জন্য শেখ ফজলুল্লা ও রাজা ধীরধরের হাতে অর্থ দিই। আজমীরে রাজা শঙ্করকে সাহায্য করার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়ার আদেশ দিই।

১৬ই সোমবার পানিপথ পরগণায় আসি (দিল্লী থেকে ৫৩ মাইল)। এই জায়গাটি আমার মহান পিতা ও সম্মানিত পূর্বপুরুষদের পক্ষে খুবই মঙ্গলদায়ক পবিত্র স্থান বলে গণ্য হয়েছে। এখানেই দুইটি বিশাল যুদ্ধজয় ঘটেছে। একটি হচ্ছে ইব্রাহিম লোদির পরাজয়। মহামান্য সম্রাট ফার্দুস্ মাকানির (বাবর) বিজয়ী সেনানী এইখানে তাকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধের বিবরণ তৎকালীন ইতিহাসেই লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় জয় হচ্ছে—সেই শয়তান হিমুর সঙ্গে যুদ্ধে। আমার মাননীয় পিতার রাজত্বের প্রথম দিকেই এই সৌভাগ্যদ্যোতক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের বিবরণ আমি বিস্তৃতভাবে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি।

খসরু দিল্লী পরিত্যাগ করে যখন পানিপথের দিকে অগ্রসর হয়, দৈবক্রমে দিলওয়ার খাঁ সেইখানে পৌঁছেছিলেন। খসরুর পানিপথে পৌঁছানোর কিছু আগেই তার এইদিকে আসার খবর তিনি পান। তৎক্ষণাৎ তাঁর পরিবারবর্গকে যমুনার অপর পারে পাঠিয়ে দিয়ে সাহসের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি দ্রুত লাহোর দুর্গে চলে যাবেন যাতে খসরু সেখানে

পৌঁছানোর আগেই তিনি সেখানে পৌঁছিয়ে দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। ঠিক এই সময়েই আবদুর রহিমও লাহোর থেকে পানিপথে পৌঁছায়। দিলওয়ার খাঁ তার কাছে এই প্রস্তাব করেন যে সেও যেন তার ছেলেমেয়েদের নদীর ওপারে পাঠিয়ে এখান থেকে দূরে সরে থেকে বিজয়ী জাহাঙ্গীরি সৈন্যদের আগমন প্রতীক্ষা করে। আবদুর রহিম অলস ও ভীরু স্বভাবের লোক হওয়ায় কি করবে সে সম্বন্ধে ঝটপট তার মন স্থির করতে পারে না। এদিকে তার কর্তব্য কি ঠিক করতে এত দেরি করে যে এর মধ্যে খসরু পৌঁছে যায়। সে বাইরে গিয়ে খসরুকে সম্মান জানায়। ইচ্ছাতেই হোক বা ভয়েই হোক সে খসরুর সঙ্গে যেতে স্বীকার করে। সে খসরুর কাছে 'মালিক আন্‌ওয়ার' পদবী ও উজিরের পদ লাভ করে।

বীরোচিত আচরণে দিলওয়ার খাঁ লাহোরের পথে ফেরেন। পথে যারই দেখা পান প্রত্যেককে—সে রাজকর্মচারীই হোক, কি জনসাধারণই হোক বা ব্যবসায়ীই হোক—তিনি জানাতে জানাতে যান যে খসরু আসছে। কিছু কিছু লোককে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান আর অন্যদের পথ ছেড়ে দূরে সরে যেতে বলেন। এর পর আল্লার ভৃত্যরা দস্যুর লুণ্ঠন ও অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়।

খুব সম্ভব দিল্লীতে সৈয়দ কামাল ও পানিপথে দিলওয়ার খাঁ যদি কিছু সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়ে খসরুর আসার পথ অবরোধ করতেন তাহলে তার বিশৃঙ্খল সঙ্গীরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হতো না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত এবং খসরুও ধরা পড়ত। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, এই দুইজনের সে হিম্মত দেখানোর বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু তাঁরা দুইজনই তাঁদের ত্রুটি সংশোধন করতে পেরেছিলেন। দিলওয়ার খাঁ দ্রুত অগ্রসর হয়ে খসরুর যাওয়ার আগেই দুর্গে পৌঁছে যান আর সৈয়দ কামাল খসরুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় পুরুষোচিত কাজ করেছিলেন। সে ব্যাপারটা যথাস্থানে বলব।

জিলহিজ্জা মাসের ১৭ই তারিখ করনাল পরগণায় রাজকীয় পতাকা উড্ডীন হলো। এইখানে পীরজাদা খাজা কালান জুইবারির পুত্র আবেদিন খাজাকে এক হাজারি মনসবদারির পদ প্রদান করি। পীরজাদার পিতা আবদুল্লা খাঁ উজবেগ আমার মহান পিতার রাজত্বকালে এদেশে এসেছিলেন।

শেখ নিজাম থানেশ্বরী এ যুগের একটি ভণ্ড শয়তান। সে খসরুর সঙ্গে দেখা করে তাকে সম্মান জানায়। নানা খোশখবর শুনিয়ে তাকে সন্তুষ্ট

করে তাকে আবার বিপথে চালনা করে। তারপর ভালমানুষ সেজে আমার সঙ্গে দেখা করে। খসরুর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার ব্যাপার আমি জেনে ফেলেছিলাম। তাকে রাস্তাখরচ দিয়ে বলি যে সে এখনই হজ করতে পবিত্র মক্কাসরিফে রওনা হয়ে যাক।

১৯শে তারিখ শাহাবাদ পরগণায় আসি। এখানে খুবই জলাভাব। আমাদের আসার পরই প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় সকলেই আনন্দ পায়।

শেখ আমেদ লাহোরি আমার পিতার রাজত্বকালে শিষ্য-সেবকের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে খানজাদার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁকে শির-ই-আদল (প্রধান বিচারপতি) পদ দিয়ে সম্মানিত করি।

তাঁরই পরিচয়পত্র নিয়ে পিতার প্রবর্তিত পবিত্র ধর্মের (দীন-ই-ইলাহি) শিষ্য-সেবকরা তাঁর কাছে আসতে পারত। তাঁর সুপারিশেই এই ধর্ম অনুসরণকারীরা একটি পরিচয়সূচক আংটি ও তাঁর প্রতিকৃতি সম্রাটের কাছ থেকে পেত। এই ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সময় শিষ্যদের কয়েকটি উপদেশ-বাণী শোনানো হতো। যেমন, জাতি ও ধর্মগত বিবাদে তারা জীবন কালিমাময় ও কলঙ্কিত করতে পারবে না। সর্ব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করে বিশ্বজনীন শান্তির নিয়মকে মেনে চলবে। নিজের হাতে কোনও প্রাণীকে হত্যা করতে বা কারও গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। যুদ্ধ এবং শিকারেই শুধু এর ব্যতিক্রম করা চলতে পারবে।

"ছাড়ো জীবন্ত প্রাণীর প্রাণ নেওয়ার খেলা।
ব্যতিক্রম শুধু যুদ্ধ আর শিকারের বেলা।"

জ্যোতিষ্কদের (চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির)—যাঁরা ঈশ্বরের জ্যোতিই বিচ্ছুরিত করেন—তাঁদের প্রত্যেককেই শক্তির অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা ও অস্তিত্বের কথা সব সময়ে এবং সর্বক্ষেত্রেই স্মরণ করতে হবে। ঘরে বাইরে যেখানেই থাক এক মুহূর্তও যেন ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে ভুল না হয়।

"খঞ্জ কিংবা দীন, কিংবা ক্রুর, কৃষ্টি-হীন,
যাই হও, তাঁরই প্রেমে হও তুমি লীন।"

আমার মহামান্য পিতা এই নীতিগুলিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন এবং কোনও সময়ই এই চিন্তা থেকে বিরত থাকতেন না।

আলুওয়ায় এসে আবুল-নবি-উজবেগকে আরও সাতান্নজন মনসবদারের

সঙ্গে দিয়ে শেখ ফরিদকে সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করি। এই সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিই। অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য জামিলবেগের হাতে সাত হাজার টাকা প্রদান করি। মীর সরিফ আমুলিকে (পবিত্র ধর্মের অনুসরক) দুই হাজার টাকা দিই।

এই মাসেরই ২৪শে তারিখে মঙ্গলবার খসরুর পাঁচজন সহচর ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে দুইজন খসরুর কাজে নিযুক্ত ছিল স্বীকার করায় তাদের হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করার আদেশ দিই। আর তিনজন অস্বীকার করায় তাদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বন্দী করে রাখার হুকুম দিই।

আমার রাজত্বের প্রথম বৎসরে ১২ই ফারওয়ার দিন মির্জা হোসেন ও কোতোয়াল নুরুদ্দিন লাহোরে যায়। সেই মাসের ২৪শে তারিখ দিলওয়ার খাঁর একজন সংবাদবাহক খবর নিয়ে আসে যে খসরু লাহোরের দিকে এগিয়ে আসছে সুতরাং তারা যেন সতর্ক থাকে। সেইদিনই নগরের ফটকগুলি সুরক্ষিত করে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। দুই দিন পরই দিলওয়ার খাঁও কয়েকজন লোকের সঙ্গে দুর্গে পৌছে যায় এবং দুর্গ ও দেওয়াল মজবুত করার কাজ শুরু করে। দুর্গ ও দেওয়ালের ভাঙাচোরা অংশ মেরামত করে জায়গায় জায়গায় বড় কামান ও ছোট ছোট ঘূর্ণ্যমান কামান বসিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। অল্পসংখ্যক রাজকর্মচারী যারা সেই দুর্গে ছিল তাদের সম্মিলিত করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু কাজের ভার দেয়। নগরের অধিবাসীরাও অনুগত হয়ে তাদের সাহায্য দান করে। এইসব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার দুইদিন পরই খসরু পৌছে যায়। নগরের বাইরে শিবির স্থাপন করে সে নগর অবরোধ করার আদেশ দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। সুবিধামত যে কোনও দিকের একটা ফটক পুড়িয়ে দিয়ে নগরে প্রবেশের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেয়। সে তার দুষ্টবুদ্ধি সঙ্গীদের বলে—'দুর্গ জয় করে আমি সাত দিন নগর লুণ্ঠন ও নারী ও শিশুদের বন্দী করার আদেশ দেব।'

এই অভিশপ্ত শয়তানরা একটি ফটকে আগুন লাগায়। দিলওয়ার খাঁ, দেওয়ান হোসেন বেগ ও নুরুদ্দিন কুলি কোতোয়াল ফটকের বিপরীত দিকে ভেতরে তাড়াতাড়ি দেওয়াল গেঁথে তোলে।

ইতিমধ্যে, কাশ্মীরের শাসনকার্যে নিযুক্ত সৈয়দ খাঁ চেনাবে তার শিবিরে থাকাকালে এই সংবাদ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি লাহোরের দিকে

যাত্রা করেন। রাভীর (ইরাবতী) তীরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্গসেনার অধিনায়কের কাছে সংবাদ পাঠান যে তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য নিয়ে এসেছেন। তাঁকে যেন দুর্গে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। দুর্গ থেকে গোপনে কেউ তাঁর কাছে আসে এবং তাঁর লোকজনসহ তাঁকে দুর্গের ভিতর নিয়ে যায়। অবরোধ নয় দিন ধরে চলার পর খসরু ও তার অনুচরদের কাছে বারবার সংবাদ আসতে থাকে যে রাজসৈন্য এসে গেল। তারা হতাশ হলেও বিজয়ী রাজসৈন্যের মুখোমুখি হবে বলে মন স্থির করে।

হিন্দুস্থানের মধ্যে লাহোর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। খসরুর পক্ষে ছয়-সাত দিনের মধ্যে অনেক লোক জুটে গেল। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারি যে দশ-বারো হাজার অশ্বারোহী একত্রিত হয়ে আমার অগ্রগামী সৈন্যদের রাত্রেই আক্রমণ করার জন্য নগরত্যাগ করেছে। ১৬ই তারিখ রাত্রে 'কাজি আলি' সরাইয়ে আমার কাছে এই সংবাদ আসে। সে রাত্রে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হলেও মার্চ করার ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসি। ভোরে সুলতানপুর পৌঁছিয়ে দুপুর পর্যন্ত সেখানেই থাকি। এই জায়গায় এই সময়েই সেই হতভাগ্য বিদ্রোহী দলের সঙ্গে আমার বিজয়ী সৈন্যের মুখোমুখি দেখা হয়। মুইজ্জুল মুল্‌ক এক প্লেট বিরিয়ানি আমার জন্য নিয়ে আসে। সেই প্লেটের দিকে আমি আগ্রহভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময়ই যুদ্ধের সংবাদ আসে। 'বিরিয়ানি' খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা হলেও শুভ লক্ষণ হিসাবে একটু মুখে দিয়েই আমার লোকজনের অপেক্ষা না করে ও আমার সৈন্যসংখ্যার অল্পতার কথা বিবেচনা না করেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত ছুটে যাই। আমার চিল্‌তা (বর্ম) দেওয়ার জন্য বারংবার বললেও আমার ভৃত্যরা তা দিতে পারলো না। আমার অস্ত্র ছিল শুধু তরবারি আর বর্শা। খোদার অনুগ্রহের ওপর একান্ত নির্ভরতায় কোনও রূপ দ্বিধা না করেই রওনা হই। প্রথম দিকে আমার দেহরক্ষীরূপে পঞ্চাশজনের বেশী অশ্বারোহী ছিল না। কারণ, সেদিন কেউই যুদ্ধের আশঙ্কা করেনি। শেষ পর্যন্ত যখন আমি গোবিন্দওয়াল সেতু-মুখে পৌঁছাই, ভালমন্দ মিশে চার-পাঁচশো অশ্বারোহী সেখানে জড়ো হয়। সেতু পার হতেই জয়বার্তা আমার কাছে পৌঁছে। সাম্‌সি তোষক্‌চি এই সংবাদ নিয়ে আসায় তাকে আমি 'খুস খবর খাঁ' এই উপাধি দিই। জামালুদ্দিন হোসেনকে আমি কিছু আগে খসরুকে সৎ পরামর্শ দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে-ছিলাম। সে প্রায় এই সময়েই ফিরে এসে খসরুর সৈন্যদের বিপুলতা ও

শৌর্যবীর্যের কথা এমন ভাবে বলতে থাকে যে শ্রোতারা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ে। যদিও জয়ের খবর বারবার আসতে থাকে, তবু এই সরলমন সৈয়দ তাতে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিল না। সে বলছিল যে নিজের চক্ষে খসরুর যে বিপুল সৈন্য দেখে এসেছে তাতে তাকে পরাস্ত করা ফরিদ খাঁর উপযুক্ত অস্ত্রহীন মুষ্টিমেয় সৈন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। খসরুর দুইজন খোজাকে সঙ্গে নিয়ে তার বসবার আসন আমার কাছে আনা হলে মীর তখন স্বীকার করে যে যুদ্ধে সত্যই জয় হয়েছে। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে তার মাথা আমার পায়ে রেখে তার আনুগত্য ও দীনতা বার বার নিবেদন করে বলে যে এর চেয়ে মহাসৌভাগ্য আর ঘটতে পারে না।

এই অভিযানে শেখ ফরিদ আন্তরিক আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই যুগের বীরদের অন্যতম বারহার সৈয়দরা—যারা এই জায়গাটি প্রতি সংগ্রামে রক্ষা করে এসেছেন তাঁরাই এই যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যের কাজ করেন। এই সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ মামুদ খাঁ বারহার পুত্র সইফ খাঁ যুদ্ধে খুবই বীরত্ব দেখান। তাঁর দেহে সতরোটি আঘাতজানিত ক্ষত দেখা যায়। এই দলেরই একজন সৈয়দ জালাল মাথায় তীরের আঘাতের দরুন কয়েকদিন পরই মারা যান। এই সময় পঞ্চাশ-ষাটজন বারহার সৈয়দদের যখন পনেরো শ'র মত অশ্বারোহী সৈন্য ঘিরে ফেলে খণ্ড খণ্ড করে কাটতে থাকে, তখন সৈয়দ জামাল তার ভাইদের সঙ্গে অগ্রগামী সৈন্যদের সাহায্যকল্পে পেছন থেকে এসে অদ্ভুত বীরত্ব ও পৌরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। দক্ষিণ দিকের সৈন্যরা 'পাদশা সালামত' (সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন) এই ধ্বনি তুলে যখন আক্রমণ শুরু করে, বিদ্রোহীরা এই হুঙ্কার শুনে রণে ভঙ্গ দিয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা জায়গায় লুকোতে থাকে। প্রায় চারশ' অশ্বারোহী বিজয়ী রাজসৈন্যদের কাছে পরাস্ত হয়ে হিংসার আগুনের ইন্ধন হয়। খসরুর মূল্যবান রত্নের পেটিকা এবং আরও বহুমূল্য জিনিস—যা সব সময়ই সে কাছে কাছে রাখত—আমাদের হস্তগত হয়।

"কে ভেবেছিল মাত্র কয়েক বছরের বালক,
তার পিতার সঙ্গে করবে কুৎসিত ব্যবহার ?
পেয়ালায় প্রথম চুমুকেই
নীচের তলানি উঠেছে উপরে।

আমার গৌরব সে লুটিয়ে দিয়েছে ধূলায়,
আর তার সঙ্গে তার নিজের শালীনতা।
খুরসিদের সিংহাসনে সে লাগিয়েছে আগুন।
আকাঙ্ক্ষা ছিল তার জেমসিদের স্থান।"

এলাহাবাদের কয়েকজন নির্বোধ লোক আমাকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দেয়। তাদের কথা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য মনে করে অগ্রাহ্য করেছিলাম। আমি জামি রাজত্বের ভিত্তি পিতা-পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর স্থাপিত হলে সেই রাজ্যকে কতদূর সহ্য করতে হয়। এই সব অপদার্থ লোকেদের কুপরামর্শে কর্ণপাত না করে নিজের সদ্‌বুদ্ধির ও বিবেকের নির্দেশ মত আমি আমার পিতার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি জানি তিনিই আমার পথপ্রদর্শক, আমার কিংলা (প্রার্থনার স্থান), আমার সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমার সদিচ্ছার ফলে সবই ভালভাবে চলেছিল।

খসরুর পলায়নের দিন সন্ধ্যায় লাহোরের পার্বত্য অঞ্চলের বিশ্বস্ত জমিদারকে সীমান্তের দিকে পাঠাই। যেখানেই সে খসরুর সংবাদ অথবা সন্ধান পাবে সেখানেই উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দী করতে নির্দেশ দিই। মহবৎ খাঁ ও মির্জা আলি আকবর শাহির সঙ্গে বড় রকমের সৈন্যবাহিনী দিয়ে যেদিকে খসরু যায় সেইদিকেই তাকে অনুসরণ করতে আদেশ করি। খসরু যদি কাবুলের দিকে যায় তাহলে আমি নিজেই সেদিকে যাব এবং তাকে বন্দী না করা পর্যন্ত ফিরব না এই সঙ্কল্প করি। যদি কাবুলে বিলম্ব না করে সে বাদাকসান অথবা ঐদিকের কোনও দেশে চলে যায় তাহলে মহবৎ খাঁকে কাবুলে রেখে আমি হিন্দুস্থানে ফিরে আসব ঠিক করি। বাদাকসানে আমার না যাওয়ার ইচ্ছা এইজন্য মনে হয়েছিল যে সেই হতভাগা আমি সেখানে পৌছলে নিশ্চয়ই উজবেগদের সঙ্গে মিতালি করবে এবং তাতে আমার সাম্রাজ্যের কলঙ্ক হবে।

রাজ-সৈন্যদের যেদিন খসরুর পেছন পেছন ধাওয়া করার আদেশ দিই সেইদিন পনেরো হাজার টাকা মহবৎ খাঁকে, কুড়ি হাজার টাকা আহদিদের দেওয়া হয়। এ ছাড়াও সৈন্যদের সঙ্গে আরও দশ হাজার টাকা পাঠানো হয় যাতে পথে কাউকে দেওয়ার প্রয়োজন হলে দেওয়া যেতে পারে।

২৮শে শনিবার আমার বিজয়ী শিবির জাহানে (জয়পাল) ফেলা হয়।

জায়গাটা লাহোর থেকে সাত ক্রোশ দূরে। সেইদিনই খসরু তার কয়েকজন সঙ্গীসহ চেনাবের তীরে এসে পৌঁছায়। তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা তার সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিল—মতবিরোধ ঘটে। আফগানি ও ভারতীয়দের অধিকাংশই তার পুরাতন সৈন্য। তারা শেয়ালের মত দ্রুত পা ফেলে হিন্দুস্থানে ফিরে গিয়ে সেখানেই বিদ্রোহ ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। হোসেন বেগ, তার সঙ্গের লোকজন ও পরিবারবর্গ—যাদের দেশ কাবুলের দিকে—কাবুলে যাওয়ারই প্রস্তাব করে। শেষে হোসেন বেগের ইচ্ছাই ফলবতী হয়। এতে হিন্দুস্থানী আর আফগানিরা খসরুকে ত্যাগ করা স্থির করে। চেনাবের তীরে পৌঁছিয়ে খসরু সাপুরের চলতি খেয়াঘাটে পার হওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু সেখানে পারাপারের নৌকা না পেয়ে সোধরার খেয়াঘাটের দিকে যায়। সেখানে তার লোকেরা মাঝিহীন একটি নৌকা আর জ্বালানী কাঠ ও ঘাস বোঝাই আর একটি নৌকা দেখতে পায়।

খসরুর পরাজয়ের আগেই নদী পারাপারের খেয়াঘাটগুলি বন্ধ রাখার জন্য পাঞ্জাবের জায়গীরদার ও পথ-পরিদর্শকদের আদেশ দেওয়া হয়। তাদের সকলকেই এই রকম সঙীন অবস্থায় সতর্ক থাকার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়। যে নৌকায় কাঠ আর ঘাস ছিল সেই নৌকার লোকজনকে খালি নৌকায় সরিয়ে দিয়ে তাতে খসরুকে পার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই সময়েই সোধরার কামাল চৌধুরীর জামাতা কিলান সেইখানে পৌঁছে একদল লোককে রাত্রে নৌকায় নদী পার হওয়ার উদ্যোগ করতে দেখে। সেই নৌকার মাঝিদের সে চীৎকার করে বলে যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাতে অপরিচিত লোকদের নৌকায় পার করানোর নিষেধাজ্ঞা আছে। তারা যেন সাবধান হয়। তার চীৎকারে কাছাকাছি বাড়ির লোকজন সেখানে এসে পড়ে। কামাল চৌধুরীর জামাতা মাঝিদের কাছ থেকে নৌকা চালানোর বাঁশ, যাকে হিন্দুস্থানীরা বল্লী বলে, কেড়ে নিয়ে নৌকা চালনা অসম্ভব করে দেয়। মাঝিদের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব জানালেও কেউই নৌকা চালিয়ে অপর পারে নিয়ে যেতে স্বীকার করে না। এদিকে চেনাবের নিকটস্থ গুজরাটে আবুল কাসিম নামকিনের কাছে খবর পৌঁছায় যে একদল লোক রাত্রেই খেয়া পার হওয়ার চেষ্টা করছে। সে তৎক্ষণাৎ তার ছেলেদের আর জনকয়েক ঘোড়সওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে সেই খেয়াঘাটে এসে উপস্থিত হয়। শেষে ব্যাপার এমন দাঁড়ায় যে হুসেন বেগ নৌকার মাঝিদের ওপর তীর ছোঁড়ে। আর এদিকে কামালের জামাই

নৌকা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে থাকে। নৌকাটি ভাটার স্রোতে ভাসতে ভাসতে চার ক্রোশ চলে আসে ও রাতের শেষে চরায় আটকে যায়। তারা যতই চেষ্টা করুক নৌকাকে নড়াতে পারে না। ইতিমধ্যে সকাল হয়ে যায়। জিলান খাঁর চেষ্টায় আবুল কাসিম ও খাজা খিজির খাঁ নদীর পশ্চিম পারে এসে উপস্থিত হয়ে এই পারটি সুরক্ষিত করে। আর জমিদাররা পূব পারটা আগেই সুরক্ষিত করে রেখেছিল।

খসরুর ব্যাপার আরম্ভ হওয়ার আগেই জিলান খাঁকে সৈয়দ খাঁর অধীনস্থ কাশ্মীরি সৈন্যদলের সাঁজোয়াল নিযুক্ত করে পাঠাই। ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রেই সে নদীর এই খেয়াঘাটের কাছে এসে পৌঁছায়। সে ঠিক মুহূর্তেই এসেছিল। তার চেষ্টাতেই আবুল কাসিম খাঁ নামকিন ও খাজা খিজির খাঁ একত্র হয়ে খসরুকে বন্দী করার কাজে সাহায্য করে।

এই মাসের ২৪শে রবিবার সকালে হাতী ও নৌকা নিয়ে এখানকার লোকেরা খসরুকে বন্দী করে। এই মাসের শেষদিন সোমবার মির্জা কামরাণের উদ্যানে আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছায়। আমি তৎক্ষণাৎ আমির-উল-উমরাকে গুজরাটে উপস্থিত হয়ে খসরুকে আমার কাছে আনার জন্য আদেশ দিই।

রাজকার্যে এবং পরিচালনায় আমি অন্য কারও উপদেশের চেয়ে নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপরই আস্থা স্থাপন করে সেই অনুসারে কাজ করে এসেছি। প্রথম দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—আমার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের ভিন্ন মত সত্ত্বেও তাঁদের উপদেশ উপেক্ষা করে আমি এলাহাবাদ থেকে পিতার কাছে চলে আসায় তাঁর আশীর্বাদ লাভ করি। তাঁর আশীর্বাদ আমার পক্ষে পার্থিব ও পারমার্থিক শুভদায়ক হয়। আমার সদাচারণের জন্য আমি শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অধীশ্বর হতে পেরেছি। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—খসরুর অনুসরণ। শুভ সময়ের অপেক্ষায় সময় ক্ষেপণ না করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। তাকে বন্দী করার পূর্ব পর্যন্ত একটুও বিশ্রাম নিইনি। অদ্ভুত কথা এই যে আমি যাত্রা করার পর জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হাকিম আলিকে জিজ্ঞাসা করি যে আমি যে সময় রওনা হয়েছি সেটা শুভ না অশুভ সময়। তিনি উত্তরে বলেন যে আমার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যদি আমি শুভ সময় বেছে নিতে চাইতাম তাহলে যে সময়ে যাত্রা করেছি তার চেয়ে শুভ সময় কয়েক বছরের মত পাওয়া যেত না।

১০১৫ সাল মহরম মাসের ৩রা তারিখ বৃহস্পতিবার চেঙ্গিজ খাঁর নিয়মা-

নুসারে খসরুর বাঁ হাত ও বাঁ পা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে মির্জা কামরাণের বাগানে আমার সম্মুখে হাজির করা হয়। তার ডান পাশে হুসেনবেগ ও বাঁ পাশে আবদুর রহিম দাঁড়িয়েছিল। তাদের মাঝখানে খসরু কাঁপছিল আর অশ্রু বিসর্জন করছিল। হুসেন বেগ তার সুবিধা হবে মনে করে আবোলতাবোল বকতে লাগল। তার কথার মর্ম আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলে তাকে আর কথা বলতে না দিয়ে খসরুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই কারাগারে নিয়ে যেতে বলি। আর এই দুইজন দুর্বৃত্তের একজনকে ষাঁড়ের চামড়া আর একজনকে গাধার চামড়া মুড়ে দুটি গাধার লেজের দিকে মুখ করে চড়িয়ে শহরের চারদিকে ঘুরাতে বলি। ষাঁড়ের চামড়া গাধার চামড়ার চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, এ জন্য হুসেন বেগ চার প্রহর মাত্র জীবিত থাকার পর দমবন্ধ হয়ে মারা যায়। আবদুর রহিম গাধার চামড়ায় মোড়া থাকায় এবং কেউ কেউ বাইরে থেকে কিছু কিছু খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করায় বেঁচে যায়।

জিলাহিজ্জা মাসের শেষ দিন সোমবার থেকে মহরম মাসের ৯ই তারিখ পর্যন্ত সময় ভাল না থাকায় কামরাণের বাগানেই থেকে যাই। ভাইরাওয়াল—যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল—শেখ ফরিদকে দান করে তাঁকে 'মূর্তজা খাঁ' এই উচ্চ পদবীতে ভূষিত করি। সেই উদ্যান থেকে নগরপ্রান্ত পর্যন্ত খুঁটি পুঁতে রাজ্য-শাসন ব্যাপারে সৎদৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেসব অশ্বারোহী অথবা অন্যান্য লোক এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তাদের ঐসব খুঁটিতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে আদেশ করি। যেসব বিশ্বাসভাজন জমিদাররা রাজানুগত্য দেখিয়েছিলেন তাঁদের সর্দারি দিয়ে প্রত্যেক চৌধুরীকেই ঝিলাম থেকে চেনাব পর্যন্ত ভরণপোষণের জন্য ভূমিদান করি।

মীর মহম্মদ বাকির বাড়ি থেকে হুসেন বেগের সম্পত্তির মধ্যে সাত লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। অন্য জায়গায় এবং নিজের কাছে সে যে অর্থ রেখেছিল তা ঐ অর্থের মধ্যে ধরা হয়নি। এই ব্যাপারের পর তার নাম উল্লেখ করতে হলেই গাওয়ান-উ-খরাণ (বলদ ও গাধা) এই কথা ব্যবহার করব। যখন সে মির্জা সারুখের সঙ্গে সম্রাট দরবারে আসে তখন সে মাত্র একটি ঘোড়ার মালিক ছিল। ক্রমে ক্রমে সে অবস্থার এমন উন্নতি করে যে সে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার মাথায় এই রকম কু-পরিকল্পনা প্রবেশ করে।

খসরুর ব্যাপারটার ফয়সলা যখন আল্লার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছিল এবং রাজদ্রোহিতার উৎস আগ্রা ও আফগানিস্থানের অন্তবর্তী স্থানগুলিতে যখন

কোনও প্রকৃত শাসক ছিল না—সেই সময় আমার পুত্র পরভেজের কাছে এই আদেশ পাঠাই যে সে যেন কয়জন বিশ্বস্ত সর্দারকে রাণার সঙ্গে মোকাবিলা করার দায়িত্ব দিয়ে আসফ খাঁ ও তার অধীনস্থ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রায় চলে আসে। ঐ জায়গার নিরাপত্তার রক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। আল্লার পূত আশীর্বাদে পরভেজের আগ্রায় পৌছানোর আগেই খসরুর ব্যাপারের নিষ্পত্তি হলো। পুত্রকে আমার কাছে আসার জন্য নির্দেশ দিলাম।

*

* *

৮ই মহরম, বুধবার শুভ মুহূর্তে লাহোর দুর্গে প্রবেশ করি। কয়েকজন রাজভক্ত কর্মচারী নিবেদন করেন যে আমার পক্ষে এখন আগ্রায় ফিরে যাওয়াই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভাল। কারণ, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বাংলায় সব কিছু ঠিকভাবে চলছে না। এই পরামর্শ আমি অনুমোদন করতে পারিনি। কারণ, কান্দাহারের শাসক শা বেগ খাঁয়ের কাছ থেকে সংবাদ আসছিল যে পারস্য সীমান্তের কর্মচারীরা কান্দাহার দুর্গ আক্রমণ করার মতলব করছে। কান্দাহারের সেনাবাহিনীর কয়েকজন মির্জা যারা বরাবরই বিরোধ বাধানোর চেষ্টায় ছিল তাদের চক্রান্তেই তারা সীমান্তে এসে জড়ো হয়েছে। পারস্যরাজের কর্মচারীরা এইসব অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় যে একটা গণ্ডগোল ঘটার সম্ভাবনা আছে। আমার আগেই মনে হয়েছিল যে সম্রাট আকবরের মৃত্যু ও খসরুর অহেতুক বিদ্রোহ তাদের মতলবে ইন্ধন যুগিয়ে কান্দাহার আক্রমণে প্ররোচিত করবে। যা আমার মনে হয়েছিল তাই বাস্তবে পরিণত হলো। ফারার শাসনকর্তা, সিস্তানের মালিক ও সীমান্তের জায়গীরদাররা হিরাটের শাসনকর্তা হুসেন খাঁর সহায়তায় কান্দাহার আক্রমণ করে। শা বেগ খাঁয়ের পৌরুষ ও বীরত্বের প্রশংসা একমুখে করা যায় না। তিনি পুরুষোচিত দৃঢ়তা নিয়ে একদিকে যেমন দুর্গ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে তেমন দুর্গের ত্রিতলের মাথায় বসে আমোদ-প্রমোদ এবং ভোজের এমন ভাবে আয়োজন করেন যা দুর্গের বাইরে থেকেও লোকের নজরে পড়তে পারে। এই অবরোধের সময় তিনি নিজে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হলেন না। নগ্ন শির ও পদে তিনি দফায় দফায় আনন্দোৎসবের আয়োজন করলেন। কিন্তু এমন একদিনও যায়নি যেদিন তিনি দুর্গ থেকে সৈন্য পাঠিয়ে শত্রু বিতাড়নের চেষ্টা

করেননি। যতদিন তিনি দুর্গে ছিলেন এইভাবেই চলেছে। কিজিলবাস সৈন্যরা দুর্গের তিনদিক ঘিরে ফেলেছে। এই সংবাদ লাহোরে পৌঁছানোর পর আমার দ্বিধাহীনভাবে মনে হল যে আমার এইদিকেই থাকা উচিত। মির্জা গাজির নেতৃত্বে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হলো। তাঁর সঙ্গী হলেন কারা বেগ ও তুরা বেগের মত পদস্থ ব্যক্তি। এই দুইজনকে আমি খাঁ উপাধি দিই। মির্জা গাজিকে পাঁচহাজারি মনসবদারির পদ দিই। মির্জা গাজি থাটার (সিন্ধুর অন্তর্গত) রাজা মির্জা জানি তারখানের পুত্র। আবদার রহিম খানখানানের চেষ্টায় পরলোকগত সম্রাটের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ জয় করা হয়। এই দেশ মির্জা জানির জায়গীরভুক্ত হয় এবং তিনি পাঁচহাজারি মনসবদারি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মির্জা গাজিকে ঐ পদ দেওয়া হয়। এঁদের পূর্বপুরুষরা খোরাসানের রাজা সুলতান হুসেন মির্জা বি-কারার আমিরদের বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তাঁরা মূলতঃ সাহিব কিরাণির (তাইমুর) আমিরদেরই বংশোদ্ভূত। এই সৈন্যদলের বক্সিপদে খাজা আকিল নির্বাচিত হয়। পথখরচের জন্য কারা খাঁকে তেতাল্লিশ হাজার টাকা এবং মির্জা গাজির সঙ্গী হিসাবে যাওয়ার জন্য নগ্‌দি বেগ ও কিলিজ খাঁকে পনেরো হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করা এবং কাবুলে যাওয়ার ইচ্ছা মনে থাকায় লাহোরে থেকে যাওয়াই স্থির করি।

শেখ হুসেন জামির স্বপ্ন ফলে যাওয়ায় আমি তাঁকে কুড়ি লক্ষ দাম্ (ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার সমতুল্য) তাঁর নিজের, তাঁর সঙ্গী দরবেশদের এবং মসজিদের ব্যয়নির্বাহের জন্য দিই।

বিয়াস নদীর তীরে গোবিন্দওয়ালে অর্জুন নামে এক হিন্দু ছিল। সে সর্বদাই সিদ্ধপুরুষ ও পবিত্রতার ছদ্ম আবরণে এমনভাবে নিজেকে আবৃত করে রাখত যে তার আচরণ অনেক সরল-হৃদয় হিন্দু এমন কি অজ্ঞ মূর্খ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও মুগ্ধ করে ফেলেছিল। তারাই তার সাধুতার কথা চারদিকে ঢক্কানিনাদে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা তাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নানাদেশ থেকে লোক এখানে জমায়েত হয়ে তাকে পূজা করত এবং তার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। শিষ্যপরম্পরায় তিন-চারপুরুষ এই ব্যাপার চালিয়ে জায়গাটি সরগরম করে রেখেছিল। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে তার এই অসার গুরুগিরি বন্ধ করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সভায় হাজির করি।

খসরু এই পথে যাওয়ার সময় এই অর্বাচীন লোকটি তার সঙ্গে দেখা করার

প্রস্তাব করে। যেখানে এই ভণ্ড থাকত ঘটনাক্রমে খসরু সেখানে উপস্থিত হলে সে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে খসরুকে সম্মান জানায়। সে খসরুকে বিশেষ পন্থায় আপ্যায়ন করে তার কপালে কুঙ্কুম দিয়ে আঙ্গুলের ছাপ দেয়। হিন্দুরা একে বলে টিকা এবং এটাকে শুভ ব্যাপার বলে গণ্য করে। আমার কানে এই কথা এলে তার মূর্খতা পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করলাম। আমি তাকে আমার সামনে হাজির করার আদেশ দিলাম। তার বাড়িঘর এবং ছেলেমেয়েদের মূর্তজা খাঁর হাতে তুলে দিলাম এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

রাজু ও অম্বা নামে দুজন লোক খোজা দৌলত খাঁয়ের আশ্রয়ছায়ায় থেকে প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও পীড়ন চালিয়ে অর্থ উপার্জন করত। খসরু লাহোরে উপস্থিত থাকার সময় সেই অল্প কয়েকদিন অনেক পীড়নের কাজ চালিয়েছিল। রাজুকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে এবং অম্বার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার হুকুম দিই। অম্বার ধনী বলে খ্যাতি ছিল। তার কাছ থেকে পনেরো হাজার টাকা আদায় হয়। এই টাকা 'বুলওরখানায়' (মসজিদ ইত্যাদি ধর্মস্থান) এবং দান খয়রাতে খরচ করার নির্দেশ দিই।

আমার সঙ্গে দেখা করার প্রবল আগ্রহে পরভেজ বর্ষাকালে প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যেও অতদূর পথ অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে ২৯শে বৃহস্পতিবার দিনের দুই প্রহর তিন ঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর আমাকে সম্মান দেখানোর আশীর্বাদ লাভ করে। বিপুল স্নেহভরে তাকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার ললাট চুম্বন করি।

খসরুর এইরূপ ঘৃণ্য আচরণ প্রকাশ পেলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি তাকে বন্দী না করা পর্যন্ত কোনও এক জায়গায় বসে থাকব না। খসরুর হিন্দুস্থানের দিকে ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল আগ্রা শূন্য রাখাটা সুবিবেচনার কাজ বলে মনে হয়নি। আগ্রাই সাম্রাজ্যের রাজধানী, এখানেই রাজ-পরিবারের পবিত্র অন্দরমহল। এখানেই বিশ্বের ধনসম্পদ সঞ্চিত। এইজন্যই আমি আগ্রা ত্যাগ করার সময় পরভেজকে লিখি যে তার (পরভেজের) পিতার প্রতি অনুরক্তির ফলেই খসরু পালিয়েছে এবং সৌভাগ্য দেবী তার (পরভেজ) দিকেই মুখ ফিরিয়েছে। আমি খসরুর অনুসন্ধানে চলেছি। সে যেন রাণার ব্যাপারটি কোনও রকমে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করে সাম্রাজ্যের হিতের জন্য তাড়াতাড়ি আগ্রায় ফিরে

আসে। তারই ওপর রাজধানী এবং কোষাগারের ভার দিয়ে গেলাম—যে কোষাগার 'কারুণের' (কুবেরের) কোষাগারতুল্য। তাকে সর্বক্ষমতাধর আল্লার অনুগ্রহের ভরসায় এই ভার দিয়ে গেলাম।

চিঠিখানি পরভেজের কাছে পৌছানোর আগেই রাণা এমন নত হয়ে এসেছিল যে সে আসফ খাঁকে জানায়—সে নিজের আচরণে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত। তিনি যদি সম্রাটপুত্রের কাছে তার হয়ে সুপারিশ করেন এবং তাঁর সম্মতি লাভ করেন তাহলে তার বাঘা নামক পুত্রকে তাঁর কাছে পাঠাতে পারে। পরভেজ এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে বলে যে হয় রাণা নিজে আসবে না হয় করণকে পাঠাবে। ইতিমধ্যে খসরুর বিদ্রোহের কথা পৌছে যায়। সেইজন্য আসফ খাঁ ও অন্যান্য রাজভক্ত কর্মচারীর পরামর্শে পরভেজ বাঘাকে পাঠাতেই সম্মতি দেয়। বাঘা মণ্ডলগড়ের কাছে এসে সম্রাটপুত্রের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য লাভ করে।

রাজা জগন্নাথ এবং সৈন্যাধ্যক্ষদের অধিকাংশকেই সেখানে রেখে আসফ খাঁ, তাঁর নিকট আত্মীয়দের এবং তাঁর নিজ পরিচারকদের ও বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে পরভেজ আগ্রার দিকে রওনা হয়। আগ্রার কাছাকাছি এসেই সে খসরুর পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সংবাদ পায়। দুই দিন আগ্রায় বিশ্রাম করার পর তার কাছে এই আদেশ যায় যে সবদিকেই যখন গোলমাল মিটে গেছে তখন সে যেন আমার কাছে আসার জন্য যাত্রা করে, যাতে সে ধার্যদিনে আমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আমি তাকে রাজমর্যাদার চিহ্নস্বরূপ আফতাফগির (ছত্র), দশহাজারি মনসবদারির মর্যাদা দান করি এবং তাকে 'তন্‌খা' জায়গীর দেওয়ার জন্য কর্মচারীদের হুকুম দিই।

এই সময়ে মির্জা আলি বেগকে কাশ্মীরে পাঠাই। কাবুলের ফকির ও দরিদ্রদের বিতরণ করার জন্য কাজি ইজ্জতউল্লাকে দশ হাজার টাকা পাঠানো হয়। এই সময় মকরব খাঁ ছয় মাস বাইশ দিন অনুপস্থিতির পর ফিরে এসে আমার দর্শনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। তাকে দানিয়ালের পরিবার-বর্গকে আনার জন্য বুরহানপুর পাঠানো হয়েছিল। সে বিস্তারিতভাবে ঐ দিককার ঘটনাগুলি আমাকে জানায়।

বোখারার সৈয়দ বংশোদ্ভূত শেখ আবদুল ওয়াহাবকে তাঁর লোকদের কতকগুলি অসৎ কাজের জন্য চাকুরি থেকে অপসারিত করে তাঁকে জীবন

ধারণোপযোগী ভূমি ভোগকারী এবং আরবাব-ই-সাদোনের (সাধুব্যক্তি যাঁরা সম্রাটের সৌভাগ্য এবং ভগবানের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করেন) একজন হিসাবে গণ্য করার আদেশ দিই। তিনি পরলোকগত সম্রাটের রাজত্বকালে দিল্লীর শাসক ছিলেন।

আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজ্যে—খাস ও জায়গীরভুক্ত এলাকায় 'বুলসরখানা' (বিনা পয়সার হোটেল) স্থাপন করার আদেশ দিই। এইখান থেকে দরিদ্রদের তাদের অবস্থানুযায়ী রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হবে। এই স্থবিধা পথিক ও স্থানীয় অধিবাসীরাও পেতে পারবে।

কাশ্মীরে শাসকশ্রেণীর বংশোদ্ভূত অম্বা খাঁ কাশ্মীরিকে এক হাজার পদাতিক ও তিনশ অশ্বারোহীর মনসবদার পদে নির্বাচিত করি। ৯ই রবিউল আখির সোমবার পরভেজকে একটি বিশেষ তরবারি দান করি। কুতুবউদ্দিন খান কোকা ও আমির-উল-ওমরাকেও রত্নখচিত তরবারি উপহার দিই। মকরব খাঁয়ের সঙ্গে দানিয়ালের যে ছেলেমেয়েরা এসেছিল তাদের দেখতে যাই। তিনটি ছেলে, চারটি মেয়ে। ছেলেদের নাম তামুরাস, বায়সন ঘর ও হুসাং। এইসব ছেলেমেয়েদের এমন স্নেহ-ভালবাসা দেখাই যে সবাই আশ্চর্য হয়ে ভাবল এমনটি অন্য কোথায়ও সম্ভব নয়। জ্যেষ্ঠ তামুরাসকে সর্বদা আমার কাছে রাখা স্থির করি। আর সকলকে আমার বোনদের তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য তাদের হাতে তুলে দিই।

বঙ্গদেশে রাজা মানসিংহকে একটি বিশেষ সম্মানজনক পোশাক পাঠানো হয়। মির্জা গাজিকে ত্রিশ লক্ষ দাম পুরস্কার দেওয়ার আদেশ দিই। কুতুবউদ্দিন খাঁ কোকার পুত্র শেখ ইব্রাহিমকে এক হাজার পদাতিক ও তিনশ অশ্বারোহীর মনসবদারি ও 'কিস্‌ওয়ার খাঁ' উপাধি দান করি।

*

* *

খসরুর অনুসরণে বের হওয়ার সময় আমার পুত্র খুররমকে প্রাসাদ ও কোষাগারের ভার দিই। খসরুর ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার পর আমি খুররমকে আদেশ করি সে যেন হজরত মরিয়ম জমানি ও অন্যান্য মহিলাদের আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আমার কাছে নিয়ে আসে। উক্ত মাসের ১২ই তারিখ শুক্রবার তাঁরা লাহোরের কাছাকাছি পৌছলে আমি নৌকায় উঠে ধর নামে এক গাঁয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই।

আমার মহা সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। চেঙ্গিজের রীতি, তৈমুরের বিধি এবং সাধারণ নিয়ম অনুসারে বয়ঃকনিষ্ঠরা বয়স্কদের যে ভাবে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে সেই ভাবে নতজানু হয়ে অভিবাদন ও সম্মান জানিয়ে এবং পৃথিবীর অধীশ্বর মহান আল্লার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করার পর আমি ফেরার অনুমতি লাভ করি। তারপর লাহোরের দুর্গে ফিরে আসি।

১৭ই তারিখে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর বক্সিপদে মুইজ্জল মুল্‌ককে নিযুক্ত করে তাকে বিদায় দিই। নাগোরে রায় রায় সিং ও তার পুত্র দিলীপ বিদ্রোহ করেছে সংবাদ পেয়ে রাজা জগন্নাথকে সৈন্যসামন্ত ও মুইজ্জল মুল্‌ককে সঙ্গে নিয়ে সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য অবিলম্বে রওনা হতে আদেশ দিই।

শা বেগ খাঁয়ের স্থলে সর্দার খাঁকে কান্দাহারের শাসক নিযুক্ত করার পর তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিই এবং তাকে তিন হাজার পদাতিক এবং আড়াই হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারির পদে উন্নীত করি। খান্দেশের ভূত-পূর্ব শাসক খিজির খাঁকে তিন হাজার টাকা দিই। খানজাদা কাশিম খাঁর পুত্র হাসিম খাঁ পদোন্নতির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় তাকে আড়াই হাজার পদাতিক ও দেড়হাজার অশ্বারোহীর মন্‌সবদার পদে উন্নীত করি। তাকে আমার নিজের একটি অশ্বও উপহার দিই। রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের মধ্যে আটজনকে সম্মানসূচক পোশাক পাঠাই। গল্পকথক সিরাজের নিজামকে পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কাশ্মীরের বুলসর-খানা (বিনা পয়সায় খাদ্য পরিবেশনের হোটেল) পরিচালনার ব্যয়ের জন্য সেখানকার শাসক মির্জা আলি বেগের উকিল মারফৎ তিন হাজার টাকা শ্রীনগরে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। কুতুবউদ্দিন খাঁকে একটি ছয় হাজার টাকা মূল্যের রত্নখচিত ছোরা উপহার দিই।

সংবাদ আসে যে আফগানি শেখ ইব্রাহিম বাবা লাহোরের কাছাকাছি কোনও জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খুলেছে। বহুসংখ্যক আফগান তার কাছে জুটেছে। তার কার্য ঘৃণা ও মূর্খজনোচিত মনে করে তাকে ধরে নিয়ে এসে চুনার দুর্গে আটক করে রাখার জন্য পরভেজের হাতে তুলে দিতে আদেশ দিই। এইভাবে এই উপদ্রব বন্ধ করা হয়।

৭ই জুমাদা-ল-আওয়াল বহুসংখ্যক মনসবদার ও আহদির পদোন্নতি হয়। পরভেজকে পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের চুনি উপহার দিই।

উপরোক্ত মাসের ৯ই তারিখ বুধবার, ২১শে সাহারিওয়ার আমার অষ্ট-ত্রিংশৎ জন্মদিন উৎসবের সূচনা হয় আমাকে ওজন করে। রীতি অনুসারে মরিয়ম জমানির (মা) আবাসে দাঁড়িপাল্লা এবং ওজনের মাপ নিয়ে সকলে প্রস্তুত হয়। শুভ সময় উপস্থিত হলে আল্লার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আমি একটি পাল্লায় উঠে বসি। দাঁড়িপাল্লা ঝোলানোর প্রত্যেকটি রজ্জু এক-একজন বয়স্ক ব্যক্তি স্পর্শ করে প্রার্থনা করতে থাকে। প্রথমবার সোনা দিয়ে ওজন করা হলে দেখা গেল হিন্দুস্থানী ওজনমতে তিন মণ দশ সের। এরপর নানা ধাতু, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি দিয়ে মোট বারো বার ওজন করা হলো—যার বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে। বছরে দুইবার সেরি ও চান্দ্র বৎসরের প্রারম্ভে সোনা, রূপা, অন্যান্য ধাতু, নানা রকমের রেশমী কাপড় ও খাদ্যশস্য দিয়ে আমি নিজেকে ওজন করাই। এইভাবে দুইবারের ওজনের সমপরিমাণ ওজনের টাকা ফকির ও গরীবদের বিতরণ করার জন্য নানা জায়গায় কোষাধ্যক্ষের নিকট পাঠানো হয়।

এই শুভদিনেই কুতুবউদ্দিন খাঁ কোকার পদোন্নতির আদেশ সহ অনেক অনুগ্রহ দেখাই। এই শুভদিনের (সম্রাট হওয়ার পর প্রথম জন্মদিনের ওজনের দিন) জন্য তিনি বহুকাল অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম তাঁকে পাঁচহাজারি মনসবদারি পদে প্রতিষ্ঠিত করে বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক, রত্নখচিত তরবারি, রত্নখচিত জিনসহ আমার একটি ব্যক্তিগত অশ্ব প্রদান করি। তারপর পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহীবাহিনী রাখার উপযুক্ত বাংলা ও বিহারের সুবেদার নিযুক্ত করে সেখানে প্রেরণ করি। সম্মানের চিহ্নস্বরূপ বিপুল বাহিনী সহ তিনি রওনা হন। তাঁর ব্যয়নির্বাহের জন্য দুই লক্ষ টাকাও তাঁকে দেওয়া হয়। তাঁর মায়ের সঙ্গে আমার এমন নিবিড় সম্বন্ধ ছিল যে আমার মায়ের প্রতি আমার যে ভালবাসা তার চেয়েও তাঁর ওপর আমার অধিকতর শ্রদ্ধা ছিল। আমার কাছে তিনি ছিলেন মহীয়সী জননীর মত। কুতবউদ্দিন আমার নিজের ভাই অথবা সন্তানের চেয়ে কম ভালবাসার পাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমার পোষ্য-ভাই। তাঁকে লালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য। তাঁর সৈন্যদের তিন লাখ টাকা দিই। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পরভেজের ভাবী বধূ পাহাড়ির (জাহাঙ্গীরের ভাই মুরাদ) কন্যার জন্য এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মুদ্রা পাঠাই।

২২শে তারিখ বাজ বাহাদুর কালমাক তার বরাতজোরে আমার প্রাসাদ-

দ্বারে উপস্থিত হওয়ার সম্মান লাভ করে। সে বঙ্গদেশে অনেক অসৎ কার্যের নেতা ছিল। তাকে একটি রত্নখচিত ছোরা, নগদ আট হাজার টাকা ও এক-হাজারি মনসবদারি পদ প্রদান করি। পরভেজকে নগদ এক লক্ষ টাকা ও মণিমুক্তা দিই। কেশোদাম মারুকে দেড়হাজারি মনসবদারি পদে উন্নীত করা হয়।

আমার ভাই দানিয়ালের দেওয়ান এবং তত্ত্বাবধায়ক আবুল হোসেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সম্মানলাভ করে। তাকে দেড়হাজারি মনসবদারি পদ প্রদান করি। দ্বিতীয় জুমাদা মাসের পয়লা তারিখে সিক্রির শেখজাদাদের বংশোদ্ভূত বুদ্ধি ও জ্ঞানদীপ্ত শেখ বেহিদকে 'মুয়াজ্জিম খাঁ' পদবীতে সম্মানিত করে দিল্লীর ভার অর্পণ করি। এই মাসের ২১শে তারিখ পরভেজকে চারটি চুনি ও একশ মুক্তা দিয়ে গড়া একটি হার উপহার দিই। তিন হাজার পদাতিক ও এক হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদ হাকিম মুজাফফ্‌রের জন্য নির্দিষ্ট হয়। মনঝোলার রাজা নাথুমালকে পাঁচ হাজার টাকা দিই।

খান্দেশের শাসক আলি খাঁকে লেখা মির্জা আজিজ কোকার চিঠি আবিষ্কার একটি বিশেষ ঘটনা এই সময়ের। আমার ধারণা হয়েছিল খসরুকে উপলক্ষ্য করে আমার প্রতি একটা বিশেষ শত্রুতার ভাব সে পোষণ করে। খসরু তার জামাতা। এই চিঠি আবিষ্কারের ফলে এই কথা পরিষ্কার জানা গেল যে সে তার অন্তরের বিদ্বেষভাব কখনও ত্যাগ করেনি, এমন কি আমার মহিমময় পিতার প্রতিও এইরূপ কদর্যভাব মনে পোষণ করত।

এই চিঠিখানি রাজা আলি খাঁর কাছে কোনও একসময় সে লিখেছিল। চিঠিখানির আগাগোড়া এমন বিদ্বেষ ও কদর্য ভাবে পূর্ণ যে কেউ কোনও শত্রুর সম্বন্ধেও এমন ভাবে লিখতে পারে না—মহামান্য সম্রাট আর্স আসিয়ানি (আকবর) সম্বন্ধে তো দূরের কথা। তার মায়ের কাজের ঋণশোধ হিসাবে আমার পিতা তাকে শিশুকাল থেকে প্রতিপালন করে ও শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছিলেন। তাকে এমন বেশী বিশ্বাস করতেন, যেন তার মত বিশ্বাসী আর কেউ হতে পারে না। রাজা আলি খাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে বুরহানপুরে এই চিঠিখানি খাজা আবুল হাসানের হাতে পড়ে। সে এই চিঠিখানি নিয়ে আমার সামনে হাজির করে। চিঠিখানি পড়ে আমার সমস্ত শরীরের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু তার মা আমার বাবাকে স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়েছে এই কথা বিবেচনা না করলে তাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করতে

পারতাম। আমার সম্মুখে তাকে উপস্থিত করিয়ে তার হাতে সেই চিঠিখানি তুলে দিয়ে তাকে উপস্থিত লোকদের সম্মুখে উচ্চস্বরে চিঠিখানি পড়তে বলি। আমি ভেবেছিলাম যে চিঠিখানি দেখেই তার আত্মা খাঁচাছাড়া হবে। কিন্তু সে নির্লজ্জ উদ্ধত ভঙ্গিতে চিঠিখানি পড়তে লাগলো—এই ভাব দেখাতে যেন সে এই চিঠিখানি লেখেনি, শুধু আদেশ শুনেই চিঠিখানি পড়ে যাচ্ছে।

সেই স্বর্গীয় দরবারে জমায়েত আকবর ও জাহাঙ্গীরের কর্মচারীগণ চিঠি পড়া শুনে তাদের জিহ্বা শিথিল করে তার প্রতি কটূক্তি ও অভিশাপ বর্ষণ করতে লাগল। আমি তাকে প্রশ্ন করি—'তোমার মত কলঙ্কিত ব্যক্তি আমার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে কিন্তু আমার পিতা যিনি তোমাকে এবং তোমার পরিবারবর্গকে রাস্তার ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে তোমাকে অর্থ ও সম্মান দিয়ে অন্য সকলের ঈর্ষার কারণ করে তুলেছিলেন, তাঁরই সম্বন্ধে তুমি তাঁর রাজ্যের শত্রুদের কাছে এমন ভাবে লিখতে পারলে? তুমি কেন বিশ্বাসঘাতক দুষ্টের দলে এমন ভাবে ভিড়েছ? আদিম প্রকৃতি ও অন্তরের দূষিত প্রবৃত্তি কি করে চেপে রাখা সম্ভব? বিশ্বাসঘাতকতার সলিলে যে তার আত্মাকে স্নান করিয়েছে—তার কাছ থেকে আর এর চেয়ে বেশী কি আশা করা যেতে পারে? আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে পদে তুমি পিতার আমলে ছিলে সেই পদেই তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এই ভেবে যে তোমার বিশ্বাসঘাতকতা শুধু আমার সঙ্গেই। কিন্তু যখন জানলাম যে তুমি এই একই ভাব তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং জীবন্ত দেবতার সম্বন্ধেও অন্তরে পোষণ করে এসেছ তখন তোমার পূর্বের ও এখনকার চিন্তা ও কার্যধারার ফল সম্বন্ধে ভেবে দেখতে বলি।' আমার মন্তব্য শোনার পর তার কণ্ঠ স্তব্ধ হলো। সে কোনও উত্তর দিতে পারেনি। আমার অপমানকর উক্তির কি উত্তরই বা সে দিতে পারে? তাকে জায়গীর-চ্যুতি করার জন্য আদেশ দিলাম। এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য হলেও তাকে আর কোনও শাস্তি দিইনি।

*

* *

এই মাসের ২৬শে তারিখে পরভেজ ও রাজপুত্র মুরাদের কন্যার বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হলো। মহামহিমান্বিতা মরিয়ম জমানির প্রাসাদে এই উৎসব হয়। পরভেজের বাড়ীতে ভোজের ব্যবস্থা হয়। উৎসবে উপস্থিত ব্যক্তিদের

যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হয়। সরিফ আমুলি ও অন্যান্য আমিরদের ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নয় হাজার টাকা দিই।

১০ই রজব রবিবার শিকারের উদ্দেশ্যে গিরঝক্ ও নন্দনপুর (মূলতানের নিকট) রওনা হই। রামদাসের উদ্যানে আমার থাকার জায়গা ঠিক হয়েছিল। এখানে আমি চারদিন অবস্থান করি।

১৩ই বুধবার পরভেজের ওজন নেওয়ার উৎসব হয়। নানা ধাতু ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তাকে বারো বার ওজন করা হয়। প্রত্যেকবারই ওজন হয় দুই মণ আঠারো সের। ওজন করা সমস্ত জিনিসই ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করতে আদেশ দিই। এই সময় সাজাত খাঁকে দেড়হাজার পদাতিক ও সাত শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদে নির্বাচিত করি।

মির্জা গাজি ও তার সৈন্যবাহিনী রওনা হওয়ার পর আমার মনে হয় যে আর একটি দ্বিতীয় দল তার পেছনে পাঠানো উচিত। বাহাদুর খাঁ কুরবেগিকে দেড়হাজার পদাতিক ও আটশ অশ্বারোহীর মনসবদারি দিয়ে তার সঙ্গে সই বেগ ও মহম্মদ আমিরের পরিচালনাধীনে তিন হাজারের মত অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল পাঠাই। এই সেনাবাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হয় ও আরও এক হাজার বন্দুকধারী সৈন্য নিযুক্ত করা হয়।

খসরুকে নজরবন্দী করে রাখা এবং লাহোর রক্ষার ভার আসফ খাঁর উপর অর্পণ করি। আমির উল উমরা অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় আমার কাছে উপস্থিত হওয়ার সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আবদুর রেজ্জাক মামুরিকে রাণার দেশ থেকে ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাকে সদর দফতরের বক্সির পদে উন্নীত করে এই আদেশ দেওয়া হয় যে আবুল হাসানের সঙ্গে এক-যোগে সে স্থায়ীভাবে এই কাজ করতে থাকবে। আমার পিতার নিয়মানুসারে বড় বড় পদে দুইজন ব্যক্তিকে একসঙ্গে নিযুক্ত করি। তার অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতি আমার কোনও অবিশ্বাসের ভাব আছে। এর অর্থ এই যে মানুষ মাত্রই চিরজীবী নয় এবং কোনও মানুষই দুর্ঘটনা ও ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত নয়। যদি কোনও সময় এইরকম ব্যাপার কোনও একজনের ভাগ্যে ঘটে তবে তার সমপদধারী আর একজন আল্লার সৃষ্ট জীবদের কাজ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারবে।

এই সময়েই হিন্দুদের উৎসব দশহরার দিন সংবাদ আসে যে আবদুল্লা খাঁ বন্দিলা প্রদেশে তার জায়গীরভুক্ত কাল্পি থেকে অভিযানে বেরিয়ে অশেষ

বীরত্ব দেখিয়ে মধুকরের পুত্র রামচাঁদকে বন্দী করে পাল্‌কিতে নিয়ে এসেছে। এইদিকেই সে উপদ্রবের কেন্দ্র করে তুলেছিল। এই কাজের জন্য আবদুল্লা খাঁকে একটি পতাকা উপহার দিয়ে তিন হাজার পদাতিক এবং দুই হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারের পদে উন্নীত করি।

বিহার সুবা থেকে সংবাদ আসে যে বিহারের একজন প্রসিদ্ধ জমিদার সংগ্রামের সঙ্গে জাহাঙ্গীর কুলি খাঁয়ের যুদ্ধ হয়েছে। সংগ্রামের চার হাজারের মত অশ্বারোহী ও অগণিত পদাতিক সৈন্য ছিল। সংগ্রামের অনুগতহীন কর্কশ ব্যবহার এবং বিরোধিতা দেখে খাঁ যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং পুরুষোচিত বীরত্ব দেখান। শেষে গুলির আঘাতে সংগ্রাম মারা যায়। তার লোকজনের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। যারা তরবারির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তারাও পালিয়ে যায়। এই প্রসিদ্ধ ঘটনা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ আমাকে জানালে তাঁকে সাড়ে চার হাজার পদাতিক ও সাড়ে তিন হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারিতে উন্নীত করি।

শিকারে তিন মাস ছয় দিন কাটালাম। ৫৮১টি পশু বন্দুকে, শিকারি চিতায়, জালে ও 'কামারঘায়' (বন ঘেরাও করে শিকার) মারা পড়লো। এর মধ্যে আমার নিজের বন্দুকেই ১৫১টি জন্তু মারা পড়ে। 'কামারঘা' দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম গিরঝাকে মহিলাদের উপস্থিতিতে ১৫০টি জন্তু মারা পড়ে। দ্বিতীয়বার নন্দনপুরে—১১০টি। নিহত পশুদের বিবরণ—পাহাড়ি ভেড়া—১৮০; পাহাড়ি ছাগল—২৯; বন্য গাধা—১০; নীল গাই—৯; হরিণ ইত্যাদি ৩৪৮। (মোট দাঁড়ায়—৫৭৬, ৫৮১টি নয়)।

১৬ই সাওয়াল বুধবার শিকার থেকে ফিরে। ঐদিনই দিনের এক প্রহর ছয় ঘড়ি অতীত হলে লাহোরে প্রবেশ করি। এই শিকারের সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। চান্দওয়ালায় যেখানে একটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল—আমি একটি কালো হরিণের পেট জখম করি। আহত হয়ে সেই হরিণটি এমন শব্দ করতে থাকে যা যোনি উত্তেজনার সময় ছাড়া অন্য কোনও সময় হরিণ করে না। পুরানো শিকারীরা এবং অন্য যারা আমার সঙ্গে ছিল সবাই বিস্মিত হয়ে বলে যে, যোনি উত্তেজনার সময় ভিন্ন হরিণ এমন আওয়াজ করতে পারে তা তারা স্মরণ করতে পারে না এবং এরকম কথা তারা বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকেও কখনও শোনেনি। ব্যাপারটি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম এই কারণে যে এর মধ্যে অসাধারণত্ব আছে। পাহাড়ি ছাগলের গায়ের চামড়ায় দুর্গন্ধ

থাকলেও এর মাংস অন্য পশুমাংসের চেয়ে সুস্বাদু বলে আমার মনে হয়। এর চামড়ায় এমন দুর্গন্ধ যে কাঁচা চামড়া ট্যান্ করলেও দুর্গন্ধ নষ্ট হয় না। একটা বড় পুং ছাগলকে ওজন করা হলো। ওজন হলো দুই মণ চব্বিশ সের—যা পারস্য দেশের ওজনে দাঁড়ায় একুশ মণ। একটা বড় ভেড়াকেও ওজন করার আদেশ দিলাম। ওজন হলো আকবরি দুই মণ তিন সের—যা পারস্য দেশের ১৭ মণের সমান। সব চেয়ে বড় ও হৃষ্টপুষ্ট গাধাকে ওজন করে দেখা গেল ৯ মণ ১৬ সের—যা পারস্যের মাপে ৭৬ মণ। আমি প্রায়ই শিকারী ও শিকার-ভক্তদের মুখে শুনেছি পাহাড়ি পুরুষ ভেড়ার শিংএ বছরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে পোকা জন্মায়। সেই পোকা এমন বিরক্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে যে, সেই সময় তার নিজ ভেড়িকেও শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকে। অনুসন্ধানের পর জানতে পারি যে এইরকম পোকা স্ত্রী ভেড়ির শিংয়েও হয় কিন্তু তারা পুরুষ ভেড়ার মত আঘাত করতে আসে না। সুতরাং পুং ভেড়ার শিং সম্বন্ধে যে কথা চল্‌তি আছে তা সত্যি বলে মনে হয় না। বন্য গর্দভের মাংস খাওয়ার কোনও ধর্মীয় নিষেধ নাই। অধিকাংশ লোকই পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই মাংস খায়। কিন্তু আমি কোনও রকমেই এই মাংস বরদাস্ত করতে পারি না।

এর আগেই দিলীপ ও তার বাবা রায় রায় সিংহের শাস্তির আদেশ দিয়েছি। এখন সংবাদ এল—সাদিক খাঁর পুত্র জাহিদ খাঁ, শেখ আবুল ফজলের পুত্র আবদুর রহিম, রাণা শঙ্কর এবং মুইজ্জল মুল্‌ক আজমির সুবার অন্তর্গত নাগরের কাছে দিলীপ আছে এই খবর পেয়ে তারা অন্যান্য মনসবদারদের সঙ্গে সেই দিকে গিয়েছে এবং তাকে সেখানে দেখতে পেয়েছে। পালাবার আর কোনও উপায় নাই দেখে সে সেখানে খুঁটি গেড়ে রাজকীয় সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ভীষণ ভাবে পরাজিত হয় এবং তার লোকজনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তার নিজের জিনিসপত্র নিয়ে কোন্ এক নরকের দিকে পালিয়ে যায়।

"ভগ্ন বাহু আর শিথিল কটিবন্ধ,
যুদ্ধক্ষমতা করে দেয় লোপ।"

বৃদ্ধ হলেও আমার পিতার আমলের কর্মচারী কিলিজ খাঁর মন্‌সব বহাল রাখি এবং কাল্‌পি সরকারের অধীনে তাঁকে একটি জায়গীর দেওয়ার আদেশ দিই।

জিলহদ মাসে কুতুবউদ্দিন খান কোকার মাকে আল্লা তাঁর কাছে টেনে নেন। তিনি আমাকে শিশুকালে স্তন্যদান করেছেন। মাতৃতুল্য ছিলেন তিনি। আমার দয়াবতী জননীর চেয়ে যেন তিনি আমার ওপর বেশি দয়াবতী ছিলেন। তাঁর কোলে শিশুকাল থেকে মানুষ হয়েছি। তাঁর শবদেহের পদ আমার কাঁধের ওপর তুলে তাঁর সমাধিস্থানের দিকে কিছুদূর নিয়ে যাই। আমি দুঃখে-শোকে এমন অভিভূত হয়ে পড়ি যে কয়েকদিন খাদ্য মুখে তুলতে পারিনি। আমার পোশাক পরিবর্তন করতেও ইচ্ছা হয়নি।

রাজ্যাভিষেকের পর দ্বিতীয় নববর্ষ

১০১৫ সনের ২২শে জিলহদ (১০ই মার্চ, ১৬০৭) দিনের সাড়ে তিনঘড়ি অতিবাহিত হলে রবি তুঙ্গস্থানে উদিত হলেন। নিয়মমাফিক প্রাসাদ সজ্জিত করে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হলো। শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করে আমির ও সভাসদগণের অনুগ্রহ বিতরণ করি। এই শুভদিনেই কান্দাহার থেকে প্রেরিত রিপোর্টে জানা গেল শা বেগ খাঁকে সাহায্য করার জন্য মির্জা জানির পুত্র মির্জা গাজির সঙ্গে যে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয় তারা ১২ই সাওয়াল কান্দাহার নগরে প্রবেশ করেছে। এই নগরের কাছাকাছি বিজয়ী সৈন্যরা এসে পৌঁচেছে জানতে পেরে পারসিকরা (পারস্যবাসী) বিস্মিত, ভয়ার্ত ও অনুতপ্ত হয়ে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরস্থ হেলমন্দে না পৌঁছানো পর্যন্ত অশ্বের গতি শিথিল করেনি।

দ্বিতীয়তঃ এই সময়েই জানা গেল—ফারার শাসক ও নিকটবর্তী স্থানের কর্মচারীরা ভূতপূর্ব সম্রাটের মৃত্যুর পর একটা বিশৃঙ্খলা ঘটবে এই আশা করে এবং সেই সুযোগে কান্দাহার অধিকার করতে পারবে এইভরসায় শা আব্বাসের (পারস্যের রাজা) কোন আদেশ না নিয়েই একসঙ্গে মিলিত হয় এবং সিস্তানের সর্দারকেও তাদের পক্ষে নিয়ে আসে। হিরাটের শাসক হুসেন খাঁর কাছেও তারা লোক পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করতে অনুরোধ করে। সেও সৈন্য পাঠায়। তারপর তারা কান্দাহার আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সেখান-কার শাসক শা বেগ দেখেন দুমুখী আক্রমণ আসন্ন। তিনি ভাবলেন যে, যদি আল্লা না করুন তিনি পরাজিত হন, তাহলে কান্দাহারের দখল হারাতে হবে। সুতরাং যুদ্ধে না এগিয়ে দুর্গের মধ্যে থাকাই ভালো। সেইজন্য তিনি দুর্গরক্ষা করতেই মনস্থির করেন এবং দরবারে দ্রুতগামী বার্তাবহ পাঠিয়ে দেন। সেই সময় খসরুর অনুসরণে রাজপতাকাবাহী সৈন্য লাহোরে পৌঁছে গেছে। শা বেগ খাঁর প্রেরিত সংবাদ পাওয়া মাত্র মির্জা গাজির অধিনায়কত্বে আমির ও মনসবদারদের সৈন্যবাহিনীকে ঐদিকে পাঠানো হয়। মির্জা কান্দাহারে পৌঁছানোর আগেই পারস্যের শার কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে ফারার শাসক এবং নিকটবর্তী জায়গীরদারেরা কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই অভিযান ন্যায়নীতিবিরুদ্ধ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ হুসেন বেগ নামক

একজন সুপরিচিত এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য পাঠান। তাঁর সঙ্গে তাদের নামে এই ফার্মান পাঠান যে তারা যেন আদেশ পাওয়া মাত্র কান্দাহার থেকে ফিরে এসে নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে যায়। কারণ, তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে জাহাঙ্গীর পাদশার মহান্ বংশের বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব অনেকদিনের স্থায়ী ব্যাপার। সেই দলটি অবশ্য হুসেন বেগ এবং রাজার আদেশ পৌঁছানোর পূর্বেই সাম্রাজ্যের সৈন্যদের সম্মুখীন হতে সাহস না করায় ফিরে যাওয়াই সুবুদ্ধির কাজ বলে মনে করে। হুসেন বেগ এইসব লোকেদের তিরস্কার করে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য যাত্রা করেন এবং লাহোরেই আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্যলাভ করেন। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন যে, শা আব্বাসের আদেশ না নিয়েই ওরা কান্দাহার আক্রমণ করতে এসেছিল। তিনি বলেন, আল্লা না করুন, এই ব্যাপারে আমার মনে যেন কোনও রকমের অসন্তোষের ভাব না থাকে। যাহোক বিজয়ী সৈন্যরা কান্দাহারে পৌঁছনোর পর আমার আদেশানুসারে দুর্গের ভার সর্দার খাঁর ওপর ন্যস্ত করে সাহায্যের জন্য যে সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে শা বেগ খাঁ দরবারে ফিরে আসেন।

২৭শে জিলহদ রামচাঁদ বান্দিলাকে বন্দী এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আবদুল্লা খাঁ আমার কাছে আনে। তার পা থেকে শৃঙ্খল খুলে নিতে আদেশ দিই। তাকে সম্মানজনক পোশাক উপহার দেওয়ার পর রাজা বাসোর হাতে তুলে দিয়ে বলি যে, তিনি জামিন নিয়ে এঁকে এবং তাঁর যেসব আত্মীয় বন্দী হয়েছে তাদের সকলকে মুক্তি দেন। দয়া এবং অপরাধ মার্জনা করার আমার মনোভাব থেকেই এ ব্যাপার ঘটতে পারলো। এইভাবে ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করবেন এ কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

২রা জিলহিজ্জা পুত্র খুররমকে তুমান-উ-তুগ, একটি নিশাণ ও ডঙ্কা উপহার দিয়ে আট হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারি প্রদান করি। তাকে একটা জায়গীর দেওয়ারও আদেশ দিই। এইদিনই দৌলত খাঁ লোদির পুত্র পীর খাঁকে—যে খান্দেশ থেকে দানিয়ালের পরিবারবর্গকে এনেছে—'সলাবৎ খাঁ' উপাধি দান করি এবং তাকে তিন হাজার পদাতিক ও দেড় হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারি পদ দিয়ে সম্মানিত করি। তাকে পতাকা ও ডঙ্কা উপহার দিয়ে 'ফারজান্দি' (পুত্রত্ব) এই বিশেষ আখ্যায় ভূষিত করি—যে সম্মান তার সঙ্গী ও সহচরদের কল্পনার বাইরে। লোদিবংশের

মধ্যে সলাবৎ খাঁর পূর্বপুরুষ ও খুল্লতাত বংশীয়রা বিশেষ সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। সলাবৎ খাঁর পিতামহের পিতৃব্য পূর্বেকার দৌলত খাঁ, সিকান্দার খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম যখন তাঁর (দৌলত খাঁর) পিতার আমলের আমিরদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করে ও অনেককে ধ্বংস করে, তখন চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পুত্র দিলওয়ার খাঁকে মহামান্য বাবরের কাছে কাবুলে পাঠান ও তাঁকে হিন্দুস্থান অধিকার করার কথা বিবেচনা করতে জানান। বাবরের মনেও এই ইচ্ছা থাকায় তিনি অবিলম্বে হিন্দুস্থানের দিকে অশ্বচালনা করেন এবং লাহোরের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অশ্বের বলগা এদিক ওদিক টানেননি। দৌলত খাঁ তাঁর অনুচরগণসহ তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্যলাভ করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন বয়সে প্রবীণ, অন্তরে বাইরে নানা সদগুণে বিভূষিত। তিনি অনেক সৎকাজ করেছিলেন। বাবর তাঁকে পিতৃসম্বোধন করতেন। তাঁকে পূর্বের মতই পাঞ্জাবের শাসকরূপে বহাল রেখে সেখানকার আমির ও জায়গীরদারদের তাঁর অধীনস্থ করলেন। দিলওয়ার খাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাবর কাবুলে ফিরে আসেন। হিন্দুস্থান আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যখন বাবর দ্বিতীয়বার পাঞ্জাবে আসেন দৌলত খাঁ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই সময় তাঁর মৃত্যু হয়। দিলওয়ার খাঁকে খান্‌খানান উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন বাবর। ইব্রাহিমের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি বাবরের সঙ্গেই ছিলেন। ভূতপূর্ব সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে তিনি স্থায়ীভাবে ছিলেন। হুমায়ুন বাংলা থেকে ফেরার পথে মুঙ্গের থানায় দিলওয়ার খাঁ শের আফগানের সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ করেন ও বন্দী হন। শের খাঁ তাঁকে তার অধীনে কাজ করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি অস্বীকার করে বলেন—'তোর পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষের ভৃত্য ছিল। আমি কেমন করে তোর প্রভুত্ব স্বীকার করব?' শের খাঁ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর চারপাশে দেওয়াল গেঁথে তোলার আদেশ দেয়।

সলাবৎ খাঁ ফারজান্দের পিতামহ উমর খাঁ দিলওয়ার খাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। সেলিম খাঁর সময় তাঁর বেশ খাতির ছিল। সেলিম খাঁর মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র ফিরোজকে মহম্মদ খাঁ হত্যা করার পর উমর খাঁ ও তাঁর জ্ঞাতিভাইরা মহম্মদ খাঁর আচরণে সন্দিগ্ধ হয়ে গুজরাটে চলে আসেন। সেইখানেই উমর খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র দৌলত খাঁ সাহসী সুদর্শন যুবাপুরুষ এবং সর্ববিষয়েই উপযুক্ত ছিলেন। বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিমকে তিনি সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ

করেন। আকবরের রাজত্বকালে আবদুর রহিম খান্‌খানান উপাধিতে ভূষিত হন এবং অনেক ভাল কাজ করেন। খান্‌খানান দৌলত খাঁকে নিজ ভাইয়ের মত জ্ঞান করতেন—এমন কি নিজ ভাইয়ের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী ভালবাসতেন। দৌলত খাঁয়ের সাহস ও পৌরুষের জন্যই খান্‌খানান বেশীর ভাগ যুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছিলেন। আমার মহামান্য পিতা খান্দেশ ও আসির দুর্গ জয় করবার পর আগ্রায় ফিরে আসার সময় দানিয়ালকে এই প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের যেসব প্রদেশ জয় করেছিলেন সেগুলির শাসনভার দিয়ে আসেন। এই সময় দানিয়াল দৌলত খাঁকে খান্‌খানানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার নিজের সহচর হিসাবে নিযুক্ত করে ঐ রাজ্যের সমস্ত কাজের ভার তার ওপর ন্যস্ত করে। দানিয়াল দৌলত খাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে অশেষ অনুগ্রহ ও প্রীতি দেখিয়েছিল। মৃত্যুকালে তিনি মহম্মদ খাঁ ও পীর খাঁ নামে দুই পুত্র রেখে যান। জ্যেষ্ঠ মহম্মদ তার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরই মারা যায়। দানিয়ালও সুরাপানে নিজেকে ক্ষয় করে এনেছিল। আমার রাজ্যাভিষেকের পর পীর খাঁকে দরবারে উপস্থিত হতে বলি। তাঁর মধ্যে সদ্‌গুণ ও স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লক্ষ্য করে তাঁকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছি সে বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আজ আমার সরকারে তার চেয়ে অধিক প্রতিপত্তিশালী আর কেউ নেই। তাঁর সুপারিশে এমন দোষও নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে থাকি যা অন্য কোন কর্মচারী করলে করি না। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি সৎ স্বভাববিশিষ্ট যুবক, সাহসী এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের উপযুক্ত পাত্র। তাঁর জন্য যা আমি করেছি তা ঠিকই করেছি এবং ভবিষ্যতে তিনি আরও অনুগ্রহ লাভ করেন।

*

* *

আমি উচ্চ মনোভাব নিয়ে স্থির করেছি যে আমার পিতৃপুরুষের রাজ্য মাওয়ারা-আ-ন্‌-নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা) জয় করতে যাত্রা করবো। যাত্রার পূর্বে হিন্দুস্থানের দেহ থেকে কলহ ও বিদ্রোহের কালিমা মুছে ফেলতে হবে। তারপর আমার কোনও এক পুত্রকে হিন্দুস্থানের ভার দিয়ে আমি নিজে সাহসী সৈন্যবাহিনী, পাহাড়সদৃশ মহিমময় হস্তীযূথ, প্রচুর ধনরত্ন সহ বিপুল সৈন্য-সজ্জা করে পিতৃপুরুষের রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে যাব। এই ভাবের ভাবুক হয়েই পরভেজকে রাণার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পাঠাই এবং নিজে দাক্ষিণাত্যের দিকে বিদ্রোহ দমনে যাব এই ইচ্ছা করি। ঠিক এই সময়েই

খসরুর অমানবোচিত কুৎসিত আচরণ প্রকাশ পেল। তখন সব কাজ মুলতবি রেখে তার পশ্চাৎধাবন করে তার বিদ্রোহ দমন করাই জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। এই একই কারণে পরভেজের অভিযানও খুব জোরালো হলো না। এই সময়ের প্রয়োজনে রাণাকেও কিছুটা স্থবিধা দিতে হলো। রাণার পুত্রদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে নিয়ে সে আমার সঙ্গে লাহোরে দেখা করতে আসে ও আমার আশীর্বাদ লাভ করে।

খসরুকে নিয়ে গণ্ডগোল ও কিজিলবাসদের কান্দাহার আক্রমণের ঝামেলা এমন স্থন্দরভাবে মিটে যাওয়ায় মনে স্বস্তি অনুভব করি। তখনই মনে হলো যে শিকারের উদ্দেশ্যে কাবুলযাত্রা করব—যে দেশ আমার নিজের দেশেরই মত। সেখান থেকে হিন্দুস্থান ফিরে এসে আমার মনের সঙ্কল্পগুলি কার্যে পরিণত করব। মনে মনে এই রকম ঠিক করে ৭ই জিলহজ্জ শুভসময়ে লাহোর দুর্গ ত্যাগ করে রাবি নদীর অপর পারে 'দিল আমেজ' উদ্যানে এসে চারদিন থাকি। ১৯শে ফারওয়ার দিন রবিবার সূর্য যখন তুঙ্গীস্থানে অবস্থিত, আমি দরবারের কয়েকজন কর্মচারীর পদোন্নতির আদেশ দিয়ে তাদের অনুগৃহীত ও সম্মানিত করি। পারস্যের রাজার (শা আব্বাস) দূত হাসান বেগকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কিলিজ খাঁ, মির সদর জাহান ও মির সরিফ আমুলিকে লাহোরে রেখে আদেশ দিয়ে যাই যে ভবিষ্যতে জরুরী কিছু করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁরা যেন সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে সেই কাজ করেন।

উল্লিখিত উদ্যান থেকে সোমবার যাত্রা করে লাহোর নগর থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরবর্তী হরহর গ্রামে এসে শিবির ফেলি। মঙ্গলবার রাজপতাকা জাহাঙ্গীরপুরে এসে উড়লো। আমার নির্বাচিত শিকারের জায়গার মধ্যে এটি একটি। এইখানেই আমার আদেশে 'রাজ' নামে একটি হরিণের সমাধির ওপর স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। পোষা হরিণের সঙ্গে লড়াই কিংবা বুনো হরিণ শিকারের ব্যাপারে এই হরিণটির সমকক্ষ আর কোনও হরিণ ছিল না। এই স্তম্ভের একটি প্রস্তরখণ্ডে একালের বিখ্যাত লেখকদের শিরোমণি মোল্লা মহম্মদ হোসেন কাশ্মীরির নিম্নলিখিত গদ্য রচনাটি খোদাই করা হয় :—"আল্লার সেবক নুরউদ্দিন জাহাঙ্গীর পাদশার পৃথিবী বেষ্টক জালে একটি মৃগ ধরা পড়েছিল। এক মাসের মধ্যে সে তার বন্য উগ্রতা ত্যাগ করে বিশেষ ধরনের মৃগজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করে।" এই হরিণটির বিশেষ গুণের জন্য আদেশ দিই যে,

এই জায়গার কোনও হরিণ কেউ শিকার করতে পারবে না। এখানকার হরিণের মাংস হিন্দুদের কাছে গোমাংস এবং মুসলমানদের কাছে শূকরমাংস বলে গণ্য হবে। সমাধিস্তম্ভটি হরিণের আকৃতিতে নির্মাণ করা হয়। এই পরগণার জায়গীরদার সিকান্দার মুরিণকে জাহাঙ্গীরপুর গ্রামে একটি মজবুত দুর্গ নির্মাণ করতে আদেশ দিই।

১৪ই বৃহস্পতিবার চন্দালা পরগণায় শিবির ফেলি। সেখান থেকে মাঝে এক জায়গায় নেমে ১৬ই শনিবার হাফিজাবাদ আসি। এখানকার করোরি মির কিয়ামুদ্দিনের চেষ্টায় নির্মিত অট্টালিকায় অবস্থান করি।

২১শে জিলহিজ্জা বৃহস্পতিবার চেনাব নদীর তীরে পৌঁছিয়ে নবনির্মিত সেতু দিয়ে নদী পার হয়ে গুজরাটের কাছাকাছি শিবির স্থাপন করি। যখন মহামান্য সম্রাট আকবর কাশ্মীর গিয়েছিলেন সেই সময় এই নদীর তীরে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। তিনি একদল গুর্জরকে এই দুর্গে নিয়ে এসে বসতি করান। তারা এইসব জায়গায় চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত থাকত। গুর্জরদের বাসস্থান বলে এই জায়গাটিকে পৃথক পরগণা করে নাম দেন গুজরাট। এদের গুর্জর জাতি বলা হয় এইজন্য যে তারা কোনও হাতের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করে না। দুধ ও দই খেয়ে তারা প্রাণধারণ করে।

শুক্রবার গুজরাট থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে খাবাসপুরে শিবির স্থাপন করি। শের খাঁ আফগানের ক্রীতদাস খাবাস খাঁ এই জায়গার পত্তন করে। এরপর দুইবার যাত্রাবিরতি করে ঝিলামের (বিহাত) তীরে তাঁবু ফেলি। সেই রাত্রে প্রবল ঝড় বইতে থাকে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আকাশ ঢাকা পড়ে যায়। এমন প্রবলধারায় বৃষ্টি হয় যে এরকম বর্ষণ বৃদ্ধ লোকেরাও আগে কখনো দেখে নি। তারপর মুরগীর ডিমের মত শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। নদীতে বন্যা আসায় এবং প্রবল বায়ুর ঝাপটাতে নদীর ওপরের সেতুটি ভেঙ্গে যায়। আমি হারেমের মহিলাদের নিয়ে নৌকায় নদী পার হই। অল্পসংখ্যক নৌকা থাকায় আমার লোকদের নৌকাতে পার হতে নিষেধ করি এবং সেতুটি মেরামত করার জন্য আদেশ দিই। এক সপ্তাহের মধ্যে সেতুটি পুনর্নির্মিত হলে সমস্ত সেনাবাহিনী সহজেই পার হয়ে আসে।

বিহাতের (ঝিলাম) উৎপত্তিস্থল কাশ্মীরের একটি ঝরণা। এর নাম বীরনাগ (ভেরিনাগ)। হিন্দুস্থানী ভাষায় বীরনাগ একটি সাপ। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় এই জায়গায় কোনও কালে একটি বড় আকারের সাপ ছিল। পিতার

জীবিতকালে এই ঝরণা দেখতে দুইবার যাই। কাশ্মীর থেকে এর দূরত্ব বিশ ক্রোশ। জলাধারটি আটকোণা বিশিষ্ট, আকৃতিতে ২০ গজ×২০ গজ। এরই কাছে সন্ন্যাসীদের আরাধনা স্থানের অনেক চিহ্ন আছে—যেমন পাহাড় কেটে ছোট ছোট কক্ষ ও অসংখ্য গুহা। এখানকার জল অত্যন্ত স্বচ্ছ। জলাধারের গভীরতা কত আন্দাজ করতে পারিনি। তবে একটি পোস্তবীজ জলে ফেললে সেটি তলায় না পৌছানো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। জলের মধ্যে অনেক মাছ চোখে পড়ে। এটা অতলস্পর্শী এই জনশ্রুতি শুনতে পেয়ে আমি একটা দড়িতে পাথর বেঁধে জলে ফেলতে আদেশ দিই। গজের ফিতায় দড়িটি মাপা হলে দেখা গেল—দেড়মানুষ মাপের সমান এর গভীরতা।

আমার রাজ্যাভিষেকের পর প্রস্রবণটির পাশগুলি পাথর দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ দিই। সেখানে জল-নালা সহ একটি উদ্যানও রচনা করা হয়। চারধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরি করে জায়গাটিকে এমন মনোহর করে তোলা হয় যে পর্যটকদের পৃথিবীর আর কোনও স্থানে এমন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। কাশ্মীর নগরের দশ ক্রোশ দূরে পাম্‌পুর গ্রামের কাছে নদীটি আকারে বেশ বড়। কাশ্মীরের জাফরান এই গ্রামে পাওয়া যায়। জানি না, পৃথিবীর আর কোনও স্থানে এমন জাফরান আছে কিনা। এখানকার বার্ষিক ফলনের পরিমাণ হিন্দুস্থানী পাঁচশ মণ এবং পারস্যের ওজনে পাঁচ হাজার মণ। যে ঋতুতে জাফরান গাছে ফুল ফোটে সেই সময় একবার মহামান্য পিতার সঙ্গী হয়ে এখানে এসেছিলাম। পৃথিবীর সব রকম গাছেই শাখা বের হয় আগে, তারপর পাতা আর ফুল। কিন্তু জাফরানের গুঁড়ি শুকনো মাটির ওপরে যেখানে চার আঙ্গুল চওড়া সেখান থেকে ফুল বেরোয়, রং রামধনুর মত। ফুলের চারটি পাপড়ি, মধ্যে চারটি কেশর যার রং কমলালেবুর মত, আঙ্গুলের একটি গাঁটের সমান লম্বা। এই হচ্ছে জাফরান। জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার বা জলসেচের প্রয়োজন হয় না। শুকনো মাটির চাপড়ার মধ্য দিয়েই গাছের চারা বের হয়। কোনও জায়গায় এক ক্রোশ, কোনও জায়গায় আধ ক্রোশ ব্যাপী একনাগাড়ে জাফরান চাষ হয়। দূর থেকে দৃশ্যটি চমৎকার। জাফরান তোলার সময় এর তীব্র গন্ধে আমার ভৃত্যদের মাথা ধরে। পুরো এক পেয়ালা সুরা পান করলেও আমার মাথা ধরে যায়। জাফরানের ফুল তোলার কাজে নিযুক্ত জন্তুর মত কাশ্মীরিদের জিজ্ঞাসা করি তাদের কেমন বোধ হচ্ছে। জানলাম, তাদের জীবনে মাথাধরা যে কি জিনিস তা জানে না।

বীরনাগ প্রস্রবণের জল এবং এর ডাইনে বাঁয়ে যেসব নদী-নালা আছে—সব জল মিলে বিহাত নদী গড়ে উঠেছে। এই নদী নগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একটা তীর ছুঁড়লে যতটা যায় এই নদীটি প্রস্থে তার চেয়ে বড় নয়। জল ভারী এবং হজমের ব্যাঘাত করায় কেউ এর জল পান করে না। এই নগরের কাছে ডাল্ নামে যে হ্রদটি আছে সেই হ্রদের জল কাশ্মীর-বাসীরা পান করে। বিহাত নদী (ঝিলাম) এই হ্রদের মধ্য দিয়ে বরমুলা গিরিসঙ্কট, পাক্‌লি ও দন্তুর পেরিয়ে পাঞ্জাবে পৌঁচেছে।

কাশ্মীরে অনেক স্রোতস্বতী ও প্রস্রবণ আছে। লার উপত্যকার নদীটি সব চেয়ে সুন্দর। সিহাবউদ্দিনপুরে এই নদীটি বিহাতের সঙ্গে মিশেছে। গ্রামটি কাশ্মীরের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। প্রায় একশত চানার বৃক্ষ একখণ্ড জমির উপর সবুজ শাখাপল্লবে পরস্পর এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, সমস্ত জমিটাই ছায়ায় ঢাকা। ভূমিতল ঘাসে ঢাকা থাকায় এমন মনোরম দেখায় যে এখানে গালিচা পাতার কল্পনা আতিশয্য এবং কুরুচির পরিচায়ক বলে গণ্য হবে। গ্রামটি সুলতান জয়নাল আবেদিন স্থাপিত করেন। তিনি একাদিক্রমে বাহান্ন বছর কাশ্মীর শাসন করেন। কাশ্মীরিরা তাঁকে মহান পাদশা (বাদশা) বলে জানেন। তারা তাঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত রীতির কথা বলে। তাঁর তৈরি অনেক অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ ও নিদর্শন কাশ্মীরের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে দেখা যায়।

এর মধ্যে একটি ওয়ালুর হ্রদের মধ্যস্থলে। হ্রদটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তিন-চার ক্রোশের বেশী। অট্টালিকার নাম 'জইন্‌লংকা'। এটি তৈরি করতে লোকেদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্রথমবার নৌকায় অনেক পাথর এনে যেখানে অট্টালিকাটি তৈরি হয়েছে সেখানে জলে ফেলা হয়। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় না। শেষে হাজার হাজার পাথর বোঝাই নৌকা এইখানে ডুবিয়ে দেওয়ার পর জলের মধ্যে ১০০ গজ × ১০০ গজ মাটি ভেসে ওঠে।

জায়গাটা সমতল ও উঁচু করে বাঁধিয়ে নিয়ে তার একপাশে সুলতান আল্লার আরাধনার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর নেই। তিনি নৌকায় এখানে এসে জ্ঞানরাজ্যের অধীশ্বরের উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। এখানকার লোকে বলে যে, তিনি বছরের অনেক চল্লিশ দিন এখানে কাটিয়ে গেছেন। তাঁর একটি দুষ্ট পুত্র তাঁকে হত্যা করার জন্য এখানে আসে। তাঁকে একা পেয়ে তরবারি হাতে নিয়ে ভিতরে যায়। সুলতানের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর দেহে সম্ভ্রান্ত মহিমার ছাপ ও দিব্যজ্যোতি ফুটে উঠেছে দেখতে

পেয়ে হতভম্ব হয়ে ফিরে আসে। সুলতান কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে পুত্রের নৌকায় এসে বসেন এবং নগরের দিকে যাত্রা করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি পুত্রকে বলেন—"আমার জপমালাটি ভুলে ফেলে এসেছি। একটা ডিঙ্গি নিয়ে ফিরে গিয়ে মালাটি নিয়ে এসো।" পুত্র মসজিদে ফিরে গিয়ে তার বাবাকে সেইখানেই দেখতে পায়। কলঙ্কিত-চরিত্র পুত্র অনুতপ্ত হয়ে পিতার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে তার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক রহস্যজনক কথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। লোকে এ কথাও বলে যে তিনি 'খালা' বিদ্যা (শরীর থেকে আত্মাকে বের করে আনা) অনুশীলন করতেন। পুত্রদের আচরণে তিনি দেখতে পেলেন যে তারা রাজ্যশাসন হাতে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। তিনি তাদের বলেছিলেন—"আমার পক্ষে শাসন-ভার ত্যাগ করা খুব সহজ। কিন্তু আমি চলে গেলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না, তোমাদের সমৃদ্ধিও বেশীদিন থাকবে না। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের কুকর্ম ও বদ্‌স্বভাবের উপযুক্ত প্রতিফল পাবে।" এই কথা বলার পর তিনি পানাহার ত্যাগ করে চল্লিশ দিন থাকেন। তাঁর চোখের পাতায় ঘুম নামেনি। সাধকপুরুষরা যেভাবে ঈশ্বরের আরাধনায় সর্ব সময় কার্যের মধ্যে থাকেন সেইভাবেই এই দিনগুলি অতিবাহিত করেন। চল্লিশ দিনের দিন তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি আল্লার আশ্রয়ে গমন করেন। তিনি তিন পুত্র রেখে যান। তাদের নাম—আদম খাঁ, হাজি খাঁ ও বহরম খাঁ। তারা পরস্পর ঝগড়াবিবাদ করে ধ্বংস হয়। কাশ্মীর রাজ্য তারপর চাক্‌জাতির হাতে চলে যায়। এ দেশের সাধারণ সৈন্যশ্রেণী এই চাক্ জাতি। এই বংশের তিনজন রাজা ওয়ালুর হ্রদে জইনাল আবেদিনের তৈরি সমতল ক্ষেত্রের তিন পাশে তিনটি ইমারত তৈরি করেন। তার কোনটিই তাঁর তৈরি মসজিদের মত শক্ত ছিল না।

কাশ্মীরের শরৎ ও বসন্ত ঋতু উপভোগের মত। এখানকার শরৎকাল আমি দেখেছি। আমার মনে হয় যা শুনেছি তার চেয়েও বেশী প্রশংসার যোগ্য এই ঋতু। এখানকার বসন্ত ঋতু আমি দেখিনি। আশা রাখি একদিন না একদিন দেখবই।

*

* *

১লা মহরম শনিবার (১৮ই এপ্রিল, ১৬০৭) বিহাতের তীর ছাড়বার এক

দিনের মধ্যেই রোটাস্ দুর্গে পৌঁছাই। এই দুর্গ শের খাঁ আফগান তৈরি করেছিলেন। মাটির ফাঁকে (গর্তে) এই দুর্গটি এমন মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল যা কল্পনাও করা যায় না। এই জায়গাটি ঘাথর রাজ্যের কাছাকাছি। সেখানকার লোক অহঙ্কারী ও বিদ্রোহভাবাপন্ন দেখে এই দুর্গটি তাদের শাস্তি দেওয়া ও পরাজিত করার উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। দুর্গের কিছুটা তৈরি হওয়ার পর শের খাঁ মারা যান। তাঁর পুত্র সলিম খাঁ এই দুর্গ নির্মাণ শেষ করার গৌরব লাভ করেন। দুর্গের একটি ফটকে একটি প্রস্তর-ফলকে দুর্গ নির্মাণের খরচের অঙ্ক খোদাই করে রাখা হয়েছে। অঙ্ক দেখে জানা যায় যে নির্মাণে ষোল কোটি দশ লক্ষ দামের চেয়েও বেশী খরচ হয়েছে যা হিন্দুস্থানী মুদ্রার হিসাবে চল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, ইরাণের মুদ্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার তুমান ও তুরাণের মুদ্রার এক কোটি একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার খানি (দাম—টাকার ১।৪০ ভাগ এবং তুরাণের খানি টাকার ১।৩ ভাগ)।

এই মাসের ৪ঠা তারিখ মঙ্গলবার পৌনে চার ক্রোশ আসার পর 'তিলা'য় শিবির ফেলি। সেখান থেকে ভাখরা গ্রামে আসি। ঘাথর ভাষায় ভাখ্‌রা মানে জঙ্গল। জঙ্গলটি শ্বেতবর্ণ ও গন্ধহীন ফুলগাছের ঝোপ। সমস্ত রাস্তাটা শুক্‌নো নদীর মধ্য দিয়ে আসি। পাশ দিয়ে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। দুই পাশে পিচফুল রংয়ের অসংখ্য করবী ফুল। হিন্দুস্থানে এই ফুল সব সময়ই ফুটে থাকে। নদীর দুই তীরেই অসংখ্য করবী ফুলের গাছ। যে সব পদাতিক ও অশ্বারোহী আমার সঙ্গে ছিল, তাদের এই ফুলের গুচ্ছ মাথায় বাঁধতে বলি। যারা তা করেনি তাদের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে ফেলতে আদেশ দিই। ফুল-বাঁধা মাথাগুলি এক অপরূপ ফুলের কেয়ারি সৃষ্টি করেছিল।

এই মাসের ৬ই তারিখ বৃহস্পতিবার হাতিয়ায় আসি। রাস্তায় অসংখ্য পলাশ গাছে ফুল ফুটে আছে। এই ফুলও হিন্দুস্থানের জঙ্গলের বৈশিষ্ট্য। গন্ধ নেই—কিন্তু বর্ণ জলন্ত লাল। ফুলের তলাটা কালো। একটা বড় লাল গোলাপের মত বড় এই ফুল। দেখতে এত সুন্দর যে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। মৃদুমন্দ হাওয়া, মেঘে ঢাকা সূর্য, ঝিরঝিরে বৃষ্টি আমার সুরা-পানের তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিল। মোটের উপর এই পথটা বেশ আনন্দে উপভোগ করতে করতে এসেছি।

এই জায়গাটির নাম 'হাতিয়া' বলে এইজন্য যে হাতি (হস্তী) নামে এক-জন ঘাথর এই গ্রাম পত্তন করে। মারগলা থেকে হাতিয়া পর্যন্ত দেশটাকে

'পথুয়ার' বলে। এই দেশে কাক খুবই কম চোখে পড়ে। রোটাস্ থেকে হাতিয়া বুগিয়ালদের বাসভূমি। তারা ঘাখরদের সমগোত্রীয়।

৭ই শুক্রবার যাত্রা করে সাড়ে চার ক্রোশ যাওয়ার পর 'পাক্কা'য় এসে নামি। এই জায়গাটির নাম পাক্কা হওয়ার কারণ এই যে সরাইটি পোড়ানো ইটের তৈরি। হিন্দী ভাষায় যেটা কাঁচা মাটির নয়—সেইটিই পাক্কা। জায়গাটি ধুলোমাটিতে অদ্ভুত ভাবে ভর্তি। রাস্তা খারাপ থাকায় শকটগুলি অতি কষ্টে আসে। কাবুল থেকে রেউচিনি গাছ এনে এখানে বোনা হয়। কিন্তু তার প্রায় সবগুলিই মারা যায়।

৮ই তারিখ শনিবার সাড়ে চার ক্রোশ এসে 'খরে' শিবির ফেলি। ঘাখর ভাষায় খর মানে ফাটা ভাঙা-চোরা জিনিস। এদেশে গাছ খুব অল্পই আছে। ৯ই রবিবার রাওয়ালপিণ্ডির কাছে পৌঁছাই। রাওয়াল নামে এক হিন্দু এই স্থান স্থাপন করে। ঘাখর ভাষায় পিণ্ডি মানে গ্রাম। এই জায়গার কাছে উপত্যকার মধ্য দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। তার জলে একটি জলাশয় ভর্তি করে রাখা হয়েছে। জায়গাটি খারাপ বলে বোধ না হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য সেখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি। ঘাখরদের জিজ্ঞাসা করি—জলাশয়টির গভীরতা কত। তারা কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারলো না। বললো—তাদের বাপ-কাকাদের কাছে শুনেছে যে এখানে অনেক কুমীর আছে। যখনই কোনও জন্তু জলে নেমেছে তাদেরই কুমীর আহত করেছে। সেইজন্য কারও জলে নামার সাহস হয়নি। একটা ভেড়া জলে ফেলে দেওয়ার আদেশ দিলাম। ভেড়াটি সাঁতরিয়ে পেরিয়ে গেল ও জল থেকে উঠলো। আমি একজন ফরাসকে জলে নামতে বললাম। সেও নিরাপদে জল থেকে উঠে এলো। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল ঘাখররা যা বলেছে তার মধ্যে কোনও সত্য নাই। জলাশয়টি প্রস্থে একটি তীর ছুঁড়লে যতটা যায় ততটা।

১০ই সোমবার 'খরবুজা'য় আসি। ঘাখররা আগেকার দিনে এখানে একটি গম্বুজ তৈরি করে পথিকদের কাছ থেকে কর আদায় করতো। খরমুজের আকৃতির মত গম্বুজটি। তাই এই নামেই জায়গাটির পরিচয়। ১১ই মঙ্গলবার কালাপানিতে থামি। হিন্দীতে এর অর্থ কালো জল। এই জায়গায় একটি গিরিসঙ্কট আছে যার নাম 'মার গল্লা'। হিন্দীতে 'মার' মানে প্রহার করা, 'গল্লা' মানে বণিক ইত্যাদির দল। সুতরাং 'মার গল্লা'র অর্থ দাঁড়ালো যেখানে পথিকদের লুণ্ঠন করা হয়। এইখানে ঘাখর দেশের সীমান্ত। জাতটা অদ্ভুত

ধরনের, জন্তু-জানোয়ারের মত। তারা পরস্পর ঝগড়া, মারামারি নিয়ে ব্যস্ত। ইচ্ছা ছিল এদের মারামারি বন্ধ করবো। কিন্তু সফল হতে পারিনি। "মূর্খ আত্মা সৃষ্টি করে গণ্ডগোল।"

১২ই বুধবার 'বাবা হাসান আবদালে' আমার শিবির ফেলা হয়। জায়গাটির এক ক্রোশ পূর্বে একটা ঝরণা আছে। সেখান থেকে প্রবল বেগে জল ঝরে পড়ছে। কাবুলের রাস্তায় এমন ঝরণা আর নেই। কাশ্মীরের রাস্তায় এই রকম ঝরণা দুই তিনটি আছে।

অববাহিকার মাঝখানে যেখানে নদীর উৎপত্তি—রাজা মানসিংহ একটি ছোট্ট অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন। এখানে আধ গজ, সিকি গজ আকারের অনেক অনেক মাছ আছে। আমি তিনদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে এই মনো-মুগ্ধকর স্থানে আনন্দে কাটাই—সুরাপান করে আর মাছ ধরে। এ পর্যন্ত কোনও দিনই 'সুফ্‌রা' জাল ফেলে মাছ ধরিনি। এ একটি প্রসিদ্ধ মাছ ধরার জাল—হিন্দীতে যাকে বলে ভান্‌ওয়ার জাল। এ জাল জলে ছোঁড়া সহজ নয়। নিজের হাতে আমি এই জাল জলে নিক্ষেপ করে বারোটি মাছ ধরি। মাছ-গুলোর নাকে মুক্তা পরিয়ে আবার জলে ছেড়ে দিই।

স্থানীয় গল্পকথকদের কাছ থেকে বাবা হোসেনের গল্প শুনতে চাই। কিন্তু কেউই কোনও তথ্য দিতে পারেনি। এই জায়গার প্রসিদ্ধ স্থান একটি প্রস্রবণ। ছোট্ট পাহাড়ের তলদেশ থেকে বেরিয়েছে। জল খুবই পরিষ্কার ও সুপেয়। প্রমাণ স্বরূপ আমীর খসরুর এই কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে :—

"এমনি স্বচ্ছ জলের তলা,
অন্ধও পারে গভীর রাতে
শুনতে বালুকণা।"

খাজা সামসুদ্দিন মহম্মদ কাফি—যাঁকে আমার মহামান্য পিতা উজিরের পদে নিযুক্ত করেছিলেন—নিকটেই একটা জলাধার ও উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করেন। ঝরনার জল এই জলাধারে আনার ব্যবস্থা ছিল। সেই জল চাষের ক্ষেতে ও বাগানে ব্যবহার করা হতো। ঐ মঞ্চের ধারে তাঁর নিজের সমাধির জন্য একটি গম্বুজ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সেখানে সমাধিস্থ হওয়া ঘটেনি। আমার মহামান্য পিতার আদেশে তাঁরই অতি বিশ্বস্ত সহচর হাকিম আবুল-ফথ্‌-গিলানি এবং তাঁর ভাই হাকিম হুমামের শবদেহ এইখানে সমাধিস্থ করা হয়।

১৫ই তারিখ আমরোহিতে আসি। অতি সুন্দর সবুজে ঘেরা জায়গা এটি। এখানকার ভূমি সমতল। উঁচুনীচু জমি এখানে নাই। এই গ্রামে এবং কাছাকাছি জায়গায় খাতুর ও দাল্জাকদের সাত-আট হাজার বসতি আছে। সবরকম অপকর্ম, অত্যাচার, ডাকাতি এই জাতির লোকেরা করে থাকে। এই জায়গা আটকের শাসক জইন্খান্ কোকার পুত্র জাফর খাঁর ওপর অর্পণ করার আদেশ দিই। আরও আদেশ দিই যে রাজকীয় সেনাবাহিনী কাবুল থেকে ফেরার সময় সমস্ত দাল্জাক্দের লাহোরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং খাতুর সর্দারদের বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করবে।

১৭ই সোমবার রওনা হয়ে মাঝে এক জায়গায় থেমে রাজ-সৈন্যবাহিনী নিলাব নদীর তীরে আটক দুর্গের কাছে থামে। এই সময় মহবৎ খাঁ আড়াই হাজার মনসবদারি পদে উন্নীত হন। দুর্গটি পরলোকগত সম্রাট আকবর তৈরি করান। খাজা সাম্সুদ্দিন কাফির চেষ্টায় এই দুর্গ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। দুর্গটি খুবই মজবুত। এই সময় নিলাব নদীতে জল কম ছিল। সেইজন্য আঠারোটি নৌকা দিয়ে সাঁকোর মত তৈরি করে সবাই তার উপর দিয়ে সহজেই নদী পার হয়ে এলো। শরীরের দুর্বলতা ও অসুস্থতার জন্য আমির-উল-উমরাকে আটকেই রেখে গেলাম। বক্সিদের এই আদেশ দেওয়া হলো যে তারা যেন আমার নিজ পরিচারকদেরই নদী পার হতে দেয়। কারণ, কাবুল প্রদেশের পক্ষে বিপুল সৈন্যবাহিনীর আহার যোগানো কঠিন হবে। যতদিন আমি না ফিরি রাজশিবির আটকেই থাকবে।

১৯শে বুধবার রাজপুত্র ও কয়েকজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে ভেলায় চড়ে নিরাপদে নিলাব নদী পার হয়ে 'কামা' নদীর তীরে পৌঁছাই। 'কামা' নদী সুরক্ষিত শহর জালালাবাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। 'জলো' বাঁশ ও ঘাস দিয়ে তৈরি একটি ভেলার মত জিনিস—তার নীচে বাতাস ভরা চামড়ার থলি রাখা হয়। এই অঞ্চলে একে বলে—'সাল'। নদী বা কোনও জলস্রোতে যদি পাথর থাকে তাহলে এই রকম ভেলাই নৌকার চেয়ে নিরাপদ। মীর সরিফ আম্লুনি ও আরও কয়েকজনকে যাদের লাহোরে খয়রাতির কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তাদের হাতে বারো হাজার টাকা দেওয়া হয়। আবদুর রেজাক মাম্বুরি ও আহদিদের বক্সি বিহারী দাসকে আদেশ দেওয়া হয় যে জাফর খাঁর সঙ্গে যে সেনাবাহিনী যাবে তাদের প্রস্তুত করে যেন অবিলম্বে পাঠানো হয়। মাঝে একবার থেমে 'বারা' সরাইয়ে রাজশিবির

ফেলা হয়। 'কামা' নদীর অপর তীরে জইন খাঁ কোকা একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেই সময় তাঁকে ইউসুফজাই আফগানদের দমন করার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছিল। দুর্গটির নাম 'নওসরে' (নবদুর্গ)। দুর্গনির্মাণে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। শোনা যায় এইদিকে তিনি গণ্ডার শিকার করতেন। আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি যে তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে এসে দুই-তিনবার এই শিকার দেখেছিলেন।

২৫শে মঙ্গলবার দৌলতপুর এসে পৌঁছাই। পেশওয়ারের জায়গীরদার আমেদ বেগ কাবুলি ইউসুফজাই ও খরিয়াখেলের মালিকদের সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমেদ বেগের কাজে আমি সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে এই এলাকা থেকে বদলি করে শের খাঁ আফগানকে এই জায়গীরের ভার দিই।

২৬শে বুধবার সরদা খাঁর বাগানে আমার শিবির ফেলি। এই বাগান পেশওয়ারের কাছাকাছি তিনি তৈরি করেছিলেন। ফকিরদের উপাসনাস্থল 'ঘোর কাটরি'র চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। মনে আশা যে এমন ফকিরদের সঙ্গে দেখা হবে যাদের সাহচর্যে আমি পবিত্র হব। কিন্তু সেটা হলো রূপকথার পাখী কিংবা পরশ পাথর দেখার মত। ধর্মজ্ঞানহীন একপাল লোক আমার চোখে পড়লো। তাদের দেখে আমি কিছুই লাভ করলাম না। শুধু মনের অন্ধকার গভীর হলো।

*

* *

২৭শে বৃহস্পতিবার জামরুদে এসে পৌঁছাই ও ২৮শে শুক্রবার খাইবার কোটাল (খাইবার পাস্)। আলি মসজিদে আমার শিবির পড়ে। শনিবার আঁকাবাঁকা গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে 'গরীবখানা'য় এসে থামি। এইখানে জালালাবাদের জায়গীরদার আবুল কাশিম নামকিন খোবানি নিয়ে আসে। এগুলি কাশ্মীরি খোবানির চেয়ে খারাপ নয়। 'ডাকা'য় আসার পর 'গিলাস' (চেরি ফল) আমার জন্য আনা হয়। আমার বাবা এই ফলের নামকরণ করেছিলেন 'সা-আলা'। এই ফল খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। কিন্তু এতদিন এই ফল পাইনি। ফলগুলি খুব তৃপ্তি সহকারে মদের সঙ্গে খেলাম।

২রা সফর, মঙ্গলবার বসাওয়ালে নদীর তীরে শিবির ফেলি। নদীর অপর পারে একটা পর্বত। তাতে কোনও গাছ বা ঘাস জন্মায় না। সেইজন্য

এখানকার লোক এই পর্বতের নাম দিয়েছে—বে-দৌলত (হতভাগ্য)। আমি বাবার কাছে শুনেছি এইরকম পর্বতেই সোনার খনি থাকে। আমার মহান পিতা যখন কাবুল গিয়েছিলেন, আমি 'আলা বুমান' পর্বতে শিকার করতে যাই এবং কয়েকটি লাল হরিণ শিকার করি।

সমস্ত অসামরিক শাসনভার আমির-উল-উমরার ওপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর পীড়া অতিমাত্রায় বেড়ে যায় এবং স্মৃতিবিভ্রম এমনভাবে ঘটে যে, এক ঘণ্টা আগে যে কথা ঠিক হয় এক ঘণ্টা পরেই সে কথা ভুলে যান।—দিনের পর দিন তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে দেখে আসফ খাঁকে উজিরের পদ দেওয়া হলো। তাঁকে একটি বিশেষ পোশাক, একটি দোয়াত-দান এবং রত্নখচিত কলম উপহার দিই। এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা গেল। আটাশ বছর পূর্বে এই জায়গাতেই আমার মহান পিতা এঁকে মীর বক্সির পদে উন্নীত করেন। তাঁর ভাই আবুল কাশিম চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের যে চুনিটি কিনে তাঁকে পাঠিয়েছিল সেটি উজিরিপদ পাওয়ার পর আমাকে উপঢৌকন দেন। বক্সি খাজা আবুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান। জালালাবাদের ভার আবুল কাশিম নামকিনের হাত থেকে নিয়ে আরব খাঁর ওপর দেওয়া হয়। নদীগর্ভে একটি সাদা পাথর ছিল। সেটা হাতির আকারে খোদাই করতে আদেশ দিই। তার বুকে এই কথাগুলি খোদাই করতে বলি—'জাহাঙ্গীর পাদশার শ্বেত পাথরের হাতী'—যাতে হিজরি সন ১০১৬ বোঝায়।

সেইদিন রাজা বিক্রমজিতের পুত্র কল্যাণ গুজরাট থেকে আসে। এই বিদ্রোহী শয়তান সম্বন্ধে কিছু অদ্ভুত অভিযোগ আমার কাছে আসে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে—সে একটি মুসলমান স্ত্রীলোককে তার বাড়ীতে রাখে। এই ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ার ভয়ে স্ত্রীলোকটির বাবা ও মাকে হত্যা করে তার বাড়ীতেই কবর দেয়। যতদিন এই ব্যাপারের তদন্ত শেষ না হয় তাকে বন্দী করে রাখার আদেশ দিই। তদন্ত করার পর ব্যাপারটি সত্য জানতে পেরে আদেশ দিই যে প্রথমে তার জিভ কেটে ফেলে পরে তাকে আজীবন কারাগারে বন্দী করে রাখতে হবে, আর তাকে কুকুর-রক্ষক ও নীচজাতের লোকদের সঙ্গে খেতে হবে।

বুধবার সুরখাবে শিবির পড়ে। তারপর জগদালকে আসি। এখানে বাল্নাত (বাদাম) গাছ দেখি। পোড়াবার পক্ষে এই কাঠ উৎকৃষ্ট। এই

দিকে কোনও গিরিসঙ্কট কিংবা ঢালু জমি না থাকলেও যথেষ্ট পাথর দেখা যায়। ১২ই শুক্রবার 'আবি বারিকে' এবং ১৩ই শনিবার ইউরাত-ই-পাদশায় আসি। ১৪ই রবিবার খুর্দ কাবুলে পৌঁছাই। এইখানে মোল্লা সাদিক হাল-ওয়াইয়ের পুত্র কাজি আরিফকে কাবুলের প্রধান বিচারক এবং কাজির পদে নিয়োগ করি। গুলবাহার গ্রাম থেকে পাকা সা'আলা (চেরি ফল) আমার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়। আমি খুব তৃপ্তির সঙ্গে প্রায় একশোটা ফল খাই। জিগ্রি গ্রামের সর্দার দৌলত কতকগুলি অসাধারণ ফুল নিয়ে আসে। এমন ফুল আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এর পর 'বিক্রামি'তে আসি। এখানে আমাকে দেখানোর জন্য নানা রংবিশিষ্ট এক জন্তুকে আনা হয়। দেখতে লাফানো ইঁদুরের মত। হিন্দী ভাষায় এর নাম—গালারি (কাঠবেড়ালি)। শুনলাম যে বাড়ীতে এই জন্তু থাকে সেখানে ইঁদুর আসতে পারে না। এই জন্যই লোকে একে ইঁদুরের প্রভু বলে। এ রকম জন্তু আমি কোনও দিন দেখিনি। আমার চিত্রকরদের এর ছবি আঁকতে আদেশ দিই। জন্তুটি বেজির চেয়ে বড়। মোটের ওপর এটা গন্ধগোকুলের (খট্টাস) মত।

আমেদ বেগ খাঁকে বনগাসের আফগানদের শাস্তি দেওয়ার ভার দিই। আটকেআবদুর রেজাক মাম্বরির কাছে এই আদেশ পাঠাই যে তিনি যেন রাজা বিক্রমজিতের পুত্র মোহনদাসের সঙ্গে কুড়ি লক্ষ টাকা নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করেন। এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক হাজার বন্দুক-ধারী সৈন্য পাঠানোরও আদেশ দিই।

শেখ আবুল ফজলের পুত্র শেখ আবদুর রহমানকে দুই হাজার পদাতিক ও দেড়হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারি পদে উন্নীত করে তাকে 'আফজল খাঁ' উপাধি প্রদান করা হয়। আরব খাঁকে পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ এবং আরও কুড়ি হাজার টাকা পেশ বুলাম দুর্গ মেরামতের জন্য দেওয়া হয়। জায়গীর হিসাবে খানপুর পরগণা দিলওয়ার আফগানকে দেওয়া হয়। ১৭ই বৃহস্পতিবার মস্তান সেতু থেকে শহর-আরা উদ্যানে যাওয়ার পথে দুই পাশে জমায়েত ফকির ও দরিদ্রদের টাকা, আধুলি, সিকি ছড়াতে ছড়াতে ঐ উদ্যানে প্রবেশ করি। উদ্যানটিতে সবুজের সমারোহ। সেদিন বৃহস্পতিবার। আমি সঙ্গীদের নিয়ে সুরাপান উৎসব করি। আনন্দের উত্তেজনার আতিশয্যে সঙ্গীদের মধ্যে বয়সে যারা আমার সমান এবং যারা আমার ক্রীড়াসঙ্গী ছিল তাদের উদ্যানের মধ্যে চার গজ চওড়া প্রবাহিত জলনালা লাফিয়ে পার হতে বলি।

অনেকেই পার হতে পারলো না। কেউ বা জলে কেউ বা জলের ধারে পড়ে গেল। আমি জলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হলেও এখন বয়স চল্লিশ হওয়ায় দশ বছর আগে ত্রিশ বছর বয়সে আমার মহান পিতার সম্মুখে যেমন সহজ ও সাবলীল ভাবে পার হয়েছিলাম এবার আর তেমনটি হলো না। এই দিন কাবুলের সাতটি প্রসিদ্ধ উদ্যান ঘুরে ঘুরে দেখি। মনে হয়, এর পূর্বে এতটা রাস্তা কোনও দিনই পায়ে হেঁটে যাইনি।

প্রথম 'শহর আরা' (নগর সুন্দর) উদ্যানের চারপাশে বেড়াই। তারপর মহাতাব (চাঁদের আলো) উদ্যান, তারপর আমার পিতার ঠাকুমা বিকা বেগমের উদ্যান। তারপর, উত্তা বাগ (মধ্যবাগান) অতিক্রম করে আমার নিজের পিতামহী মরিয়ম মকানির তৈরি বাগানে যাই। তারপর যাই সুরৎখানা বাগানে। এখন এমন একটি বিশাল চনার গাছ আছে—যা কাবুলের আর কোনও উদ্যানে নেই। শেষে সব চেয়ে বড় 'চারবাগ' দেখে আবাসে ফিরে আসি। গাছে গাছে চেরি ফল—প্রত্যেকটি ফল গোল চুনীর মত। দেখে মনে হচ্ছে যে গাছে অসংখ্য গোলক ঝুলছে। 'শহর আরা' উদ্যানটি মির্জা আবু সৈয়দের কন্যা শহরবানু বেগমের তৈরি। তিনি ছিলেন পরলোকগত সম্রাট বাবরের আপন পিসি। সময় সময় এই বাগানটিকে বাড়ানো হয়। সৌন্দর্যে এমন বাগান কাবুলে আর একটিও নেই। এই বাগানে সব রকমের ফল এবং আঙুর আছে। ফলগুলি এমন নরম যে জুতো পরা পায়ে এই ফল মাড়ানো অসৌজন্য ও কুরুচির পরিচায়ক গণ্য হবে। এই উদ্যানের কাছেই একখণ্ড সুন্দর জমি আমার নজরে পড়ে। এই জমির মালিকদের কাছ থেকে জায়গাটি কিনে নেওয়ার আদেশ দিই। 'গুজরগার' (গয়াঘাট) নিকটেই যে স্রোতস্বতী বয়ে যাচ্ছে সেই প্রবাহের গতি পরিবর্তিত করে এই জমির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ারও আদেশ দিই। কারণ, এখানে এমন একটি উদ্যান রচনা করার আমার অভিলাষ যেমনটি জন-অধ্যুষিত পৃথিবীতে আর কোনও জায়গায় নাই। এই বাগানটির নামকরণ করি 'জাহানারা' (জগৎ-সুন্দরী)। কাবুলে থাকার সময় শহর আরা উদ্যানে কয়েকবার উৎসব করি—কয়েকটি আমার সহচর ও সভাসদদের নিয়ে, আর কয়েকটি আমার অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে। রাত্রে শিক্ষিত ব্যক্তি ও ছাত্রদের 'বুঘরা' রন্ধন (ময়দার গোলাকার মিষ্টি তৈরি) ও বুঘরা ছোঁড়া এবং 'আরঘস্টক' (বালিকা ও যুবকদের হাততালি দিতে দিতে গানের সঙ্গে নাচ) নৃত্য উৎসব করার জন্য আদেশ দিই।

'বুঘরা' উৎসবে যে সব দল যোগ দেয় তাদের প্রত্যেককে একটি করে সম্মান-স্থচক পোশাক ও তাদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এক হাজার টাকা দিই। বারোজন বিশ্বাসী কর্মচারীকে আমি যতদিন কাবুলে থাকবো ততদিন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দরিদ্রদের বিতরণ করার জন্য বারো হাজার টাকা দেওয়ার হুকুম দিই। বাগানের মধ্যস্থলে নালার ধারের যে গাছ দুটির একটির নাম দিয়েছি 'ফরার বকস্' (আনন্দদায়ী) ও আর একটির নাম দিয়েছি 'সরা বকস্' (ছায়া-দায়ী) তাদের মাঝখানে একখণ্ড শ্বেতপাথরে আমার নাম থেকে তাইমুর পর্যন্ত আমার পূর্বপুরুষদের নাম খোদাই করে স্থাপন করার নির্দেশ দিই। পাথরের উল্টোপিঠে লেখা থাকবে যে আমি কাবুলের রীতিনীতি ও দায়িত্ব পালন করছি। যদি আমার পরবর্তী বংশধর ও উত্তরাধিকারীরা বিপরীত কিছু করে তাহলে তারা আল্লার ক্রোধ ও অসন্তোষের কারণ হবে। আমার রাজ্যা-ভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত এখানকার এইসব রীতিপালন ও উৎসবের ব্যয়নির্বাহের জন্য আল্লার ভৃত্যদের (সাধারণ ভাবে মুসলমানদের) কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করা হতো। এইরূপ জুলুম আমার রাজত্বকালেই বন্ধ হয়। আমার কাবুল ভ্রমণ আমার প্রজাবর্গ এবং স্থানীয় লোকদের কাছে খুবই আনন্দ-দায়ক ও আরামপ্রদ হয়েছিল। গজনি এবং নিকটস্থ স্থানের সৎ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মানস্থচক পোশাক উপহার স্বরূপ দেওয়া হলো। তাঁদের মনোবাসনা ভাল ভাবে পূরণ করে তাঁদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করি।

একটা অদ্ভুত সংঘটন এই যে—'রুজ-ই-পান্‌চান্‌বা-হিজদা-ই-সার' কথাগুলি ১৮ই শফর, বৃহস্পতিবার যেদিন আমি কাবুলে প্রবেশ করি—হিজরা সনের (১০১৬) সালে মিলে যায়। এই তারিখ পাথরে খোদাই করে রাখতে আদেশ দিই।

কাবুল নগরের দক্ষিণে এক পাহাড়ের ঢালুতে একটি আসনে ফারদুস মাকানি (বাবর) উপবেশন করে সুরাপান করতেন—যাকে 'তকৃথ-ই-সা' বলা হয় তার কাছে এখানকার লোকেরা পাথরের পাটাতন করে দিয়েছে। এই পাথরের এক কোণে গোলাকার জলপাত্র তারা তৈরি করেছে—যাতে হিন্দুস্থানী ওজনের দুই মণ মদ ধরতে পারে। তিনি নিজে তাঁর পবিত্র নাম তারিখ সহ পাথরের দিকের দেওয়ালে খোদাই করিয়ে রেখেছিলেন। পাথরে খোদাই করা কথাগুলি এই :—রাজার আসন, পৃথিবীর আশ্রয় ওমর শেখ গুরগনের পুত্র জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। ঈশ্বর তাঁর রাজ্য কায়েম করুন (৯১৪)।

আমি পাথর কেটে আর একটি রাজাসন এবং উপরোক্ত আকারের আর একটি জলপাত্র তৈয়ারি করাই। সেখানে আমার ও সাহিব কিরানির (তাইমুর) নামও খোদাই করে রাখা হয়। প্রতিদিন সেই রাজাসনে বসে ঐ দুইটি পাত্র সুরায় ভরতি করতে আদেশ দিই। সেই সুরা উপস্থিত আমার ভৃত্যদের পান করতে বলি। ঘজনিনের একজন কবি আমার কাবুলে আসার তারিখটি এই কথাগুলির মধ্যে আবিষ্কার করে—'সাত দেশের অধীশ্বর (১০১৬)'। আমি তাকে সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিই। এই সনটি আসনের কাছে পাথরের দেওয়ালে খোদাই করে রাখার আদেশ করি।

পরভেজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও ওয়াজিরল্ মুলক্কে মীরবক্সি পদ দেওয়া হয়। কান্দাহারের সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য লাহোরের কোষাগার থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা পাঠাতে কিলিজ খাঁর নিকট ফর্মান যায়। কাবুলের খিয়াবান রাজপথ ও বিবি মাহারু পরিদর্শন করে আমি নগরের শাসককে হোসেন বেগ রু-সিইয়া (কালো মুখ) যে সব গাছ কেটে ফেলেছে সে সব জায়গায় নতুন গাছ বোনার আদেশ দিই। চালাকের উলাং-ইয়ুরত পরিদর্শন করি। খুব সুন্দর জায়গা এটি। জিত্রির রাজা তীর নিক্ষেপ করে একটি র্যাং শিকার করে আমার কাছে আনেন। আমি আগে কখনও র্যাং দেখিনি। দেখতে পাহাড়ী ছাগলের মত। পার্থক্য শুধু শিং-এ। র্যাংয়ের শিং বেঁকানো ও ছাগলের শিং সোজা ও ভাঁজকাটা।

কাবুলের বিবরণ দিতে গিয়ে 'বাবরের আত্মকথা'য় তাঁর মন্তব্য আমার মনে খেলে গেল। এটা তার নিজের হাতে লেখা। পরে আমি চারটি অংশ (অধ্যায়) নিজে লিখে এর সঙ্গে জুড়ে দিই। (সম্ভবতঃ কাবুলে রক্ষিত বাবরের নিজের হাতে লেখা আত্মচরিত পড়বার সময়)। আমার লিখিত অধ্যায়ের শেষে তুর্কি হরফে একটি বাক্য লিখি—এই কথা বোঝাবার জন্য যে আমি নিজের হাতে এই চার অধ্যায় লিখেছি। হিন্দুস্থানে মানুষ হলেও তুর্কি ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে অক্ষম ছিলাম না।

২৫শে সফর আমি আমার অন্দরমহল-বাসিনীদের সঙ্গে 'সাফিদসং'এর জুলগা (সমতল ক্ষেত্র) দেখতে যাই। জায়গাটি খুবই সুন্দর ও উপভোগ্য।

২৬শে শুক্রবার মহামান্য সম্রাট ফারদুস্ মকানির (বাবর) সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রার সৌভাগ্যলাভ করি। প্রচুর পরিমাণ খাদ্য, রুটি, মিঠাই, এবং অর্থ পরলোকগত আত্মাদের কল্যাণের জন্য ফকিরদের মধ্যে বিতরণের জন্য আদেশ

দিই। মির্জা হিন্দলের কন্যা রুকাইয়া সুলতান বেগম তাঁর পিতার সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রায় এর পূর্বে আসেননি। তিনিও এইদিন এই সৌভাগ্যলাভ করেন।

৩রা রবিয়ল আওয়াল বৃহস্পতিবার খিইয়াবানে (অ্যাভেনিউ) দৌড়ের ঘোড়া আনতে বলি। রাজপুত্র ও আমিরদের ঘোড়দৌড় খেলায় যে আরবি ঘোড়াটি দাক্ষিণাত্যের শাসক আদিল খাঁ আমার কাছে পাঠিয়েছিল সেই ঘোড়াটাই অন্য সব ঘোড়ার চেয়ে ভাল দৌড়ায়। এই সময় হাজরাসদের প্রধান সর্দার মির্জা সন্‌জার হাজরাসের পুত্র এবং মির্জা মাসির পুত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মিরদাদ গ্রামের হাজরাসরা দুটি র‍্যাং আমার সামনে নিয়ে আসে। দুটোকেই শরবিদ্ধ করে মেরেছিল। এত বড় র‍্যাং আমি আগে কখনও দেখিনি। একটা 'মারখুরে'র (ঘোড়া) চেয়েও আকৃতিতে শতভাগের কুড়ি ভাগ বড়।

সংবাদ পেলাম কান্দাহারের শাসক তাঁর জায়গীর সোর (সোর কোট, মুলতানের উত্তরে ঝাং জেলায়) এসেছেন। ঠিক করলাম তাঁর উপরই কাবুলের ভার দিয়ে হিন্দুস্থানে ফিরে যাব। রাজা বীরসিং দেওরের কাছ থেকে আবেদন এলো যে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বন্দী করেছেন। কারণ, সে গণ্ডগোল করিয়ে অনেক লোককে হত্যা করেছে। তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে সেখানে বন্দী করে রাখার আদেশ দিই।

১৮ই শুক্রবার আমার চল্লিশ বছর বয়সপ্রাপ্তির 'ওয়াজন-ই-কামারি' (চান্দ্র বৎসরের ওজন নেওয়ার উৎসব) সম্পন্ন হয়। দিনের দুই প্রহর অতীত হওয়ার পর এই উৎসব শুরু হয়। আমার ওজনের টাকার মধ্যে দশ হাজার টাকা আমার দশজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হাতে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য দেওয়া হয়। কান্দাহারের শাসক সর্দার খাঁর লেখা একখানি চিঠি হাজারা ও গজনির পথে বারো দিন পর আমার কাছে পৌছায়। চিঠির মর্ম এই—আমার দরবারে আসার উদ্দেশ্যে শা আব্বাসের দূত হাজারায় এসে পৌছেছে। শা তাঁর নিজের প্রজাদের লিখেছেন—'আমার বিনা আদেশে কোন্ স্বার্থপর বিরোধ-সৃষ্টিকারী কান্দাহারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে? মহামান্য সুলতান তাইমুরের বংশের সঙ্গে আমাদের বিশেষ করে হুমায়ুন ও তাঁর গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকারীদের সম্পর্ক সে কিছুই জানে না। যদি তারা কোনও রকমে কান্দাহার নিজেদের দখলে এনে থাকে তাহলে যেন তারা অবিলম্বে ভ্রাতা জাহাঙ্গীর পাদশার বন্ধু ও কর্মচারীদের হাতে সমর্পণ করে নিজ নিজ

দেশে ফিরে আসে।'

শা বেগ খাঁকে এই কথা জানাতে মনস্থ করি যে—তিনি যেন গজনির রাস্তা এমনভাবে সুরক্ষিত করেন যাতে পথিকরা বিনাবাধায় কান্দাহার থেকে কাবুলে পৌঁছাতে পারে। কাজি নুরুদ্দিনকে এই সময় মালব ও উজ্জয়িনী প্রদেশের সদারৎ (সদরওয়াল) নিযুক্ত করি। করাচা খাঁয়ের পৌত্র, মির্জা সাদমান হাজারার পুত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। করাচা খাঁ হুমায়ুনের একজন প্রভাবশালী আমির ছিলেন। তিনি হাজারা জাতির একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সাদমান সেই স্ত্রীলোকের গর্ভজাত।

১৯শে শনিবার—সিনওয়ারি আফগানরা একটা পাহাড়ী ভেড়া নিয়ে আসে। তার দুটি শিং একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে ব্যাংএর শিঙের মত দেখাচ্ছে। এই আফগানরাই একটি মারখার (সর্প ভক্ষণকারী ছাগ) মেরে নিয়ে আসে। এরকম জন্তু আমি আগে দেখিওনি, কল্পনাতেও আনিনি। আমার চিত্রকরদের এর ছবি আঁকতে আদেশ দিই। ওজনে এটি হিন্দুস্থানী চার মণ, শিং লম্বায় দেড় গজ।

২৭শে রবিবার, কাজি ইজ্জত উল্লা ও তার ভাইদেরও বংগাস বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করি। এই দিনের শেষে আগ্রা থেকে ইসলাম খাঁর একটি চিঠি আসে, সেই সঙ্গে তার কাছে বেহার থেকে লেখা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর পত্র। চিঠিখানির মর্ম এই। ৩রা সফর (৩০শে মে, ১৬০৭) প্রথম প্রহরের পর কুলি ইস্তাজলু কুতুবউদ্দিন খাঁকে আহত করে। রাত দুই প্রহরের পর তিনি মারা যান। এই ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ এই যে উপরোক্ত আলি কুলি ইরানের রাজা শা' ইসমাইলের (দ্বিতীয়) সাফরাচি (খাদ্য পরিবেশক) ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সে তার স্বভাবসিদ্ধ নষ্টামি ও ক্ষতিজনক কাজ করার দুর্বুদ্ধির প্ররোচনায় সেখান থেকে পালিয়ে কান্দাহারে আসে। সিন্ধু প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত খান্‌খানানের সঙ্গে তার মুলতানে দেখা হওয়ায় তাঁর সঙ্গে সেই প্রদেশে আসে। খান্‌খানানা পরলোকগত সম্রাট আকবরের কর্মচারীদের মধ্যে তাকেও স্থান দেন। ভাল কাজ করায় তার পদোন্নতি হয়।

আমার মাননীয় পিতার অধীনে সে অনেকদিন কাজ করে। তিনি (আকবর) দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণরূপে জয়ের গৌরব লাভ করার পর আমাকে রাণার বিরুদ্ধে অভিযানের ভার দিলে সে আমার কাছে আসে ও আমার অধীনে চাকুরিতে বহাল হয়। আমি তাকে শের আফগান উপাধি দিই।

এলাহাবাদ থেকে যখন আমার মহান পিতার কাছে আসি, সেই সময় আমার বেশীর ভাগ কর্মচারী অবান্ধবোচিত মনোভাব প্রদর্শন করে দূরে সরে যায়। তাদের সঙ্গে সেও আমার চাকুরি ত্যাগ করার পথই বেছে নেয়। আমার রাজ্যাভিষেকের পর উদার মনোভাব নিয়ে তার অপরাধ উপেক্ষা করে তাকে সুবা বাংলায় জায়গীর দেওয়ার আদেশ দিই। তারপর সংবাদ আসে যে তার মত ক্ষতিকারক লোককে এখানে রাখা ঠিক নয়। কুতুবউদ্দিন খাঁর কাছে তাকে দরবারে পাঠানোর জন্য আদেশ চলে যায়। আর যদি কোনও রাজদ্রোহজনক মতলব টের পাওয়া যায় তাহলে যেন তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

কুতুব খাঁ তার চরিত্র ভাল ভাবেই জানতেন। এই আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি লোকজন নিয়ে তাড়াতাড়ি তার জায়গীর বর্ধমানে চলে আসেন।

কুতুব খাঁর বর্ধমানে আগমনের কথা জানতে পেরে সে একাই (দুইজন সহিস সঙ্গে নিয়ে) তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যায়। সে কুতুব খাঁর শিবিরে প্রবেশ করলে সৈনিকরা তাকে ঘেরাও করে ফেলে। কুতুব খাঁর এই কাজে তার মনে সন্দেহের উদয় হয়। সে ছলনা করে বলে—'তোমার এ কেমন ব্যবহার ?' কুতুব খাঁ তাঁর লোকদের দূরে সরে যেতে নির্দেশ দিয়ে তার প্রতি আদেশের মর্ম জানানোর জন্য একাই তার কাছে থাকেন। সুযোগ বুঝে সে তরবারি টেনে নিয়ে কুতুব খাঁর দেহে দুই-তিনবার সজোরে আঘাত করে। কাশ্মীরের শাসক বংশোদ্ভূত এবং খাঁয়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তায় আবদ্ধ ও তাঁর পরম ভক্ত অম্বাখান কাশ্মীরী ব্যাপার দেখে পুরুষোচিত বীরত্ব দেখিয়ে ছুটে এসে আলি কুলি খাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করে। সেই শয়তানও তার তরবারি অম্বাখানের দেহে সজোরে ঢুকিয়ে দেয়। কুতুবউদ্দিন খাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁর লোক শের আফগানকে আক্রমণ করে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে নরকে পাঠিয়ে দেয়। আশা করা যায় এই কালো মুখ শয়তান সব সময় নরকেই বাস করবে। অম্বাখান সেই জায়গাতেই মারা যায়। কুতুবউদ্দিন খান কোকা চার প্রহরের পর আল্লার দয়ায় তাঁরই আশ্রয়ে চলে যান। এই মনোকষ্টদায়ক ব্যাপারের কথা আমি আর কি লিখবো। আমি শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। কুতুবউদ্দিন খাঁ কোকা আমার কাছে একাধারে প্রিয় পুত্র, দয়ালু ভ্রাতা এবং প্রিয় বন্ধুর মত ছিলেন। আল্লার ইচ্ছা রোধ করা কার সাধ্য ? ভাগ্যের কাছে মাথা নত করে তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। ভূতপূর্ব মহান সম্রাটের তিরোধানের পর কুতুউবদ্দিন খাঁ কোকার

মাতার মৃত্যু এবং তাঁর নিজের আত্মদানের মত দুর্ভাগ্য আর দ্বিতীয় বার হয়নি।

*

* *

৬ই রবিউল আখির, শুক্রবার খুররামের (সাজাহান) উরতা উদ্যান আবাসে আসি। সত্যই প্রাসাদটি সুন্দর ও সুসমঞ্জস। আমার পিতার নিয়ম ছিল যে তিনি নিজে সৌর ও চান্দ্র বৎসরে মোট দুইবার ও তাঁর পুত্রদের চান্দ্র বৎসরে একবার ওজনের ব্যবস্থা করতেন। এই বৎসর আমার পুত্র খুররামের ষোড়শ চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হলে জ্যোতিষীরা নিবেদন করেন যে খুররামের কোষ্ঠীবিচারে দেখা যাচ্ছে যে রাজপুত্রের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আসছে। তার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল না থাকায় আমি নির্ধারিত নিয়মানুসারে তাকে সোনা, রূপা এবং অন্যান্য ধাতুতে ওজন করা এবং সেই সব জিনিস ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে নির্দেশ দিই। বাবা খুররামের বাড়ীতে সারাদিন বেশ আনন্দেই কাটলো। সে ভাল ভাল উপহার পেয়েছিল।

কাবুলের সৌন্দর্য বেশ ভাল ভাবে উপভোগ করেছি। এখানকার উপাদেয় ফলও খেয়েছি। এখন রাজধানীতে ফেরার ব্যবস্থা করতে হলো। এখান থেকে রাজধানীর দূরত্বের কথা চিন্তা করে ৪ঠা জুমাদাল আওয়ালে রবিবার হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রগামী শিবির পাঠানোর আদেশ দিই। কয়েকদিন পর কাবুল নগর ত্যাগ করে রাজপতাকা সফিদসং-এর তৃণাচ্ছাদিত ভূমির দিকে অগ্রসর হয়।

এ সময় আঙ্গুর ভাল ভাবে না পাকলেও আমি প্রায়ই কাবুলের আঙ্গুর খেয়েছি। অনেক জাতের ভাল আঙ্গুর আছে—বিশেষ করে সাহিবি ও কিস্‌মিসি জাতের। চেরি ফলও খুব সুস্বাদু। এ ফল অনেকগুলো একবারে খাওয়া যায়। একদিন আমি দেড়শটি এই ফল খেয়েছি। সা-আলু গিলাশকেই (চেরি) বোঝায়। কিন্তু গিলাশ কথাটি চালপাশাকেও (টিকটিকি) বোঝায় বলে আমার মহামান্য পিতা এই ফলের নামকরণ করেছিলেন—সা-আলু। জর্দ-আলু-পেওয়ান্‌দি (এক জাতীয় কুল) বেশ ভাল ফল এবং প্রচুর ফলে। শহর-আরা উদ্যানে একটা বিশেষ ধরনের কুলজাতীয় গাছ আছে। আমার কাকা মির্জা মহম্মদ হাকিম এই গাছটি রোপণ করেছিলেন বলে তার নাম দেওয়া হয় 'মির্জাই'। এই গাছের ফল অন্য গাছের

ফলের চেয়ে পৃথক ধরনের। পিচ ফলও খুব সুস্বাদু ও এখানে প্রচুর ফলে। ইস্‌তালিক থেকে কতকগুলি পিচ ফল আনা হয়েছিল। আমার সামনেই সেগুলো ওজন করা হলো। ওজনে ঠিক পঁচিশ তোলা হলো—যা ৬৮ মিসকালের সমান। কাবুলের ফল সুমিষ্ট হলেও তার একটাও স্বাদে-গন্ধে আমার কাছে আমের মত নয়।

মহাবান পরগণা মহবত খাঁর জায়গীর রূপে দেওয়া হয়। মুবারক খান সরওয়ানি হিসার সরকারের ফৌজদার নিযুক্ত হন। মির্জা ফরিদুন বারলাস্‌কে এলাহাবাদ সুবায় একটি জায়গীর দেওয়ার আদেশ দিই। এই মাসের ১৪ই তারিখ আসফ খাঁয়ের ভাই ইরাদত খাঁকে সুবা পাটনা ও হাজিপুরের বক্সি পদে নিযুক্ত করা হয়। তার হাত দিয়ে উপরোক্ত সুবার শাসক আমার পুত্র সদৃশ (ফারজান্দ) ইসলাম খাঁকে একটি রত্নখচিত তরবারি পাঠাই। আমাদের চলার পথে আলিমসজিদ ও গরিবখানার কাছে একটা কাঁকড়ার আকারের বড় মাকড়শা দেড় গজ লম্বা সাপের গলা জড়িয়ে ধরে তার প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলেছে দেখা গেল। ব্যাপার কি দাঁড়ায় দেখার জন্য এক মিনিট সেখানে অপেক্ষা করি। মুহূর্তের মধ্যেই সাপটা মারা যায়।

কাবুলেই শুনেছিলাম গজনির মামুদের সময় খাজা তাবুত নামে একজন লোক জুহাক ও বামি ইয়ানের কাছে কোনও এক জায়গায় মারা যায়। তাকে একটা গুহায় কবর দেওয়া হয়। তার শবদেহ নাকি এখনো পচেনি। কথাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হওয়ায় আমি একজন শল্য চিকিৎসককে সঙ্গে দিয়ে আমার একজন বিশ্বস্ত নথি-লেখককে সেই গুহায় পাঠাই। সেখানকার সত্য ব্যাপারটা কি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে এসে আমার কাছে বিশেষ বিবরণ দেওয়ার নির্দেশ দিই। সে জানায়—অর্ধেক শরীর যা মাটি ছুঁয়ে আছে তা পচে খসে পড়েছে, বাকি আধখানা দেহ যা মাটি স্পর্শ করেনি তা অবিকৃত আছে। হাতপায়ের নখ, মাথার চুল খসে পড়েনি। কিন্তু নাকের একপাশের দাড়ির চুল ও গোঁফ ঝরে গিয়েছে। গুহার দরজায় যে তারিখ খোদাই করা আছে তা দেখে বোঝা যায় সুলতান মামুদের রাজত্বের আগেই এই মৃত্যু ঘটেছে। আসল ব্যাপার যে কি তা কেউ জানে না।

১৫ই তারিখ বৃহস্পতিবার তুরাণের রাজা ওয়ালি মহম্মদ খানের অধীনস্থ মাঝারি শ্রেণীর কর্মচারী কামার দুর্গের গভর্ণর আরস্‌লান্দ আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসেন। এ পর্যন্ত শুনে এসেছি যে সারুখ মির্জার পুত্র হাসান

মির্জাকে উজবেগরা হত্যা করেছে। এই সময় একজন লোক তার নামের একটা দরখাস্ত নিয়ে আসে ও একশ টাকা মূল্যের পেঁয়াজি রংয়ের একটা চুনী আমাকে উপঢৌকন দেয়। দরখাস্তে প্রার্থনা ছিল যে তাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলে উজবেগদের হাত থেকে বাদাক্সান কেড়ে নিতে পারবে। রত্নখচিত কটিবন্ধ পাঠিয়ে তাকে জানানো হয় যে রাজ-সৈন্যরা যখন এইদিকেই এসেছে, যদি সে সত্যই মির্জা সারুখের পুত্র মির্জা হুসেন হয় তাহলে সে যেন অবিলম্বে আমার সামনে হাজির হয়। তার আবেদন ও দাবী পরীক্ষা করবার পর তাকে বাদাকসানে পাঠানো যেতে পারে। মহাসিং ও রামদাসের সঙ্গে বংগাশের বিদ্রোহ দমন জন্য যে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছে—তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দুই লক্ষ টাকা পাঠানো হলো।

২২শে বৃহস্পতিবার বালা হিসারে পৌঁছিয়ে সেখানকার অট্টালিকা পরিদর্শন করি। আমার বাসযোগ্য মনে না হওয়ায় সেগুলো ভেঙে ফেলে একটি প্রাসাদ ও দরবার কক্ষ প্রস্তুত করার জন্য আদেশ দিই। এই দিনই ইস্তালিক থেকে একটা পিচফল আনা হয়। এটা প্যাঁচার মাথার মত বড়। এরকম বড় আকারের পিচ দেখিনি। এটাকে ওজন করার আদেশ দিলাম। ওজনে হলো ৬০টি আকবরি টাকার সমান অর্থাৎ ৬০ তোলা। এটা আধাআধি কাটলে এর বীচিও দুইভাগ হয়ে গেল। ফলটির সারাংশ বেশ মিষ্টি ছিল। কাবুলে থাকার সময় এর চেয়ে ভাল কোনও ফল খাইনি।

২৫শে তারিখ মালব থেকে সংবাদ এলো যে মির্জা সারুখ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আল্লার সদয় আশ্রয়ে চলে গিয়েছেন। যেদিন তিনি আমার মহান পিতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন —সেদিন থেকে তাঁর তিরোধানের দিন পর্যন্ত এমন কোনও কাজ করেননি যাতে মনে কোনও রকম গ্লানির উদ্ভব হতে পারে। সততার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য করে গিয়েছেন। মির্জার চার পুত্র ছিল। হাসান ও হুসেন—যমজ। হুসেন বুরহানপুর থেকে পালিয়ে সমুদ্রপথে ইরাক চলে যায়। তারপর বাদাক্সানে আসে। শোনা যায় এখন সে সেখানেই আছে। এই সংবাদ সে যে লোক পাঠিয়েছিল তার সঙ্গেই লিখে পাঠিয়েছিল। কেউ নিশ্চিত ভাবে জানে না যে এই লোকটি সেই মির্জা হুসেনই কিনা কিংবা বাদাকসানের লোকেরা অন্যান্য মিথ্যা নামধারী মির্জার মত এই লোকটিকেও মির্জা হুসেন নামে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে খাড়া করেছে কিনা। মির্জা সারুখ বাদাকসান থেকে এসে আমার পিতাকে সম্মান জানানোর পর এ পর্যন্ত

পঁচিশ বছর কেটে গেছে। উজবেগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাদাকসানবাসীরা একজনের চেহারায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ দেখে এক বাদাকসান যুবককে মির্জা সারুখের পুত্র ও মির্জা স্থলেমানের বংশধর বলে চারদিকে প্রচার করে। বাদাকসানের বিক্ষিপ্ত অশ্বারোহীদল এবং পার্বত্য জাতি যারা ঘরচল নামে পরিচিত—তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা উজবেগদের সঙ্গে শত্রুতা ও বিবাদ শুরু করে উজবেগদের হাত থেকে কয়েকটি জেলা ছিনিয়ে নেয়। উজবেগরা এই নকল মির্জাকে আক্রমণ করে বন্দী করে। তার মাথাটা বর্শার উপর বসিয়ে বাদাকসানের সমস্ত জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। এরপরও বাদাকসানের বিদ্রোহীরা তাড়াতাড়ি আর একজন মির্জাকে খাড়া করে। এইভাবে এখানে অনেক মির্জাই হত হয়েছে। আমার মনে হয় যতদিন বাদাক্সানবাসীদের চিহ্ন থাকবে ততদিন তারা এইরকম গণ্ডগোল জিইয়ে রাখবে।

মির্জার তৃতীয় পুত্রের নাম—মির্জা স্থলতান। সে স্বভাবে ও চেহারায় মির্জার অন্য পুত্রদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার মহামান্য পিতার কাছ থেকে তাকে চেয়ে নিয়ে আমার নিজের কাজে নিযুক্ত করেছি। আমি তাকে আমার নিজের ছেলের মত মনে করি। স্বভাবচরিত্রে তার অন্য ভাইদের সঙ্গে মিল নেই। আমার রাজ্যাভিষেকের পর তাকে দুই হাজার পদাতিক ও এক হাজার অশ্বারোহী মনসবদারির পদ দিয়ে তাকে তার পিতার কাছে মালব স্থবায় পাঠাই। তার চতুর্থ পুত্র বদিউজ্জমান। সে এক হাজার পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহীর মনসবদারি পায়।

কাবুলে থাকার সময় বন ঘেরাও করে শিকার করিনি। হিন্দুস্থানে ফেরার সময় হওয়ায় ও লাল হরিণ শিকার করার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় আমি লোকজনকে খারাক পাহাড় ঘেরাও করার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিই। পাহাড়টা কাবুল থেকে সাত ক্রোশ দূরে। ৪ঠা জামুদাল আওয়াল মঙ্গলবার আমি সেখানে যাই। ঘেরাওয়ের মধ্যে প্রায় একশ হরিণ এসেছিল। তার মধ্যে অর্ধেক ধরা পড়ে। সেদিন খুব উত্তেজনাপূর্ণ শিকার হয়। শিকারে যেসব রায়ত উপস্থিত ছিল, তাদের পাঁচ হাজার টাকা উপহার দিই।

৬ই বৃহস্পতিবার আমি পরলোকগত সম্রাট বাবরের পাথরে খোদাই করা সিংহাসন যেখানে আছে সেখানে যাই। পরদিনই কাবুল থেকে চলে যাব। তাই এই দিনটা ভোজের দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করার জন্য এইখানেই সুরাপান উৎসবের আয়োজন এবং যে পাথর কেটে কলস তৈয়ার করা হয়েছিল তা সুরায়

পূর্ণ করতে আদেশ দিই। উপস্থিত প্রত্যেক কর্মচারী ও ভৃত্যদের স্থরা পরিবেশন করা হলো। এমন আনন্দের দিন জীবনে খুব অল্পই এসেছে।

*

* *

৭ই শুক্রবার দিনের এক প্রহর অতীত হওয়ার পর শুভ সময়ে আনন্দিত মনে নগর ত্যাগ করে সফিদসং এর জুলগায় (তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র) আসি। শহর-আরা থেকে জুলগা পর্যন্ত ফকির ও দরিদ্রদের জন্য আধুলি ও সিকি ছড়াতে ছড়াতে আসি। এই দিন কাবুল ত্যাগ করার জন্য আমি হাতির পিঠে চড়ি, সেই সময় খবর আসে যে আমির-উল-উমরা ও শা বেগ খান আরোগ্যলাভ করেছেন। এই দুইজন প্রধান কর্মচারীর নীরোগ হওয়ার সংবাদটা আমার পক্ষে শুভস্থচক মনে হলো। ১১ই মঙ্গলবার সফিদসংএর জুল্গা থেকে এক ক্রোশ এগিয়ে বিক্রমে এসে নামি। শা বেগ খান ফিরে না আসা পর্যন্ত কাবুল ও নিকটবর্তী স্থানের ভার তাস্‌বেগ খানের ওপর দিয়ে আসি।

১৮ই মঙ্গলবার বুতখাকের বিশ্রামস্থল থেকে আড়াই ক্রোশ পথ চলার পর একটা ঝরণার ধারে শিবির ফেলি। এই বিশ্রামস্থলের কথা কেউ আগে ভাবে নি। স্থতরাং জায়গাটির ভালমন্দ অবস্থা সম্বন্ধে সকলেই অজ্ঞ ছিল। সত্যই জায়গাটি খুবই মনোরম। একটি অট্টালিকা নির্মাণ করার উপযুক্ত স্থান। এই-খানে আর একটি কামারসার (ঘেরাও করে শিকার) ব্যবস্থা হয়। শিকারে ১১২টি হরিণ ইত্যাদি ধরা পড়ে। ২৪টা র‍্যাং জাতীয় ৫০টি লাল রংয়ের হরিণ ও ১৬টি পার্বত্য ভেড়া পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত আমি জীবন্ত র‍্যাং হরিণ দেখিনি। সত্যিই এই প্রাণীটির দেহের গঠন চমৎকার। অবশ্য হিন্দু-স্থানের কৃষ্ণসার হরিণের দেহসৌষ্ঠবও ভাল। কিন্তু এই হরিণটির আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। একটা ভেড়া ও একটা র‍্যাংকে ওজন করা হলো। ভেড়ার ওজন হলো এক মণ তেত্রিশ সের আর র‍্যাংয়ের দুই মণ দশ সের। এইরকম ভারি ওজনের র‍্যাং এমন জোরে দৌড়ায় যে দশ-বারোটা দ্রুতগতি কুকুরও তাকে ধরতে হাঁপিয়ে যায়। লক্ষবার চেষ্টা করে অতি কষ্টে ধরতে পারে। ভেড়ার মাংসের স্বাদ র‍্যাংএর মাংসের স্বাদের তুলনায় হীন। এই গ্রামেই কয়েকটি বুলাং (সারস পাখী) ধরা পরে।

খসরু বারবার অসৎকাজ করার জন্য সহস্রবার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য

হলেও আমার পিতৃস্নেহ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অক্ষম হয়েছে। সরকারী আইনে ও সাম্রাজ্য চালনার বিধি অনুসারে ওই রকম অন্যায় কাজের প্রতিবিধান করা উচিত। কিন্তু আমি তার দোষগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে তাকে অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে রেখেছিলাম। পরে জানা গেল যে সে দূরদৃষ্টিহীন দুষ্টবুদ্ধি শয়তানদের কাছে অনবরত লোক পাঠিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ সুবিধার আশা দিয়ে হাঙ্গামা-সৃষ্টি ও আমার জীবননাশের প্ররোচনা দিত। দূরদৃষ্টিহীন কয়েকজন হতভাগ্য একত্র হয়ে কাবুলে আমি যখন শিকার নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় আমাকে আক্রমণ করার অভিসন্ধি করে। সর্বশক্তিমান আল্লার অনুগ্রহই এই মহান বংশের অভিভাবক ও রক্ষক। তাই তাদের দুরভিসন্ধি সফল হতে পারে না।

আমার বিশ্রামশিবির যখন সুরখাব়, সেই সময় ঐ দলের একটি লোক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার পুত্র খুররামের দেওয়ান খাজা ওয়াইসির কাছে উপস্থিত হয়ে জানায় যে খসরুর প্ররোচনায় প্রায় পাঁচশ লোক হাকিম আবুল-ফতের পুত্র ফৎউল্লা, গিয়াসুদ্দিন আলি আসফ খানের পুত্র নুরুদ্দিন এবং ইৎমাদুদ্দৌলার পুত্র সেরিফের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সম্রাটের শত্রু ও অনিষ্ট-কারীদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এই কথা খাজা ওয়াইসি খুররামকে জানায়। খুররাম খুব ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ এসে আমাকে বলে। আমি খুররামকে আশীর্বাদ করলাম। অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন এই দলটিকে পাকড়াও করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু, আমার মনে হলো যে এখন আমি পথে রয়েছি। এতগুলো লোককে একসঙ্গে ধরে আনলে শিবিরে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। সুতরাং দুষ্কর্মকারীদের নেতাদের পাকড়াও করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। ফৎউল্লাকে বন্দী অবস্থায় কয়েক-জন বিশ্বাসী কর্মচারীর হেফাজতে রাখার এবং আর দুইজনকে অন্য তিন-চার-জন ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলাম।

ভূতপূর্ব সম্রাট আকবরের কর্মচারী কাসেম আলিকে আমার অভিষেকের পর 'দয়ানৎ খাঁ' পদবী দান করি। তিনি সব সময়েই ফৎউল্লাকে তার আনু-গত্যের অভাবের জন্য তিরস্কার করতেন এবং তার সম্বন্ধে নানা কথা বলতেন। একদিন তিনি ফৎউল্লাকে বলেন—"যখন খসরু পালিয়ে আসে তখন তুমি কি আমাকে বলোনি যে পাঞ্জাব খসরুকে দিলেই তো ঝগড়াটা মিটে যায়?" ফৎউল্লা সে কথা অস্বীকার করে এবং দুইজনই তাদের কথার সত্যতা প্রমাণ

করার জন্য শফথ এবং পরস্পর কটূক্তি বর্ষণ করতে থাকে। এই তর্কের দশ-পনেরো দিন যেতে না যেতেই এই মিথ্যাবাদী শয়তান ধরা পড়ে এবং তার মিথ্যা শফথের ফল হাতে হাতে পায়।

২২শে জুমাদাল আওয়াল, শনিবার হেকিম জালালুদ্দিন মুজাফফর আর-দিস্তানির মৃত্যুসংবাদ আসে। তিনি চিকিৎসাবিদ্যায়নিপুণ হেকিমিবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং গলেনএর বংশধর বলে দাবি করতেন। সে যাই হোক তাঁর মত সুচিকিৎসক আর কেউ ছিলেন না। চিকিৎসাবিদ্যা জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা মিলিত হয়েছিল। যৌবনকালে তিনি সুপুরুষ ও অতি সুঠামদেহী থাকায় শা তমাস্‌পের দরবারে যাতায়াত করতেন। রাজা তাঁর সম্বন্ধে এই পদটি রচনা করেন ঃ—

"এক সুদর্শন হেকিম গিয়েছি পেয়ে।
এস, সবাই শুয়ে পড়ি রোগী হয়ে।"

তাঁর সমসাময়িক হাকিম আলি চিকিৎসা-নৈপুণ্যে হয়তো তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেন, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, সদয় ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হয়ে তিনি একটি খাঁটি মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সে কালের অন্যান্য চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর তুলনাই চলে না। চিকিৎসা-নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর মধ্যে আরও অনেক বিশিষ্ট গুণের সমাবেশ হয়েছিল। তিনি আমার সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন। তিনি লাহোরে অতি সুন্দর এবং পবিত্র আবাস নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বারংবার আমাকে সেই বাড়ীতে একবার পদার্পণ করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে আমার ভাল লাগতো। তাঁর কথায় সম্মতি দিই।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হাকিম সর্বদা আমার সংস্পর্শে থাকায় ও আমার চিকিৎসক হওয়ায় পার্থিব জগতের অনেক কাজেই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সেইজন্য আমি কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদে আমার পারিবারিক সংস্থার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করি। তিনি নিজে অত্যন্ত সৎ ছিলেন। সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্যের কাছ থেকে জুলুম করে কাজ আদায় করতে পারতেন। এইজন্য অন্যান্য লোক তাঁর ওপর বিরক্ত হতো। কুড়ি বৎসর ধরে তিনি ফুসফুসে ক্ষতরোগে ভুগছিলেন। তা সত্ত্বেও নিজের বুদ্ধির জোরে কিছুটা স্বাস্থ্য বজায় রেখেছিলেন। কথা বলার সময় তিনি এমন ভাবে কাসতেন যে তাঁর গাল ও চোখ লাল হয়ে উঠতো এবং ক্রমে ক্রমে গায়ের রং নীল হয়ে

যেতো। আমি তাঁকে প্রায়ই বলতাম—'নিজে এমন ভাল চিকিৎসক হয়ে কেন নিজের ক্ষত আরাম করছেন না?' তিনি সবিনয়ে বলতেন—ফুসফুসে ক্ষত এমন ব্যাধি নয় যে আরাম করা যায়।

তাঁর অসুখের সময় তাঁর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তিনি যে ঔষধ প্রত্যহ খেতেন তাতে বিষ মিশিয়ে তাঁকে খেতে দিত। এই ব্যাপার লক্ষ্য করে তিনি বিষের প্রতিষেধক ঔষধ খান। অনেক সময় প্রয়োজন হলেও রক্তমোক্ষণে তাঁর আপত্তি ছিল। একদিন শৌচাগারে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত কাসির দমকে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ফুসফুসের ক্ষতের মুখ খুলে যায়। তাঁর মুখ ও নাক দিয়ে এমন ভীষণ বেগে রক্ত বের হতে থাকে যে তিনি আতঙ্কে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। একজন আফ্‌তাবচি (ভিস্তি) চীৎকার শুনতে পেয়ে দরবার কক্ষে এসে তাঁকে রক্তাপ্লুত দেখে চীৎকার করতে থাকে—'হেকিম খুন হয়েছে, হেকিম খুন হয়েছে।' পরীক্ষা করে দেখা যায় তাঁর দেহে কোন আঘাত নেই। সেই ফুসফুসের ক্ষত থেকেই রক্ত বেরিয়ে আসছে। লাহোরের শাসক কিলিজ খাঁকে খবর দেওয়া হয়। ঠিক কি ব্যাপার ঘটেছে তার সঠিক অনুসন্ধানের পর তিনি তাঁর কবরের ব্যবস্থা করেন। তিনি কোনও উপযুক্ত পুত্রসন্তান রেখে যাননি।

২৪শে তারিখ ওয়াফা উদ্যানে ও নিমলার মাঝামাঝি জায়গায় শিকারের ব্যবস্থা হয়। ৪০টি লাল হরিণ মারা পড়ে। এই শিকারে একটি চিতাবাঘিনীও মারা পড়ে। এই দিককার লাখমণি, সালি ও আফগানি জমিদাররা এসে জানায়, তারা মনেও করতে পারে না আর বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকেও শোনেনি যে এদেশে একশ কুড়ি বছরের মধ্যে কেউ চিতাবাঘ দেখেছে।

২রা জুমাদাল আখির ওয়াফা উদ্যানে বিশ্রামের স্থান ধার্য হয়। এখানে সৌর বর্ষের ওজন নেওয়ার উৎসব পালিত হয়। এইদিনই উজবেগ আরস্‌-লাল বি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আবদুল মুমিন খাঁর একজন আমীর ও সর্দার এবং কার্মাদ দুর্গের অধিনায়ক। দুর্গ থেকে তিনি আমার আশীর্বাদ লাভের জন্য এসেছিলেন। বন্ধুত্ব এবং আন্তরিকতার বশেই তিনি আমার দর্শনপ্রার্থী হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁকে একটি বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিই। তিনি একজন সরল হৃদয় উজবেগ এবং সম্মানলাভের উপযুক্ত। এই মাসের ৪ঠা তারিখ জালালাবাদের শাসক ইজ্জত খাঁর কাছে আদেশ গেল যে তিনি যেন আরজিনার শিকারক্ষেত্রে কামারঘা শিকারের

ব্যবস্থা করেন। এখানে প্রায় তিনশ জন্তুকে ধরা হলো—যেমন ৩৫টি কুচ্ (ভেড়া?), ২৫টি কুস্‌কি (?), ৯০টি আরখালি (বণ্য ভেড়া), ৫৫টি তুখলি (চমর?), ৯৫টি সফিদা (হরিণ বিশেষ)।

শিকার-ক্ষেত্রে পৌছাই দুপুরবেলা। বাতাসে আগুনের হালকা। আরবি শিকারী কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কুকুর নিয়ে শিকার করার সময় হয় সকাল না হয় বিকাল।

১২ই শনিবার বিশ্রামস্থল ছিল—আকুরা সরাই। এইখানে শা বেগ খান দলবল নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্মান জানান। ভূতপূর্ব সম্রাট আকবর যে কয়জনকে প্রতিপালন করেছিলেন—ইনি তার মধ্যে একজন। তিনি সাহসী ও উদ্যমী পুরুষ। আমার পিতার রাজত্বকালে তিনি একাই বারংবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমার রাজত্বকালেও ইরাণের শাসকের অধীন কর্মচারীরা কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করলে তিনি দুর্গরক্ষা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের সৈন্য তাঁর সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ এক বৎসর পর্যন্ত চলেছিল। সৈন্যদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল আমীর ওমরাহর মত সদয়, কড়া শাসকের মত নয়। বিশেষ করে যুদ্ধে তাঁকে যারা সাহায্য করেছে কিংবা যুদ্ধে যারা তাঁর সঙ্গী হয়েছে তাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার চমৎকার। তাঁর ভৃত্যদের সঙ্গে তিনি ঠাট্টা-তামাশা করেন। অনেক সময় তিনি নিজেই খাটো হয়ে পড়েন। এইজন্য আমি তাঁকে অনেকবার সাবধান করেছি। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিই এইরূপ। আমার ভৎর্সনায় কোনও ফল হয়নি।

১৪ই সোমবার হাসিম খাঁকে তিন হাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদে উন্নীত করে উড়িষ্যা প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করি। তিনি আমাদেরই বংশোদ্ভূত। এইদিন সংবাদ আসে যে মির্জা সারুখের পুত্র বদিউজ্জমান কয়েকজন বিদ্রোহীর সঙ্গে রাণার পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য মালব থেকে যাত্রা করেছে। সেখানকার শাসক আবদুল্লা খাঁ এই কথা জানতে পেরে তার পেছনে ধাওয়া করে তাকে বন্দী করে তার সঙ্গীদের কয়েকজনকে হত্যা করেছে। আদেশ দেওয়া হলো—ইতিমাস খাঁ আগ্রা থেকে রওনা হয়ে মির্জাকে দরবারে নিয়ে আসবে। এই মাসের ২৫শে তারিখ সংবাদ আসে যে মাওয়ারাণ নাহারের শাসক ওয়ালি খাঁকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইমাম কুলি খাঁ হত্যা করেছে। ওয়ালি খাঁ মির্জা জামাল নামেও পরিচিত এবং মির্জ্জা সারুখের পুত্র। বাস্তবিক পক্ষে মির্জা সারুখের পুত্রদের হত্যা অর্থই এক-একটি দানবহত্যা। কথায়

বলে যে দানবের প্রত্যেক রক্তকণা থেকে এক-একটি নতুন দানবের সৃষ্টি হয়।

ধাকার শিবিরে শের খাঁ আফগান আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি পেশওয়ার থেকে আসার সময় তাকে খাইবার গিরিসঙ্কট পাহারার জন্য রেখে আসি। সেই রাস্তা যথারীতি পাহারা দিয়ে সংরক্ষণ করতে সে কোনও ত্রুটি করেনি। জইন্ খাঁ কোকার পুত্র জাফর খাঁকে দালজাক আফগান ও খাতুরের উপজাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর ভার দেওয়া হয়েছিল। তারা আটকের কাছাকাছি ও বিয়াস নদীর উপকণ্ঠে নানা দুষ্কার্য শুরু করেছিল। এই সব বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। তাদের পরাজিত করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, তাদের লাহোরের দিকে পাঠিয়ে সে এই বিশ্রামশিবিরে উপস্থিত হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। যেভাবে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা পর্যালোচনা করে বোঝা গেল যে তার ওপর ন্যস্ত ভার সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে।

*

* *

রজব ও ইলাহি আবান মাস এ বছর একসঙ্গে আসায় (এই বছরের বিশেষত্ব এই যে চান্দ্র ও সৌর মাস—রজব ও আবান একসঙ্গে মিলিত হয়েছে) এবং আমার পিতার চান্দ্র ও সৌর বৎসরের ওজন নেওয়ার উৎসবের সময় একসঙ্গে পড়ায় মনস্থ করি যে—যেসব জিনিস দিয়ে তিনি সৌর ও চান্দ্র বৎসরের ওজন উৎসব (ওয়াজন্-ই-কামারি) পালন করতেন তার মূল্য ঠিক করে যে অর্থ ধার্য হবে—তা সেই মহান আত্মার কল্যাণার্থে বড় বড় শহরে দুঃস্থ ও ফকিরদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠানো হবে। জিনিসগুলির মোট মূল্য দাঁড়ালো ভারতীয় এক লক্ষ টাকা।

বিশ্বাসী কর্মচারীরা এই মুদ্রা ১২টি প্রধান প্রধান শহরে যেমন আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, গুজরাট (আমেদাবাদ) প্রভৃতি শহরে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। ৩রা রজব বৃহস্পতিবার আমার পুত্রসম (ফারজান্দ) সলাবত খাঁকে 'খান জাহান' উপাধি দিয়ে অনুগৃহীত করি। সে আমার নিজ পুত্রদের চেয়ে কম নয়। আদেশ দিই—সমস্ত ফরমান কিংবা আদেশপত্রে তার নাম উল্লেখ করতে হলে 'খান জাহান' লিখতে হবে। বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক ও রত্নখচিত তরবারিও তাকে উপহার দেওয়া হয়। শা বেগ খান্কেও 'খান দুরাণ' পদবীতে ভূষিত করে তাঁকে একটি রত্নখচিত কটিবন্ধ ছোড়া, একটি

পুং হস্তী এবং একটি বিশেষ জাতের অশ্ব উপহার দিই। তিরা, কাবুল, বংগাস ও সওয়াদ বাজুর প্রদেশের আফগানদের শায়েস্তা করার ভার দিয়ে তাঁকে জায়গীর প্রদান করে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করি।

গুজরাটের শাসক মুর্তজা খানকে (সৈয়দ ফরিদ) এক ফার্মানে জানিয়ে দিই যে মিঞা ওয়াজিহ-উদ্দিনের পুত্রের সৎ স্বভাব, উচ্চ চিন্তা এবং সংযমের কথা আমি জানতে পেরেছি। তাঁকে আমার হয়ে যেন কিছু টাকা দেওয়া হয়। তিনি ভাল ভাবে পরীক্ষা করেছেন ঈশ্বরের এমন কয়েকটি নাম যেন আমার কাছে লিখে পাঠান। যদি আল্লার দয়া আমার ওপর থাকে তা হলে ঐ নামগুলি আমি জপ করবো। জাফর খাঁকে আগেই বিদায় দিয়ে বাবা হাসান আবদালের কাছে পাঠাই যাতে তিনি শিকারের জন্য কয়েকটি পশু এক জায়গায় জড়ো করার ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি যেন একটি শাখবন্দ (সরল অর্থ—গাছের শাখা ও পশুর শিং একসঙ্গে বাঁধা) তৈয়ার করেন। সাতাশটি লাল হরিণ ও আটচল্লিশটি শ্বেত হরিণ এই শাখবন্ধে প্রবেশ করে। আমি নিজে ২৯টি হরিণ শরবিদ্ধ করি। পরভেজ ও খুরামও কয়েকটিকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে। তারপর ভৃত্য ও পারিষদদের তীর ছোঁড়ার আদেশ দিই। খান্ জাহান সব চেয়ে ভাল তীরন্দাজ। তার নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীরই হরিণের একপাশ বিদ্ধ করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়েছে।

রজব মাসের ১৪ই তারিখ জাফর খাঁ আবার রাওয়ালপিণ্ডিতে কামারঘা শিকারের আয়োজন করে। অনেক দূর থেকে তীর ছুঁড়ে একটা লাল হরিণ বিদ্ধ করি। তীরের আঘাতে হরিণটিকে ধরাশায়ী হতে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। চৌত্রিশটি লাল হরিণ ও পঁইত্রিশটি কারা-কুইরুগ (কালো রংয়ের লেজওয়ালা) হরিণ, যাকে হিন্দুস্থানীরা বলে 'চিকারা' ও দুইটি শূকরও শিকার করা হয়। হিলাল খাঁয়ের চেষ্টায় রোটাস্ দুর্গের তিন মাইলের মধ্যে ২১শে তারিখ আর একটা কামারঘা শিকারের ব্যবস্থা হয়। এই শিকারে পর্দানশীন জেনানাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাই। শিকারটি খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল। দুশো লাল ও সাদা হরিণ মারা পড়ে। রোটাসের কাছাকাছি পাহাড়ী জায়গায় এইসব হরিণের আস্তানা। এই জায়গা এবং গিরঝাক ও নন্দনা ছাড়া হিন্দুস্থানের কোনও জায়গায় এই জাতের লাল হরিণ দেখা যায় না। কয়েকটি হরিণ জীবন্ত ধরার জন্য আদেশ দিই যাতে সেগুলোকে বংশবৃদ্ধির জন্য হিন্দুস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়।

২৫শে তারিখ রোটাসের কাছাকাছি একটা জায়গায় শিকারের ব্যবস্থা হয়। এই শিকারের সময় আমার ভগ্নীরা ও আরও কয়েকজন মহিলা আমার সঙ্গে ছিলেন। এখানে প্রায় একশটি লাল হরিণ মারা পড়ে। শুনলাম জালাল খাঁ গর্‌খরের কাকা সাম্‌স খাঁ অতি বৃদ্ধ হলেও এখনও শিকারে এমন আনন্দ পান যে একজন যুবকও পায় না। তাঁর বাড়ী নিকটেই। তিনি ফকির ও দরবেশদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এ কথা জানতে পেরে তাঁর বাড়ীতে যাই। তাঁর স্বভাব ও ব্যবহারে খুবই প্রীত হই। আমি তাঁকে দুই হাজার টাকা এবং তাঁর পত্নীদের ও সন্তানদের সমপরিমাণ অর্থ দান করি। অর্থ ছাড়াও পাঁচটি গ্রাম তাঁদের ভরণপোষণের জন্য দিই যাতে তাঁদের জীবন আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কেটে যায়।

৬ই সাবান চান্দালার বিশ্রামশিবিরে আমির উল উমরা আমার সঙ্গে দেখা করে সম্মান জানান। তাঁর সঙ্গলাভ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই কারণ হিন্দু, মুসলমান সকল চিকিৎসকেরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে তিনি বাঁচবেন না। সর্বশক্তিমান আল্লার করুণায় তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর আরোগ্যলাভ অবিশ্বাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কঠিন পীড়া যা পার্থিব জগতের চিকিৎসকদের কাছে দুরারোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাও সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় অনায়াসেই আরাম হতে পারে।

এইদিন রায়রায় সিং আমির-উল্‌-উমরার সুপারিশে আমার সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্যের অধিকারী হন। তিনি রাজপুত আমিরদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। খসরুর ব্যাপারে আমার প্রতি অন্যায় করায় তিনি লজ্জিত ছিলেন এবং নিজের দেশেই বাস করছিলেন। তাঁর সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করি। খসরুকে অনুসরণ করার জন্য আগ্রা ছেড়ে চলে আসার সময় আমি তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাসে আগ্রার ভার তাঁর ওপর অর্পণ করি এবং তাকে অনুরোধ করি যে যখন আমি হারেমবাসিনীদের আমার কাছে পাঠাতে বলবো তখন তিনি যেন তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। (বিকানীরের রায়রায় সিং-এর একটি কন্যাকে জাহাঙ্গীর বিবাহ করেন)। মহিলাদের পাঠানোর জন্য জানানো হলে তিনি তাঁদের সঙ্গে কিছুটা পথ আসেন। কিন্তু মথুরায় পৌঁছিয়ে কতকগুলি মিথ্যা গুজব শুনে তিনি মহিলাদের ফেলে রেখে বিকানীর চলে যান। তিনি মনে করেছিলেন একটা বিক্ষোভ যখন চলছে তখন শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় সেটা দেখে যাওয়া ভাল।

করুণাময় আল্লা সব সময়ই তাঁর ভৃত্যদের মঙ্গল করে থাকেন। তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহীদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর নেমকহারামির ফাঁসও তাঁর গলায় আটকে রইলো। আমীর-উল-উমরাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আদেশ দিই যে তিনি যে পদে পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই পদেই পুনর্বহাল হবেন এবং তাঁর জায়গীরও আগের মতই ভোগ করতে থাকবেন।

আমি সম্রাটপুত্র থাকার সময় থেকেই সুলেমান বেগ আমার একজন কর্মচারী ছিলেন। তাঁকে আমি 'ফিদাই খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করি। ১২ই তারিখ সোমবার রাবি নদীর তীরে 'দিল-আমিজ' উদ্যানে পৌঁছাই। এখানে আমার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা জানাই। মির্জা গাজি কান্দাহারে সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়করূপে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে অনুগ্রহ দেখাই।

*

* *

১৩ই তারিখ মঙ্গলবার আমি শুভমুহূর্তে লাহোরে প্রবেশ করি। পরদিন গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ মীর মিরানের পুত্র মীর খলিল উল্লা আমাকে সম্মান জানাতে আসেন। মীর মিরান ছিলেন শা নিমাতুল্লার বংশধর। শা তামাস্পের রাজত্বকালে সমস্ত দেশে মীর মিরানের মত মহৎ পরিবার আর ছিল না। কারণ, জানিস বেগম নামে সা'এর ভগ্নীকে মির মিরানের পিতা মীর নিমাতুল্লা বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তার সঙ্গে শা তাঁর নিজপুত্র ইসমাইল মির্জার বিবাহ দেন এবং মীর মিরানের পুত্রদের জামাতারূপে বরণ করেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে মীর মিরানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের—যার নামও ছিল তার ঠাকুরদার নাম—বিবাহ দেন। সার ভ্রাতুষ্পুত্রীর গর্ভে ইসমাইল মির্জার যে কন্যা জন্মে তার সঙ্গে মির মিরানের আর এক পুত্র মির খলিলউল্লার বিবাহ দেন। শায়ের মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে এই পরিবার ধ্বংসের মুখে এসে পড়ে। শা আব্বাসের রাজত্বকালে তাদের যা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল তাও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে তাদের নিজ বাসভূমি ত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। মীর খলিলউল্লা আমার সঙ্গে দেখা করলেন। পথে তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তাছাড়া তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় তাঁর এই অবস্থার মধ্যেও ফুটে উঠতে দেখে

আমার স্বভাবসুলভ অনুগ্রহ বিতরণের স্পৃহা জেগে ওঠে। আমি তাঁকে নগদ বারো হাজার টাকা এবং এক হাজার পদাতিক ও দুই শত অশ্বারোহীর মনসবদারি প্রদান করি। এছাড়া একটি জায়গীর তাঁকে দেওয়ার আদেশ দিই।

আমার দেওয়ানি দপ্তরে আদেশ যায় যে আমার পুত্র খুররামকে আট হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারিপদে বরণ করা হলো। উজ্জয়িনীর কাছাকাছি হিসার ফিরুজা সরকার তাঁর জায়গীর রূপে নির্দিষ্ট হলো।

মুর্তাজা খাঁ গুজরাট থেকে আমার জন্য একটি অঙ্গুরী উপহার পাঠান। অঙ্গুরীটিতে একটিমাত্র অপূর্ব দ্যুতিময় চুনী বসানো। অঙ্গুরীয়টির সের, মণি বসানোর গর্ত এবং মণি সবই একটি একটি। গোটা অঙ্গুরীয়টির ওজন দেড় টাং এক সারখ্ যা এক মিশকাল পনেরো সারুখের সমান। আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি যে এমন একটি অঙ্গুরী কোনও সম্রাটের হাতে এসেছে। ওজনে দুই টাং পনেরো সারুখের সমান একটি ছয়কোণবিশিষ্ট চুনীও তিনি পাঠিয়েছিলেন —যার দাম পঁচাত্তর হাজার টাকা। অঙ্গুরীয়টির দামও ঐ রকম।

সেইদিনই মক্কার সেরিফের দূত চিঠি ও কাবার দরজার একটি পরদা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি আমার প্রতি বিশেষ সখ্যের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন। ঐ দূতটি পাঁচ লক্ষ 'দামে'র—যা সাত-আট হাজার টাকার সমান— জিনিসপত্র উপহার নিয়ে আসেন। সেরিফকে এক লাখ টাকা মূল্যের হিন্দুস্থানের মূল্যবান জিনিস উপহার পাঠাব বলে মনস্থ করি।

এই মাসের ১০ই তারিখ মির্জা গাজির গোটা নাটা প্রদেশের জায়গীরের সঙ্গে সুবা মুলতানের একটা অংশ জুড়ে দেওয়া হয়। তাঁকে পাঁচ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মনসবদার পদেও উন্নীত করা হয়। হিন্দুস্থানের সীমান্ত কান্দাহারে সরকার ও ঐদিকের স্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে দেওয়া হয়। তাঁকে সম্মানসূচক পোশাক ও রত্নখচিত তরবারি উপহার দিয়ে বিদায় দিই। মোট কথা মির্জা গাজি হচ্ছেন একজন সর্ববিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভাল কবিতাও লিখতে পারতেন। এই কবিতা তাঁরই রচনা।

"হে ললনে,
আমার চোখের জলে,
যদি তোমার অধরে ফোটে হাসি,
বিস্ময়ের কিছু তাতে নাই

মেঘ যদি করে বরিষণ,
গোলাপ কুঁড়ির গণ্ডে
আনন্দের হাসি ফোটে নাকি ?"

১৫ই তারিখ খানখানানের উপঢৌকন আমাকে দেওয়া হলো। চল্লিশটি রত্নখচিত ও চিত্রিত বাসনপত্র। কিছু পারস্যদেশীয় পরিচ্ছদ, দাক্ষিণাত্যে তৈরি বস্ত্র। এসবের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। মির্জা রুস্তম এবং ঐ সুবার আরও অনেক কর্মচারীও ভাল ভাল উপঢৌকন পাঠান।

এ মাসের ১৮ই তারিখ রায়দুর্গার মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে পৌঁছায়। তিনি আমার পিতার কাছেই মানুষ হয়েছিলেন। চল্লিশ বছরের বেশী সময় আমার মহামান্য পিতার কাছে আমীরি পদে দিলেন এবং ক্রমে তিনি চার হাজারি মনসবদারী পদ লাভ করেন। আমার পিতার কাছে আসার সৌভাগ্য অর্জন করার পূর্বে তিনি রাণা উদয়সিংহের অধীনে কাজ করতেন।

দুর্দান্ত ও হিংস্রস্বভাব সুলতান শা আফগান বেশীর ভাগ সময়ই খসরুর কাছে কাটিয়েছে এবং তার অন্তরঙ্গতাও লাভ করেছিল। বস্তুতঃ এই বিদ্রোহী শয়তানের প্ররোচনাতেই সেই হতভাগ্য বিপথে যায়। খসরুর পরাজয় ও বন্দী হওয়ার পর সে একা খিজরাবাদের পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। অবশেষে সেখানকার করোরি (তহশীলদার) মীর মোগল তাকে বন্দী করে। সে আমার পুত্রের সর্বনাশ সাধন করার হেতু হওয়ায় তাকে আমি লাহোরের ময়দানে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ দিই। উপরোক্ত করোরিকে উচ্চপদে উন্নীত করি এবং সম্মানসূচক পোশাক দিয়ে সম্মানিত করি।

*

* *

২৯শে তারিখ আমার পুরাতন ভৃত্য শের খাঁ আফগান মারা যায়। এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে সে নিজের প্রাণ নিজেই নিয়েছে। কারণ, সে অনবরত সুরাপান করতো। প্রতি প্রহরে চার-চারটে পেয়ালাভর্তি দ্বিগুণ উত্তেজক আরক খেতো। গেল বছর রমজানের রোজা ভাঙ্গার পর তার মাথায় এলো যে সাবান মাস থেকে সে 'রোজা' শুরু করবে এবং দুই মাস একসঙ্গে উপবাস চালাবে। তার স্বভাবগত রীতি ত্যাগ করার ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাতান্ন বছর বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করে। অবস্থানুযায়ী তার সন্তানদের ও ভাইদের তার পদ ও অন্যান্য কর্ম প্রদান করি।

সাওয়ান মাসের ১লা তারিখ আমি শেখ মামুদ কামানগরের শিষ্য মৌলানা মহম্মদ আমিনের সঙ্গে দেখা করতে যাই। শেখ মামুদ সেকালে একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি করতেন। এমন কি তিনি নিজে একবার তাঁর হাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত মৌলানাও অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতির লোক। পার্থিব জগতের নানা বন্ধনের মধ্যে থেকেও তিনি মুক্তপুরুষ, স্বভাবে ও ব্যবহারে একজন ফকির এবং জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে সম্যক পরিচিত। তাঁর সাহচর্যে আমি মুগ্ধ হলাম। আমার মনে যেসব দুঃখ ঘিরে ধরেছে—তার কিছু কিছু তাঁর কাছে প্রকাশ করলাম। তাঁর উপদেশ ও সুমধুর বাক্য শোনার পর মনে হলো যেন আমার অন্তরের জ্বালা উপশম হলো। আমি মনে শান্তি পেলাম। তাঁর ভরণপোষণের জন্য এক হাজার বিঘা জমি ও নগদ এক হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই।

রবিবার এক প্রহর বেলার পর লাহোর ত্যাগ করে রাজধানী আগ্রার পথে যাত্রা করি। কিলিজ খাঁকে শাসনকর্তা, মীর কোয়ামুদ্দিনকে দেওয়ান, শেখ ইউসুফকে বক্সি এবং জামালউদ্দিনকে কোতোয়ালের পদে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রত্যেককে অবস্থানুযায়ী সম্মানজনক পোশাক উপহার দিয়ে আমার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হই। ২৫শে তারিখ সুলতানপুরে নদী পার হয়ে দুই ক্রোশ এগিয়ে নাকোদরে পৌছাই। আমার মহামান্য পিতা শেখ আবুল ফজলকে কুড়ি হাজার টাকা ওজনের সোনা দিয়েছিলেন দুই পরগণার মধ্যে একটা বাঁধ এবং একটি হ্রদ নির্মাণের জন্য। এই বিশ্রামের জায়গাটি সত্যিই আমার বেশ ভাল লাগলো। নাকোদরের জায়গীরদার মুইজ্জুল মুলক্কে বাঁধের একপাশে একটি উদ্যান রচনা করতে আদেশ দিলাম যাতে পথচারীরা এই জায়গার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়।

১০ই জিল্কদ ওয়াজির-উল-মুল্ক—যিনি আমার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে আমার কাজে নিযুক্ত থাকার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন এবং আমার ব্যক্তিগত সংস্থার দেওয়ান ছিলেন—পেটের অসুখে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর গৃহে এক দুর্ভাগা শিশুর জন্ম হয় যার জন্মের চল্লিশ দিনের মধ্যে তার বাপ মা দুইজনকেই শেষ করে এবং শিশুটি নিজেও দুই-তিন বছর বয়সেই মারা যায়। আমি মনে স্থির করি যে ওয়াজির-উল্-মুল্কের পরিবার যাতে ধ্বংস না হয় সে জন্য তার ভাইপো মনসুরকে সাহায্য করার জন্য তাকে একটি কাজে বহাল

করবো। অবশ্য তার দিক থেকে আমি কোনও আন্তরিকতার প্রমাণ পাইনি।

১৪ই তারিখ সোমবার পথচলার সময় শুনতে পাই পাণিপথে ওকারনালের মধ্যের জায়গায় দুইটি বাঘ পথচারীদের বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। কয়েকটি হাতি সেইদিকে পাঠিয়ে দিই। বাঘ দুটির উৎপাতের জায়গায় উপস্থিত হয়ে আমি একটি স্ত্রী-হস্তীতে আরোহণ করি এবং অন্য হস্তীগুলি দিয়ে কামারঘার পদ্ধতিতে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে আদেশ দিই। আল্লার দয়ায় একটি বন্দুক দিয়ে আমি দুটি বাঘকেই শিকার করি। পথটা এই হিংস্র জন্তুর কবল থেকে মুক্ত করে আল্লার ভৃত্যদের নিরাপদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হই। বৃহস্পতিবার দিল্লীতে পৌঁছাই। সেলিম খাঁ আফগানি তাঁর রাজত্বকালে যমুনা নদীর মধ্যস্থলে সেলিমগড় নামে যে আবাস নির্মাণ করেছিলেন সেইখানে উঠি। আমার মহামান্য পিতা এই বাড়ী দিল্লীর আদি অধিবাসী মুর্তজা খাঁকে দিয়েছিলেন। ঐ খাঁ নদীর কিনারে অতীব মনোহর পাথরের অলিন্দ নির্মাণ করেছিলেন। সেই গৃহের নীচে জলের কাছে একটি চৌখণ্ডি রং করা টালি দিয়ে সম্রাট হুমায়ুনের আদেশে তৈরি করা হয়। এমন খোলামেলা সুন্দর জায়গা কদাচিৎ দেখা যায়। সেকালে সম্রাট হুমায়ুন দিল্লীতে শুভাগমন করলে এই জায়গাতেই তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে উপবেশন করতেন এবং তাঁর দরবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। এই জায়গায় আমি চারদিন অবস্থান করি ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দরবারের কর্মচারীদের সঙ্গে সুরাপান উৎসব পালন করি। দিল্লীর শাসক মুয়াজ্জম খাঁ আমাকে উপঢৌকন দেন। দিল্লীর অধিবাসীরাও আমাকে উপহার দেয়।

পালাম পরগণায় কয়েকদিন 'কামারঘা' শিকারের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। দিল্লী নগরের কাছাকাছি পালাম একটি বিশিষ্ট শিকারের জায়গা। আমাকে জানানো হয় যে আগ্রায় প্রবেশের শুভলগ্নের আর দেরি নেই। সেদিন পেরিয়ে গেলে আর একটি শুভ সময়ের জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমি তখন শিকারের সঙ্কল্প ত্যাগ করে নৌকায় উঠে জলপথে আগ্রার দিকে যাত্রা করি। জিল্কদ মাসের ২০শে তারিখ মির্জা সারুখের চারটি পুত্র ও তিনটি কন্যা আমার কাছে আনা হয়। এই পুত্রকন্যাদের কথা আমার পিতাকে তিনি কখনও বলেননি। আমি ছেলেদের আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের এবং মেয়েদের হারেমের বেগমদের পরিচারিকাদের হাতে অর্পণ করি যাতে তারা এদের যত্ন নিতে পারে।

২১শে তারিখে রাজা মানসিংহ পাটনা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। দেখা করার জন্য তাঁকে ছয়-সাতবার আদেশ পাঠানো হয়েছিল। তিনি খান আজমের মতই ভণ্ড এবং রাজ্যের বুড়ো নেকড়ে। তাঁরা আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছেন এবং আমার কাছে থেকেই বা তাঁরা কেমন ব্যবহার পেয়েছেন তা একমাত্র আল্লাই জানেন যাঁর কাছে কিছুই গোপন নেই। এরকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর একটিও পাওয়া যাবে না। ঐ রাজা একশতটি মাদী ও মদ্দা হাতি উপঢৌকনের জন্য উপস্থিত করেন। একটিও এমন ছিল না যে আমার ব্যক্তিগত হাতিগুলির মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। আমার পিতার তিনি অনুগ্রহভাজন ছিলেন সেজন্য তাঁর মুখের ওপর আর তাঁর অপরাধের কাহিনীগুলি ব্যক্ত করিনি, বরং অনুগ্রহ দেখিয়ে তাঁর পদোন্নতির ব্যবস্থা করি।

এইদিন একটি কথা বলা ভরত পাখী আমার কাছে আনা হয়। পাখীটি স্পষ্ট উচ্চারণ করলো 'মিঞা তুতি'। সত্যই পাখীটি অদ্ভুত ও সুন্দর। তুর্কি ভাষায় এই পাখীটির নাম তুরঘাই।

আমার রাজ্যাভিষেকের পর তৃতীয় নববর্ষ

২রা জিলহিজ্জা বৃহস্পতিবার, ১লা ফারওয়ারদিন (১৯শে মার্চ, ১৬০৮) বিশ্বে উজ্জ্বল আলোক ও উত্তাপবর্ষী রবি মীনরাশি থেকে তাঁর আনন্দময় গৃহ মেষরাশিতে এলেন। তাঁর এই শুভ পদার্পণ পৃথিবীকে দিল নতুন ঔজ্জ্বল্য। শীতঋতুর নৃশংস আচরণে ও হেমন্তঋতুর অত্যাচারে পীড়িত জগৎ বসন্তঋতুর আগমনে নববর্ষকে পরিয়ে দিল সবুজ পান্নার পোশাক। পৃথিবী ফিরে পেল তার স্বাস্থ্য, পেল ক্ষতিপূরণ।

"শূন্যের কাছে পুনরায় এলো
জগৎপতির আদেশ—
'দাও, ফিরিয়ে দাও,—
করেছ যা গ্রাস।' "

নওরোজের ভোজ আগ্রা থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে রণকাত্তা গ্রামে সম্পন্ন হয়। রবি যখন মেষরাশিতে আসেন, আমি সানন্দে ও সগৌরবে সিংহাসনে বসি। আমীর, মন্ত্রী ও সমস্ত কর্মচারী সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে আসেন। এই দরবারেই খানজাহানকে পাঁচ হাজারি মনসবদারির পদ প্রদান করি। খাজা জাহানকে বকসির পদে নির্বাচিত করি। বঙ্গদেশের উজিরি পদ থেকে ওয়াজির খাঁকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় আবুল হোসেন সিহাবখানিকে পাঠাই। নুরুদ্দিন কুলিকে আগ্রার কোতোয়াল নিযুক্ত করি। পরলোকগত সম্রাট আকবরের মহান সমাধিক্ষেত্র রাস্তার উপরই পড়বে। ভাবলাম এই সময় যদি সেই তীর্থদর্শনের সৌভাগ্যলাভ করতে যাই তাহলে অল্পবুদ্ধি লোকরা এই কথাই ভাববে যে আমার চলতি পথে পড়েছে বলেই এই কাজটি দায়সারা ভাবে করে গেলাম। সেইজন্য আমি মনস্থ করি যে আমি আগ্রায় প্রবেশ করবো এবং তারপর পদব্রজে আড়াই ক্রোশ দূরে এই তীর্থে আগমন করবো যেমন করে হজরত (আমার পিতা) আমার জন্মের পর আগ্রা থেকে আজমীঢ় গিয়েছিলেন।

শনিবার, দিনের দুই প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর দুই হাতে ছোট ছোট মুদ্রায় পাঁচ হাজার টাকা ছড়াতে ছড়াতে শুভক্ষণে আগ্রার দিকে এগিয়ে এলাম এবং আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে আমার বিশাল প্রাসাদে প্রবেশ করলাম।

এইদিন রাজা বীরসিং দেও আমাকে একটি শ্বেতবর্ণের চিতা দেখাতে আনেন। যদিও নানারকমের পশুপক্ষীর মধ্যে, সাদা রংয়ের জাতও দেখা যায়, কিন্তু আমি এর পূর্বে আর কখনও সাদা রংয়ের চিতাবাঘ দেখিনি। চিতার গায়ের দাগ সাধারণতঃ হয় কালো রংয়ের কিন্তু এর গায়ের দাগ ছিল নীল রংয়ের এবং গায়ের রং ছিল নীলাভ শ্বেত। শ্বেতবর্ণের পশুপক্ষীর মধ্যে দেখেছি—বাজ, দাঁড়কাক, শিকারা যাকে পারস্য দেশে বলে বিস্থ, কাক, চড়ুই, তিতির, কোয়েল ও ময়ূর। পক্ষীশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ বাজপাখীই শ্বেতবর্ণের। আমি শ্বেতবর্ণের উড়ন্ত ইঁদুর (কাঠবেড়ালি) দেখেছি। শ্বেতবর্ণের হরিণও দেখেছি যা কেবলমাত্র হিন্দুস্থানেই দেখা যায়। চিকারা (ছোট জাতের হরিণ) যাকে পারস্য দেশে বলে সফিদা, সাদা জাতেরও আমার চোখে পড়েছে।

এই সময় রাজপুত আমীরদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ভোজহারার পুত্র রতন আমার সঙ্গে দেখা করেন। উপহার স্বরূপ তিনটি হাতি আমাকে দেওয়ার জন্য তিনি আনেন। একটি হাতি খুব পছন্দ হলো। আমার কর্মচারীরা এর দাম ঠিক করলো—পনেরো হাজার টাকা। হাতিটিকে আমার নিজস্ব হাতিগুলির মধ্যে স্থান দিই। নাম দিই—'রতন গজ'। ভারতবর্ষের পূর্বতন বড় বড় রাজাদের হাতির মূল্য পঁচিশ হাজারের বেশী ছিল না। কিন্তু আজকাল হাতীর দাম অনেক বেড়েছে। রতনকে 'সরবুলন্দ রায়' উপাধিতে ভূষিত করি।

২৫শে তারিখ আমার পুত্র খুররামের মাতুল রাজা সূরজ সিং আমাকে সম্মান জানাতে আসেন। তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন দুর্দান্ত উমরার জ্ঞাতিভাই শাহমকে। বাস্তবিকপক্ষে হাতিদের কি করে শিক্ষা দিতে হয় সে সম্বন্ধে তার কিছুটা নিপুণতা আছে। রাজা সূরজ সিং তাঁর সঙ্গে একজন কবিকেও নিয়ে আসেন। তিনি হিন্দীভাষায় কবিতা লিখে থাকেন। তিনি আমার প্রশংসা করে যে কবিতাটি আমাকে দিয়েছিলেন তার সারাংশ এই: "সূর্যের যদি একটি পুত্র থাকতো তাহলে চব্বিশ ঘণ্টা দিনের আলো থাকতো, রাত আর হতো না। কারণ পিতা অস্ত গেলে তাঁর পুত্র তাঁর আসনে বসে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করে রাখতো। ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে তিনি তোমার পিতাকে এমন একটি পুত্র দান করেছেন যে তাঁর মৃত্যুতেও এই পৃথিবীকে রাতের মত শোকার্ত হতে হয়নি। এই কারণে সূর্যেরও হিংসা হয়েছে। সূর্য বলছেন—'যদি আমার একটি পুত্র থাকতো তাহলে সে আমার স্থান অধিকার করে পৃথিবীতে

রাতের অন্ধকার নামতে দিত না। তোমার ন্যায়বিচারের রোশনাই তোমার পিতার মৃত্যুর মত এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও, তোমার চারদিক এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে কেউ বলতে পারে না যে পুনরায় রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে পারে।' " এমন স্বচ্ছ ভাবময় হিন্দি কবিতা আমি খুব কম শুনেছি। এই কবিতাটির জন্য কবিকে একটি হাতি উপহার দিই। রাজপুতেরা কবিকে চারণ বলে।

*

* *

১০১৭ হিজরা সনের, ৮ই মহরম বৃহস্পতিবার (২৪শে এপ্রিল, ১৬০৮) চারশ পদাতিকের অধিনায়ক জালালুদ্দিন মামুদ পেটের অসুখে পঞ্চাশ কি ষাট বছর বয়সে মারা যান। তিনি সাহসী ছিলেন। অনেক যুদ্ধে ভাল কাজ দেখিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পাকা আফিংখোর। সব চেয়ে বিসদৃশ ব্যাপার—তিনি প্রায়ই নিজের মায়ের হাত থেকে আফিং নিয়ে খেতেন। যখন তাঁর অসুখ বৃদ্ধি পায় ও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে তখন তাঁর মাও তাঁর পুত্রকে যে আফিং খাওয়াতেন তার থেকে অনেকটা তিনি নিজে খেতে লাগলেন যার ফলে তিনিও পুত্রের মৃত্যুর দুইতিন ঘণ্টা পর মারা যান। আমি কখনও কোনও জননীর সন্তানের প্রতি এমন ভালবাসার কথা শুনিনি। হিন্দুদের মধ্যে রীতি আছে যে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীরা আগুনে দগ্ধ হয়ে মরে—তা স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্যই হোক, অথবা তাদের পিতার সম্মান রক্ষার জন্যই হোক, বা তাদের জামাতাদের কাছ থেকে লজ্জা দূর করার জন্যই হোক। কিন্তু মায়ের পক্ষ থেকে এমন ঘটনার কথা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে শোনা যায়নি।

এই মাসের ১৫ই তারিখ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্ব বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ রাজা মানসিংহকে উপহার দিই। শা আব্বাস আর কয়েকটি অশ্বের সঙ্গে এই অশ্বটি এবং নানা মূল্যবান উপহার দ্রব্য মিনুচির নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের সঙ্গে সম্রাট আকবরকে পাঠিয়েছিলেন। এই অশ্বটি উপহার পেয়ে রাজা এমন খুশী হলেন যে আমি যেন তাঁকে একটি রাজ্যই দান করেছি। আমি আগে কল্পনাও করিনি যে তিনি এমন আনন্দিত হবেন। যখন অশ্বটি এখানে আসে তখন বয়স ছিল তিন-চার বছর। হিন্দুস্থানেই বড় হয়ে ওঠে। দরবারের সমস্ত কর্মচারী—মোগল এবং রাজপুত—একবাক্যে

স্বীকার করেন যে এমন অশ্ব ইরাক থেকে হিন্দুস্থানে কখনও আসেনি। যখন মহামান্য পিতা খান্দেশ প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্য সুবার ভার আমার ভাই দানিয়ালের ওপর অর্পণ করে আগ্রায় ফিরে আসছিলেন সেই সময় তিনি স্নেহবশে দানিয়ালকে বলেছিলেন যে তার যা ইচ্ছা তাঁর কাছে চাইতে পারে। সুবিধা পেয়ে সে এই ঘোড়াটি চায় এবং তিনিও তাকে দেন।

২০শে মঙ্গলবার ইসলাম খাঁর কাছ থেকে বাংলার সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর মৃত্যু সংবাদ আসে। তিনি পূর্বে আমার একজন বিশিষ্ট ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর বিশেষ গুণ ও কর্মনৈপুণ্যের জন্য তাঁর নাম বিশিষ্ট আমীরদের তালিকাভুক্ত করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে আমি খুবই দুঃখিত হই। বঙ্গদেশের শাসনভার এবং রাজপুত্র জাহান্দারের শিক্ষার ভার আমার পুত্রপ্রতিম ফারআন্দ ইসলাম খাঁর উপর এবং তার জায়গায় বেহার সুবার শাসনভার আফজল খাঁর (আবুল ফজলের পুত্র) উপর অর্পণ করি। হাকিম আলির পুত্রকে কতকগুলি কাজের জন্য বুরহানপুর পাঠিয়ে ছিলাম। সে কর্ণাটের কয়েকজন ভোজবাজিওয়ালা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। এদের তুল্য বাজিকর কদাচিৎ দেখা যায়। তাদের একজন দশটি বল নিয়ে খেলা দেখালো—তার প্রত্যেকটি কমলালেবুর মত, কোনটি ঠিক লেবুর আকারের, কোনটি তার চেয়ে ছোট। ছোট ও বড় আকারের বলগুলি নিয়ে সে এমন নিপুণতার সঙ্গে খেলা দেখাতে লাগলো যে একটিও হাত থেকে ফসকে পড়লো না। এই খেলা দেখে সকলেই তাজ্জব বনে গেলাম।

এই সময় সিংহল থেকে একজন দরবেশ এলো—একটি অদ্ভুত প্রাণী সঙ্গে নিয়ে। জন্তুটির নাম 'দেওনক'। এর মুখ দেখতে ঠিক একটা বড় বাদুড়ের মত। তা ছাড়া দেহের অন্য অংশ ঠিক বানরের মত কিন্তু লেজ নেই। এর চলন কালো রংয়ের লাঙ্গুলহীন বানরের মত যাকে হিন্দুস্থানীরা বলে বনমানুষ। এর দেহ দুই-তিন মাসের শিশু বানরের মত এটি দরবেশের কাছে পাঁচ বছর আছে। জন্তুটি আর কখনও বাড়বে না। এর খাদ্য দুধ। কলাও খায়। জন্তুটি অদ্ভুত বলে আমি চিত্রকরদের আদেশ দিই যে তারা যেন এর নানা ভঙ্গীর ছবি আঁকে। প্রাণীটি দেখতে কদাকার।

ক্যাম্বে বন্দর থেকে মকরব খাঁ ইউরোপের চিত্রিত পর্দা পাঠিয়েছিল। ইউরোপের চিত্রকরদের এমন সুন্দর জিনিস আর কোনও দিন দেখা যায় নি। এই দিনই আমার মাসী নাজিরউন্নিসা বেগম একষট্টি বছর বয়সে যক্ষারোগে মারা

যান। তাঁর পুত্র মিরজা ওয়ালিকে এক হাজার পদাতিক ও দুইশত অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদে উন্নীত করি। আকম হাজি নামে একজন মাওয়ারান নাহার-বাসী অনেকদিন তুরস্কে ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মজ্ঞান মন্দ ছিল না। তিনি তুরস্কের দূত হিসাবে এসেছেন এই পরিচয় দিয়ে আগ্রায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সঙ্গে একখানি চিঠি আনেন কিন্তু তা যে কার লেখা বোঝবার উপায় ছিল না। তাঁর হাবভাব এবং অবস্থা দেখে আমার দরবারের কোনও কর্মচারীই তাঁকে দূত বলে বিশ্বাস করেনি। যখন তাইমুর তুরস্ক জয় করেন এবং তুরস্কাধিপতি ইলদিরিস্ বেজিদ জীবন্ত তাঁর হাতে ধরা পড়েন, তখন তিনি উপঢৌকন ও এক বছরের রাজস্ব গ্রহণ করে সমস্ত তুরস্ক রাজ্য রাজার হাতে প্রত্যর্পণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই সময়েই ইল্দিরিস্ বেজিদ মারা যান। তাইমুর তুরস্ক রাজ্য তাঁর পুত্র মুসা চেলেবির হাতে প্রত্যর্পণ করে ফিরে আসেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত এইরকম অনুগ্রহ দেখানো সত্ত্বেও তুরস্কের রাজাদের পক্ষ থেকে কেউ এখানে আসেনি। কোনও দূতও পাঠায়নি। সুতরাং কি করে এ কথা বিশ্বাস করা যায় যে মাওয়ানান নাহারের একজন অধিবাসীকে দূত নিযুক্ত করে পারস্যের সম্রাট এখানে পাঠাতে পারেন। আমি এই ব্যাপারটি ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি। আর কেউই তাঁর দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে পারেনি। সুতরাং তাঁকে বলেছিলাম যে তিনি যেখানে খুশী যেতে পারেন, এখানে তাঁর স্থান হবে না।

রাজা মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎসিংয়ের কন্যাকে বিবাহ করবো দাবী করে ১৬ই মহরম বিবাহের উপহার স্বরূপ আশি হাজার টাকা রাজার গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়েছিলাম। ৪ঠা রবিয়ল আওয়াল জগৎসিংয়ের কন্যা আমার হারেমে আসেন। মরিয়ম জমানি বেগমের আবাসে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হয়। তাঁর সঙ্গে যে সব যৌতুক রাজা মানসিংহ পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে ষাটটি হাতিও ছিল।

রাণার রাজ্য জয় করার জন্য সিদ্ধান্ত করে মহবৎ খাঁকে অভিযানের নেতা হিসাবে পাঠানো স্থির করি। কয়েকজন দক্ষ সেনাপতির পরিচালনায় বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে অস্ত্রে সুসজ্জিত করে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য আদেশ দিই। তা ছাড়া, পাঁচশ আহদি, দুই হাজার বন্দুকধারী পদাতিক, হস্তী ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে ৭০।৮০টি কামানসহ গোলন্দাজ বাহিনী এবং ৬০টি হস্তীও এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কুড়ি লক্ষ টাকাও সৈন্যবাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্য

দেওয়া হয়।

বুরহানপুরের বক্‌সি কতকগুলি আম পাঠান। তার মধ্যে একটি আম ওজন করতে আদেশ দিই। আমটির ওজন হলো সাড়ে বাহান্ন তোলা।

১৮ই বুধবার মরিয়ম জমানির বাড়ীতে আমার চত্বারিংশৎ বয়োপ্রাপ্তি উপলক্ষে চান্দ্র বৎসরের ওজন-উৎসব সম্পন্ন হয়। ওজন নেওয়ার সময় যে মুদ্রা ব্যবহার হয় তা স্ত্রীলোক ও দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করার জন্য আদেশ দিই।

রবিওল আওয়াল মাসের ৪ঠা তারিখ বৃহস্পতিবার আহ্‌দিদের বক্‌সি তাজির বেগকে 'মুসলিম খাঁ' উপাধি এবং সর্বগুণান্বিত ঐতিহাসিক ও ঘটনাপঞ্জী বিশারদ মুল্লা-ই-তাকিইয়া স্তুস্‌তারিকে 'মুয়ারিখ খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি। এই মাসের ১০ই তারিখ আবদুল্লা খাঁর ভ্রাতা বরখুরদারকে 'বাহাদুর খাঁ' উপাধি দিয়ে তার সহকর্মীদের মধ্যে বিশেষ সম্মান দেখাই।

মিতার খাঁয়ের পুত্র মুনিম খাঁ আমাকে জেস্‌পারের একটি জগ (জলপাত্র) দেয়। এই পাত্রটি মির্জা উলুগ বেগ গুরগনের রাজত্বকালে তৈরি এবং সেই রাজার সম্মানিত নামে ভূষিত। পাত্রটির আকৃতি অতি সুন্দর, অকৃত্রিম শ্বেত পাথরের রং এবং খাঁটি। পাত্রটির গলায় মির্জার নাম ও হিজরা সন রিকা বর্ণমালায় খোদাই করা আছে। পাত্রটির মুখের ধারে আমার নাম ও আকবরের পুণ্য নাম খোদাই করার জন্য আদেশ দিই। মিতার খাঁ এই দরবারের একজন প্রাচীন ক্রীতদাস ছিলেন। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে তাঁর কাছে কাজ করার সম্মান তিনি লাভ করেন এবং আমার মহামান্য পিতার আমলে আমীর শ্রেণীর পদ লাভ করেন। তিনি তাঁকে অতি বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন বলে গণ্য করতেন।

২৪শে তারিখ মামত খাঁ, আমীর ও সৈন্যদের রাণাকে দমন করার অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য অনুমতি দিই। উপরোক্ত খাঁকে সম্মানসূচক পোশাক, একটি অশ্ব, একটি বিশিষ্ট হস্তী এবং রত্নখচিত তরবারি দিয়ে সম্মানিত করি। জাফর খাঁকে একটি পতাকা, সম্মানসূচক পোশাক ও একটি রত্নখচিত ছোরা দান করি। এইভাবে সমস্ত আমীর ও সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কদের প্রত্যেককে পদমর্যাদানুযায়ী রাজকীয় উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

দিনের এক প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর খানখানান্ বুরহানপুর থেকে এসে আমাকে সম্মান জানান। তাঁকে আমি আমার আতালিক (অভিভাবক) রূপে মহা সম্মানজনক পদে নির্বাচিত করি। তিনি আনন্দে ও সুখানুভূতিতে

এমন অভিভূত হয়ে পড়েন যে তিনি যেন বুঝতেই পারেননি পায়ে হেঁটে বা মাথায় হেঁটে আমার কাছে এসে পৌঁছেছেন। তিনি বিমূঢ় অবস্থায় আমার পায়ের ওপর পড়েন। আমি অনুগ্রহ ও করুণার বশে তাঁর মাথা তুলে ধরে সদয় আলিঙ্গন করে তাঁর মুখচুম্বন করি। আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য তিনি দুই ছড়া মুক্তার মালা, কিছু চুনি ও পান্না নিয়ে আসেন। এই রত্নগুলির মূল্য তিন লক্ষ টাকা। এগুলি ছাড়াও তিনি আরও মূল্যবান জিনিস নিয়ে আসেন।

১৭ই জুমাদাল আওয়াল বাংলার দেওয়ান ওয়াজির এসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি মাদী ও মদ্দা ষাটটি হাতি ও একটি মিশরীয় চুনি উপঢৌকন দেন। তিনি একজন পুরাতন কর্মচারী এবং সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকেন। তাঁকে আদেশ দিলাম যে তিনি আমার কাছে থেকেই আমার পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

কাশিম খাঁ এবং তাঁর বড় ভাই ইসলাম খাঁ এক জায়গায় বাস করে সদ্ভাব রক্ষা করতে পারছিলেন না। সেইজন্য আমি কাশিম খাঁকে আমার কাছে ডেকে পাঠাই। কাল সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। ২২শে তারিখ আসফ খাঁ সাত টাঁক ওজনের একটি চুনি আমাকে উপহার দেন। চুনিটি তার ভাই আবুল কাশিম কাম্বে বন্দরে পঁচাত্তর হাজার টাকায় কিনেছিল। বেশ সুন্দর রং ও গড়নের এই রত্নটি। কিন্তু আমার মনে হয় ষাট হাজার টাকার বেশী এটির দাম হওয়া উচিত নয়।

রায় রায় সিংয়ের পুত্র দলীপ রায় অনেক অপরাধে অপরাধী। কিন্তু সে আমার পুত্রপ্রতিম (ফারজান্দ) খান জাহানের আশ্রয় নেওয়ায় তার সব দোষ ক্ষমা করি। জেনেশুনেও তার অপরাধগুলির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখি।

২০শে তারিখ খানখানানের পুত্ররা এসে পৌঁছায় ও আমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ২৫ হাজার টাকা উপঢৌকন দেয়। সেই দিনই খানখানান একটি হাতি উপহার স্বরূপ দেন।

১লা জমাদাস সানি বৃহস্পতিবার আমার সৌর বৎসরের উৎসব মরিয়ম জমানির প্রাসাদে সম্পন্ন হয়। কিছু অর্থ স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ আমার পৈতৃক রাজ্যগুলিতে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য আদেশ দিই।

এই দিন একটি দুধালো হরিণীকে আমার কাছে আনা হয়। হরিণীটি বিনা আপত্তিতে দুধ দোহন করতে দেয়। দৈনিক চার সের দুধ হয়। এরকম হরিণী আমি এর আগে কোনও দিন দেখিওনি এবং এই রকম হরিণীর কথা কোনও দিন শুনিওনি। হরিণ, গরু ও মহিষের দুধে কোনও পার্থক্য নেই। লোকে বলে হরিণের দুধ নাকি হাঁপানির ঔষধ।

এই মাসের ১১ই তারিখ রাজা মানসিংহ দাক্ষিণাত্যের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ করার এবং তাঁর নিজের দেশ অম্বর দেখতে যাওয়ার অনুমতি চান। আমার ব্যক্তিগত 'হুশিয়ার মস্ত' নামে একটি মদ্দা হাতি তাঁকে উপহার দিয়ে বিদায় দিই।

১২ই সোমবার মহামতি সম্রাট আকবরের মৃত্যুবার্ষিকী। এই ব্যাপারে খরচের জন্য যে অর্থ পৃথকভাবে ধার্য আছে তা ছাড়া আরও চার হাজার টাকা ফকির ও দরবেশ যাঁরা সেই মহান সমাধিস্থলে উপস্থিত থাকবেন তাঁদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য পাঠাই। সেই দিন খান আজমের পুত্র আবদুল্লাকে 'সরফরাজ খাঁ' উপাধি ও কাশিম খাঁয়ের পুত্র আবদুর রহিমকে 'তরবিয়ৎ খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি।

১৩ই বৃহস্পতিবার আমি খসরুর কন্যাকে দেখার জন্য ডেকে পাঠাই। তার বাবার সঙ্গে তার মুখের এমন মিল যে এমনটি কেউ কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। জ্যোতিষীরা বলেছিল যে এই মেয়ের জন্ম তার বাপের পক্ষে অশুভ হবে কিন্তু আমার পক্ষে শুভ হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। তারা বলেছিল—আমি যেন এই মেয়েকে তার তিন বছর বয়স হওয়ার পর দেখি। এই বয়স পার হওয়ার পরই আমি তাকে প্রথম দেখি।

নিজাম উল মুল্কের প্রদেশে (দাক্ষিণাত্যে) সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরই কিছু কিছু গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। খানখানান এই বিদ্রোহের ভাব নিঃশেষে দূর করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে এই মাসের ২১শে তারিখ আমাকে লিখিতভাবে জানান—"যদি আমি দুই বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে না পারি তা হলে আমি কর্তব্যকর্মে বিচ্যুত হয়েছি বলে নিজেকে দোষী মনে করবো। কিন্তু আমার এই কাজ সুসম্পন্ন করার শর্ত হবে এই যে ঐ সুবায় যে সৈন্যবাহিনী আছে তার সঙ্গে আরও বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য দশ লক্ষ টাকা আমার সঙ্গে পাঠাতে হবে। সৈন্যবাহিনীর জন্য সাজসরঞ্জাম এবং অর্থ তাড়াতাড়ি ঠিক করে তাঁকে গন্তব্যস্থলে পাঠানোর জন্য হুকুম দিই।

২৬শে তারিখ আহদিদের বক্‌সি মুখলিশ খাঁকে দাক্ষিণাত্য সুবার বক্‌সি নিযুক্ত করি এবং তার কাজ মিরবাহার ইব্রাহিম হোসেন খাঁকে দিই।

* *
*

১লা রজব আমার সর্বসময়ের পরিচারক পিসরু খা ও কমাল খাঁ মারা যায়। শা তামাস্প পিসরু খাঁকে ক্রীতদাস হিসাবে আমার পিতামহকে দিয়েছিলেন। তার নাম ছিল সাদাত। পরলোকগত সম্রাট আকবরের চাকুরিতে তার উন্নতি হওয়ার পর সে ফরাসখানার (গালেচা প্রভৃতি জিনিসের গুদাম) দারোগার কাজ পায়। এই সময় সে 'পিসরু' এই উপাধি লাভ করে। তার কাজে সে এমন পারদর্শী ছিল যে একথা অনায়াসেই লোকে বলতে পারে যে তার দক্ষতার আকৃতির ওপরই কেউ যেন একটা পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। নব্বই বছর বয়সকালেও তার ক্ষিপ্রতা চোদ্দ বছরের বালকের চেয়ে বেশী ছিল। আমার পিতামহ, পিতা এবং আমার পরিচর্যা করার তার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার শেষ নিশ্বাস না পড়া পর্যন্ত সে এক মুহূর্তও সুরাপানের নেশা থেকে বিরত হয়নি। সে পনেরো লক্ষ টাকা রেখে যায়। রিয়াইয়ত নামে তার একটি মূর্খ পুত্র ছিল। তার পিতার কার্যদক্ষতার দাবী মেনে নিয়ে ফরাসখানার অর্ধেকটার ভার তার ওপর দিই এবং অবশিষ্ট অর্ধেকটার ভার দিই তুখমাক্ খাঁয়ের ওপর।

কমাল খাঁও ছিল একজন ক্রীতদাস। সে আন্তরিকতার সঙ্গে আমার পরিচর্যা করেছে। তার সাধুতা ও বিশ্বস্ততার জন্য তাকে আমার 'বকাওয়াল বেগি'র (রন্ধনশালার প্রধান) পদ দিয়েছিলাম। এমন ভৃত্য খুবই কম দেখা যায়। তার দুই পুত্রকেই আমি অনুগ্রহ দেখাই। কিন্তু তার মত কি আর কেউ হতে পারে?

এই মাসের ২রা তারিখ লাল কলবন্ত পঁয়ষট্টি কি সত্তর বয়সে মারা যান। তাঁর শৈশবকাল থেকেই তিনি আমার পিতার কাজে বড় হয়ে উঠেছেন। আমার পিতা তাঁকে তাঁর প্রতি নিশ্বাসে ও প্রতি বাক্যে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর একজন উপপত্নী তাঁর মৃত্যুতে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করে। মুসলমান রমণীদের মধ্যে এমন বিশ্বস্ততা খুব কমই দেখা গেছে।

হিন্দুস্থানে বিশেষ করে বাংলার সীমান্ত রাজ্য সিলেটের অধিবাসীদের একটি প্রথা আছে যে তারা তাদের ছেলেদের মধ্যে কয়েকটিকে খোজা করে

তাদের খাজনার পরিবর্তে সেই জায়গার শাসককে দিয়ে থাকে। এই রীতিটি ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রদেশেও চালু হয়। প্রতি বৎসর এই ভাবে কিছু কিছু শিশুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং তারা সন্তান উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয়। এই সময় আদেশজারি করি যে এর পর থেকে এই ঘৃণ্য রীতি কেউ অনুসরণ করতে পারবে না। শিশু খোজাদের নিয়ে এই ঘৃণ্য ব্যবসা সম্পূর্ণ ভাবে লোপ করতে হবে। ইসলাম খাঁ ও সুবা বাংলার অন্যান্য শাসকরা ফর্মান পায় যে যদি কেউ এই কাজ করে তাহলে তার প্রাণদণ্ড হবে। যদি কারও গৃহে এইরূপ শিশু খোজা দেখা যায় তাহলে তাঁরা যেন তাদের আটক করেন। আগেকার রাজারা এই প্রথা লোপ করার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেননি। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের দয়ায় এই ঘৃণ্য রীতি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। খোজা নিয়ে ব্যবসা বেআইনী বলে গণ্য হওয়ায় আর কেউ এই দোষণীয় অলাভজনক কাজ করতে সাহসী হবে না।

খানখানানকে আমি একটি তেজী ঘোড়া উপহার দিই। শা আব্বাস আমাকে যে ঘোড়াগুলি পাঠিয়েছিলেন এটি তার মধ্যে একটি। আমার আস্তাবলের নিজস্ব ঘোড়াগুলির শিরোমণি এটি। তিনি ঘোড়াটি পেয়ে এমন খুশী হয়েছিলেন যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সত্যি কথা বলতে গেলে বড় আকারের এমন সুন্দর ঘোড়া আর একটিও হিন্দুস্থানে আসেনি। আমি তাঁকে 'ফুতু' নামে একটি হাতিও উপহার দিই। যুদ্ধে অন্য কুড়িটি হাতিকে অনায়াসে পরাজিত করতে পার এই 'ফুতু' নামের হাতিটি।

এই মাসের ১৪ই তারিখ মির্জা গাজিকে কান্দাহার রওনা হওয়ার জন্য আদেশ দিই। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল উক্ত মির্জা বাখর থেকে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রদেশের গভর্ণর সর্দার খাঁয়ের মৃত্যু সংবাদ এখানে পৌঁছয়।

১৭ই সোমবার পদব্রজে মহান সম্রাটের সমাধিস্থলে তীর্থযাত্রায় রওনা হই। যদি সম্ভব হতো তা হলে আমি রাস্তাটা আমার চোখের পাতা ও মাথা মাটিতে ঘষতে ঘষতে যেতাম। মহামান্য পিতা আমার জন্মের জন্য পায়ে হেঁটে ফতেপুর থেকে আজমীঢ় পর্যন্ত ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করে খাজা মুইনুদ্দিন সন্‌জারি চিস্তির সমাধিস্থলে গিয়েছিলেন। যদি আমার মাথা ও চোখ ঘষে এই অল্প পথ যেতে পারতাম তা হলে আর বেশী কি করা হতো? আমি যখন এই তীর্থযাত্রার সৌভাগ্য অর্জন করে গৌরবান্বিত হই, সেই সময়

সমাধিক্ষেত্রে যে অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে সেটা দেখি। কিন্তু আমি যে রকম আশা করেছিলাম সে রকম হয়নি। আমার ইচ্ছা ছিল যে এই অট্টালিকা এমন হবে যে বিশ্বের তাবৎ ভ্রমণকারীরা এইটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলবে যে জন-অধ্যুষিত পৃথিবীতে এরকম আর দ্বিতীয়টি নেই।

এই অট্টালিকা নির্মাণ করার সময় খসরুর দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটে এবং আমাকে লাহোরে যেতে হয়। স্থপতিরা তাঁদের নিজেদের নক্‌শা অনুযায়ী এই সৌধ তৈরী করেন। নির্মাণের কাজ তিন-চার বছর ধরে চলে। ধীরে ধীরে অনেক টাকাখরচ হয়ে যায়। আদেশ দিই—নানাস্থানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে নক্সা তৈরীর পর দক্ষ স্থপতিরা নতুন করে এই সৌধের ভিত্তি স্থাপন করবেন। ক্রমে ক্রমে উচ্চ সৌধ নির্মিত হলো। সমাধি সৌধের চারপাশে মনোহর উদ্যান রচিত হলো। সমাধিক্ষেত্রের বিশাল প্রবেশদ্বার শ্বেতপাথরে নির্মিত হলো। শুনলাম এই বিশাল সৌধ নির্মাণের ব্যয় হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা যা পারস্যের ৫০ হাজার 'তুমান' ও তুরাণ দেশের মুদ্রার মানে ৪৫ লক্ষ 'খানি'র সমান।

২৩শে তারিখ রবিবার যারা আগে দেখেনি এমন কয়েকজন সভাসদদের সঙ্গে হাকিম আলির বাড়িতে জলাধার দেখতে যাই। আমার পিতার সময় লাহোরে এই রকম একটা তৈরী হয়েছিল। জলাধারটি আয়তনে ৩ গজ × · গজ। এর পাশেই একটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। কক্ষটিতে বেশ আলো যায়। এই কক্ষে প্রবেশ করতে হলে জলের মধ্য দিয়ে আসতে হয় কিন্তু ঘরে জল ঢোকে না। হাকিম আলি তার জমানো নগদ টাকা ও মণিমাণিক্যাদির কিছু অংশ আমাকে উপঢৌকন দেন। সেই কক্ষটি পরিদর্শন করে এবং সভাসদদের সেইখানে প্রবেশ করার পর আমি তাঁকে দুই হাজারি মনসবদারি পদে উন্নীত করে প্রাসাদে ফিরে আসি।

১৪ই সাবান রবিবার খানখানানকে রত্নখচিত কটি-তরবারি ও একটি বিশিষ্ট হস্তী উপহার দিয়ে তাঁর কর্মস্থল দাক্ষিণাত্যে রওনা হওয়ার জন্য বিদায় দিই। রাজা সুরজ সিংকে—যিনি তাঁর সহকারী হিসাবে দাক্ষিণাত্যের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন—তিন হাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদে উন্নীত করা হয়।

আমাকে পুনরায় জানানোহলো যে মূর্তজা খাঁর আত্মীয়স্বজন ও কর্মচারীরা গুজরাটের অন্তর্গত আমেদাবাদের জনসাধারণ ও রায়তদের ওপর অত্যাচার

চালিয়ে যাচ্ছে। মূর্তজা খাঁ তাঁর আত্মীয় ও লোকজনদের ঠিকমত সংযত করতে পারছেন না। আমি এই সুবার ভার তার হাত থেকে নিয়ে আজম খাঁর ওপর ন্যস্ত করি। স্থির হয় যে আজম খাঁ দরবারেই থেকে যাবেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহাঙ্গীর খাঁ গুজরাটে যাবে তাঁর পক্ষ থেকে উপশাসক হয়ে। আদেশ দিলাম—মোহনদাস দেওয়ান ও মামুদ বেগ হামাজানি বকসির সঙ্গে পরামর্শ করে সে ঐ প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

৪ঠা জিলহিজ্জা, বুধবার খান আজমের কন্যার গর্ভে খসরুর একটি পুত্র-সন্তান হয়। তার নাম রাখি—বুলন্দ আখতার।

এই মাসের ৬ই তারিখ মুকবর খাঁ আমাকে একটি ছবি পাঠিয়ে জানায় যে ফিরিঙ্গিদের বিশ্বাস এই ছবিখানি তইমুরের। যে সময় ইলদিরিম বেজিদ তইমুরের বিজয়ী সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন সেই সময় কন্স্টান্টি-নোপলের একজন খ্রীষ্টান রাজা বশ্যতা জানিয়ে তাঁর কাছে কিছু উপহার সহ একজন দূত পাঠান। সেই দূতের সঙ্গে একজন চিত্রকরও আসে। সেই চিত্রকর তইমুরের প্রতিকৃতি এঁকে নিয়ে যায়। যদি এই কাহিনী সত্য হয় তাহলে এই চিত্রটির মত বহুমূল্য উপহার আর হয় না। কিন্তু এই চিত্রের সঙ্গে তাঁর কোনও বংশধরের আকৃতির কিছুমাত্র মিল না থাকায় আমি এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসস্থাপন করতে পারিনি।

শুভ রাজ্যাভিষেকের পর চতুর্থ নওরোজ

ধরিত্রীকে আলোকদানকারী মহান রবিগ্রহের মেষরাশিতে শুভাগমন ঘটলো ১৪ই জিলহিজ্জা, শনিবার, হিজরা ১০১৭ (২১শে মার্চ, ১৬০৯)। সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষ উৎসব শুরু হওয়ায় পৃথিবীতে আনন্দের বন্যা বইতে লাগলো।

৫ই মহরম, ১০১৮ সাল হাকিম আলি মারা যান। তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক ছিলেন। আরবীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তার চেয়ে অধ্যবসায় ছিল বেশী, যেমন স্বভাবের চেয়ে তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর, মেধার চেয়ে অর্জিত জ্ঞান ছিল অধিক। মোটের ওপর তাঁর হৃদয় ছিল কুভাবে পূর্ণ ও কলুষিত।

২০শে সফর মির্জা বরখুরদারকে 'খান আলম' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি। ফতেপুর থেকে একটি তরমুজ আমার কাছে আনা হয়। এত বড় তরমুজ আমি আর দেখিনি। তরমুজটি ওজন করতে বলি। ওজনে হলো তেত্রিশ সের।

১৯শে রবিউল আওয়াল সোমবার চান্দ্র বৎসরের ওজন নেওয়ার উৎসব হয় আমার মহামান্যা জননীর প্রাসাদে। ওজন নেওয়ার মুদ্রার একটা অংশ সেখানে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য একজন রাজপুত্রকে সেখানে পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হলো। পরভেজকে সেখানে পাঠানো স্থির করি। তার আসবাবপত্র সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা ও তার যাত্রার দিন স্থির করতে নির্দেশ দিই।

মহব্বত খাঁকে আমি দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ পাঠাই। সদরে কতকগুলি কাজের জন্য তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। তাঁকে বিদ্রোহী রাণার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রধান নায়ক নির্বাচিত করা হয়েছিল। তাঁর স্থলে আবদুল্লা খাঁকে মনোনীত করে তাঁকে 'ফিরোজ জং' উপাধিতে ভূষিত করি। রাণার বিরুদ্ধে অভিযানে যে সৈন্যবাহিনী যাচ্ছে তার সমস্ত মনসবদারের কাছে এই আদেশ জারি করার জন্য আবদুর রজ্জাককে পাঠাই যে মহব্বত খাঁ সেনাবাহিনীর প্রতি যে সব আদেশ দিয়েছেন তা থেকে কেউ যেন বিচ্যুত না হয়—সে আদেশের ফল ভালই হোক বা মন্দই হোক।

৪ঠা জুমাদাল আওয়াল এক আদিবাসী রাখাল আমার কাছে একটি খাসি পাঁঠা নিয়ে আসে। তার পাঁঠীর মত স্তন আছে। তা থেকে এমন দুধ পাওয়া যায় যাতে এক পেয়ালা কফি খাওয়া চলে। দুধ আল্লার বিশেষ অনুগ্রহের দান। অনেক প্রাণীর পুষ্টিবর্ধন-কারক। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপারটি সৌভাগ্যের দ্যোতক মনে করি।

১১ই তারিখ একটি রত্নখচিত তরবারি রাজা মানসিংহকে পাঠাই। ২২শে তারিখ দাক্ষিণাত্যের যে সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদ পরভেজকে দেওয়া হয়েছে সেই বাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে একজন পৃথক খাজাঞ্চি নিযুক্ত করা হয়। পরভেজের নিজস্ব খরচের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পৃথক ভাবে দেওয়া হয়।

আমার মন সে সময় দাক্ষিণাত্য অভিযান নিয়ে বিক্ষিপ্ত। জুমাদাল আখির মাসের ১লা তারিখ আমির-উল-উমরাকেও ঐ কাজে নিযুক্ত করি। তাকে একটি সম্মানসূচক পোশাক এবং একটি অশ্ব দিয়ে সম্মানিত করি। জগন্নাথের পুত্র করমচাঁদকে দুই হাজার পদাতিক ও দেড় হাজার অশ্বারোহীর মনসবদার পদে উন্নীত করে পরভেজের সঙ্গে পাঠাই। ৪ঠা তারিখ ৩৭০ জন আহদি অশ্বারোহী নিযুক্ত করে আবদুল্লা খানের সঙ্গে রাণার বিরুদ্ধে অভিযান-কারী সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য পাঠাই। সরকারী আস্তাবল থেকে একশটি অশ্বও তার সঙ্গে পাঠানো হয়। যাতে সে প্রয়োজনমত মনসবদার ও আহদিদের দিতে পারে।

১৭ই তারিখ ষাট হাজার টাকা মূল্যের একটি চুনি পরভেজকে এবং আর একটি চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের চুনি এবং দুটি মুক্তা খুররামকে দিই। ২৮শে তারিখ সোমবার জগন্নাথকে পাঁচ হাজার পদাতিক এবং তিন হাজার অশ্বারোহীর মনসবদার পদে উন্নীত করি। রজব মাসের ৮ই তারিখ রায় জয়সিংকে চার হাজার পদাতিক ও তিনহাজার অশ্বারোহীর মনসবদারের পদে উন্নীত করে দাক্ষিণাত্য অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য বিদায় দিই। ৯ই বৃহস্পতিবার পুত্র শাহরিয়ার গুজরাট থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। ১৪ই মঙ্গলবার পুত্র পরভেজ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য যাত্রা করে। তাকে একটি সম্মানসূচক পোশাক, একটি বিশেষ জাতের ঘোড়া ও একটি হাতি, একটি তরবারি এবং একটি রত্নখচিত ছোরা উপহার দিই। যে সব সর্দার ও আমীর তার সঙ্গী হয়ে যাচ্ছেন তাঁরাও পদানুযায়ী এক-একটি ঘোড়া,

সম্মানসূচক পোশাক, হাতি, তরবারি ও রত্নখচিত ছোরা উপহার পেয়ে আনন্দ লাভ করে। দাক্ষিণাত্যে পরভেজের পরিচর্যার জন্য একশজন আহদিকে নিযুক্ত করা হয়।

এই দিন আবদুল্লা খাঁর কাছ থেকে সংবাদ আসে যে বিদ্রোহী রাণাকে কঙ্করময় পাহাড়ী দেশের অভ্যন্তরে অনুসরণ করে তিনি কয়েকটি হস্তী ও অশ্ব আটক করেছেন। রাতের অন্ধকারে অতি কষ্টে রাণা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি রাণার অবস্থা বিষময় করে তুলেছে। শীঘ্রই তাকে বন্দী অথবা হত্যা করতে তিনি সক্ষম হবেন। খাঁকে পাঁচ হাজার পদাতিকের অধিনায়কের পদে উন্নীত করি।

দশ হাজার টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা পরভেজকে দিই। এই পুত্রকে খান্দেশ ও বেরার প্রদেশ দিয়েছিলাম। এখন তাকে আসির দুর্গটিও দিই। ২২শে শুক্রবার ধানিমদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে এই মদ বাজারে বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জুয়াখেলা বেআইনী ঘোষণা করেও একটি কঠোর আদেশ দেওয়া হয়।

২৫শে তারিখ আমার নিজস্ব পশুশালা থেকে একটি বাঘ একটি ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আনা হয়। বাঘে ষাঁড়ে যুদ্ধ দেখার জন্য অনেক লোক জমে—তার মধ্যে একদল যোগী সন্ন্যাসীও ছিল। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন ছিল নাগা (নেংটা)। বাঘটি ক্রীড়াচ্ছলে তার দিকে—হত্যা করার জন্য নয়, এগিয়ে এলো। তাকে মাটিতে ফেলে তার ওপর চড়াও হয়ে এমন ব্যবহার করতে লাগলো যা তার নিজের বাঘিনীর সঙ্গে করে থাকে। পরদিনও আরও অনেকবার এই একই ব্যাপার ঘটলো। এরকম ব্যাপার আর কোনও কালেই ঘটেনি বলে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করলাম।

রবি যখন বৃশ্চিক রাশিতে সঞ্চার করেন, হিন্দুরা সেদিনকে বলে সংক্রান্তি। সেই দিন এক হাজার তোলা সোনা ও রূপা এবং এক হাজার টাকা ভিক্ষা স্বরূপ বিতরণ করা হয়।

এই মাসের ১০ই তারিখ শা'বেগ ইউজি ও দরফুলের সাসক মুবারকের জামাতা বিশিষ্ট যুবাপুরুষ সলামুল্লা আরবিকে একটি করে হস্তী উপহার দেওয়া হয়। শেষোক্ত যুবাটিকে শা' আব্বাস সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন বুঝতে পেরে সে আমার কাছে আসে। আমি তাকে অনুগ্রহ দেখাই এবং চারশ পদাতিক ও দুইশ অশ্বারোহীর নায়কপদে নিযুক্ত করি।

দাক্ষিণাত্যের সমর অভিযানে সাহায্য করার জন্য পুনরায় ১৯৩ জন মনসবদার ও ৪৬ জন আহদিকে পরভেজ যাত্রা করার পর পাঠাই। দরবারের একজন কর্মচারীকে ৫০টি অশ্ব নিয়ে পরভেজের কাছে যেতে আদেশ করি।

১৩ই শুক্রবার আমার মনে কিছু ভাব আসে। তাই নিয়ে এই গীতটি লিখি।—

"আমি কি করি?
তোমার অদর্শন-শর
বিদ্ধ করেছে আমার হৃদয়।
তোমার কু-দৃষ্টি কি ফিরবে আমার দিকে,
না চেয়ে দেখবে আর কাউকে?
তোমার গতি উদ্‌ভ্রান্তের মত।
জগৎ তাকিয়ে আছে তোমার দিকে
ফ্যালফ্যাল উন্মাদের দৃষ্টি নিয়ে।
পাছে, আবার তোমার দৃষ্টি পড়ে আমার উপর।
তাই ভেবে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি আমি।
আমার সখির সঙ্গে মিলনে পাগল হই,
আর বিরহে হতাশ হয়ে পড়ি।
বিষাদ আমাকে করেছে অভিভূত
পাগল হয়ে গেছি আমি।
হয়তো, আবার তোমার সঙ্গে
মিলনের পথে ধেয়ে যাব।
হায় রে, এই সময় আমার কাছে
পৌঁছে গেল বার্ত্তা—'জাহাঙ্গীর,
প্রত্যুষে হও নত,
হও প্রার্থনারত।'
মোর আশা, দিব্য আলোর জ্যোতি
উঠিবে ফুটিয়া আমার হৃদয়ে।"

১৫ই রবিবার, শা' ইসমাইল সাফাই-এর পুত্র বরাম মির্জার পুত্র সুলতান হোসেন মির্জার পুত্র মুজাফ্‌ফর হোসেন মির্জার কন্যার বাড়ীতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাচাক (বিবাহের যৌতুক) স্বরূপ পাঠানো হয়—কারণ তার সঙ্গে

আমার পুত্র খুররামের বিবাহ স্থির হয়েছে।

২২শে তারিখ একটি চুনি ও একটি মুক্তা পেল শাহরিয়ার। দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত আইমাকদের (বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনী) ভরণপোষণের জন্য দশ লক্ষ টাকা ধার্য করা হলো। এ যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকর ফারুক বেগকে দুই হাজার টাকা দেওয়া হয়। বাবা হাসান আবদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য চার হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। হজরত শেখ সলিমের সমাধিস্থলে বাৎসরিক উৎসবের ব্যয় নির্বাহ জন্য মোল্লা আলি আহমদ মুরকান (খোদাইকার) এবং মোল্লা রুজবিহান সিরাজির হাতে এক হাজার টাকা দেওয়া হলো। লেখক মহম্মদ হোসেনকে একটি হাতি এবং খাজা আবদুল আনসারিকে দেওয়া হলো এক হাজার টাকা। দেওয়ানদের আদেশ দিই যে মুর্তজা খাঁকে পাঁচ হাজারি মনসবদারি পদে বহাল করায় তাঁকে একটি জায়গীর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আগ্রা সরকারের কানুনগো বিহারীচাঁদকে আদেশ দেওয়া হলো যে তিনি যেন আগ্রার জমিদারদের কাছ থেকে সাজসরঞ্জাম সহ এক হাজার পদাতিক সংগ্রহ এবং তাদের মাসিক মাহিয়ানা ঠিক করে দাক্ষিণাত্যে পরভেজের কাছে পাঠান। পরভেজের নিজের ব্যয়ের জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।

আমার ওজন নেওয়ার অর্থ থেকে পাঁচ হাজার টাকা বাবা হাসান আবদালে সেতু নির্মাণ ও সেখানকার অট্টালিকা মেরামতের জন্য হাকিম আবুল ফতের পুত্র আবুল ওয়াকাফকে দেওয়া হয় যাতে সে সেতু ও উপরোক্ত অট্টালিকার কাজ ঠিক মত সম্পন্ন করতে পারে।

১০ই শনিবার দিনের চারঘড়ি অবশিষ্ট থাকার সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে গোটা চাঁদ গ্রহণে গ্রাস করে। গ্রহণ চলে রাতের পাঁচঘড়ি পর্যন্ত। গ্রহণের মন্দ ফল দূর করার জন্য সোনা, রূপা, বস্ত্র এবং শস্য দিয়ে আমার ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা করি এবং ভিক্ষাস্বরূপ পনেরো হাজার টাকা মূল্যের নানা বস্তু —যেমন হাতি ঘোড়া প্রভৃতি বিতরণ করি। আমি এ সবই উপযুক্ত ব্যক্তি ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে আদেশ দিই।

২৫শে তারিখ রামচাঁদ বান্দিলার অনুরোধে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করি। মির সরিফের ভ্রাতুষ্পুত্র মির ফজিলকে একটি হাতি উপহার দিই। তাকে কবুলা ও আশপাশের জায়গার ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। ইনায়াৎউল্লাকে 'ইনায়াৎ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করি।

১লা জিল্কদ বুধবার বিহারীচাঁদকে পাঁচশত পদাতিক ও তিনশত অশ্বারোহীর নায়ক পদ দেওয়া হয়। মণিমুক্তা খচিত একটি ছোরা বাবা খুররামকে উপহার দিই। মোল্লা জায়াতিকে চিঠি সহ আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা মৌলিক ভাবে জানানোর জন্য খানখানানের কাছে পাঠাই। সে ফিরে এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো আমার জন্য খানখানানের দেওয়া উপহার কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের একটি চুনি ও তুইটি মুক্তা। মির জামাহুদ্দিনকে বুরহানপুর থেকে আমার জন্য আদেশ পাঠিয়ে ছিলাম। সে আমার সঙ্গে দেখা করলো। সাজাত খান দক্ষিণীকে তুই হাজার টাকা পুরস্কার দিই।

এই মাসের ৬ই তারিখ পরভেজ বুরহানপুর পৌছানোর আগেই খানখানান ও আমীরদের কাছ থেকে একটি আবেদন এলো। তার মর্মার্থ হলো দক্ষিণীরা একসঙ্গে জোট বেঁধে গণ্ডগোল শুরু করেছে। আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে পরভেজকে দাক্ষিণাত্য অভিযানের জন্য মনোনীত করে এবং বিপুল বাহিনী তার সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করার পরও যখন ওঁরা আরও সাহায্যের প্রয়োজন বলে জানাতে চান, তখন আল্লার অনুগ্রহে আমাকেই স্বয়ং এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করার জন্য যেতে হবে। আসফ খাঁর কাছ থেকে এই আবেদন এলো যে ঐদিকে আমার শুভাগমন হলে রাজ্যবৃদ্ধির সহায়ক হবে। বিজাপুর থেকেও আদিল খাঁর আবেদন এলো যে দরবারের কোনও বিশ্বস্ত লোককে দূত হিসাবে যদি সেখানে পাঠানো হয় তাহলে তার কাছে তিনি তাঁর মনের অভিলাষ এবং দাবী ব্যক্ত করবেন এবং সেই দূত আমার কাছে সেগুলো জানাতে পারবেন। তিনি আশা করেন এই ব্যবস্থা হলে তাঁর মত ক্রীতদাসের অনেক উপকার হতে পারে। এই ব্যাপারে আমি আমীর ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করি। তাঁদের বলি যে এ বিষয়ে তাঁদের মনোগত ভাব অসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারেন। পুত্রপ্রতিম খান জাহান নিবেদন করলো যখন অতগুলো আমীরকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে তখন আমার স্বয়ং সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তাকে আদেশ করলে সেই নিজে যাবে এবং সম্রাটপুত্রের পরিচর্যা করে আল্লার দয়া হলে তার ওপর ন্যস্ত কাজ সম্পন্ন করবে। সমস্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিরাই তার কথা অনুমোদন করলেন। সে আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে এ কথা আমি কখনও কল্পনাই করতে পারিনি। কিন্তু ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি বাধ্য হয়ে তাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম। আদেশ দিলাম—ওদিককার ব্যাপার শৃঙ্খলার মধ্যে এলে সে যেন

তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে। ঐ দেশে যেন কিছুতেই সে এক বছরের বেশী না থাকে। ১৭ই জিল্কদ, মঙ্গলবার তাকে যাত্রা করার অনুমতি দিই। তাকে স্বর্ণখচিত সম্মানসূচক পোশাক, রত্নখচিত জিন সহ একটি তেজী অশ্ব, রত্নখচিত তরবারি ও একটি হস্তী দিলাম। আমি তাকে চমরের লেজের নিশানও দিলাম আমার বিশ্বাসী ভৃত্য ফিদাখানকে সম্মানসূচক পোশাক, একটি অশ্ব এবং তার নিজস্ব ব্যয়ের জন্য অর্থ দিয়ে এবং তাকে এক হাজার পদাতিক ও চারশ অশ্বারোহীর নায়ক পদে উন্নীত করে খান জাহানের সঙ্গে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিই। প্রয়োজন হলে তাকে আদিল খাঁর অনুরোধ অনুসারে তাঁর কাছে পাঠাতেও খান জাহানকে বলে দিলাম। পরলোকগত সম্রাট আকবরের সময় আদিল খাঁর উপঢৌকন নিয়ে লক্ষ্ণু পণ্ডিত এসেছিলেন। তাঁকে একটি অশ্ব, সম্মানসূচক পোশাক ও অর্থ দিয়ে খান জাহানের সঙ্গে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। যে সব আমীর ও সৈন্যদের আবদুল্লা খানের নেতৃত্বে রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে বীরসিং দেও, সাজাত খান, রাজা বিক্রমজিৎ ও আরও কয়েকজনকে চার-পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খান জাহানকে সাহায্যের জন্য মনোনীত করা হলো। সৈন্য বাহিনীর ছয় সাত হাজার অশ্বারোহীও তার সঙ্গে পাঠানো হলো। প্রাসাদের লোকজনদের মধ্যে সঙ্গে গেল—সইফ খাঁ বারহা, হাজি বি উজবেগ, জিনজুয়াং ও দাজক্ মুবারক আরবের ভ্রাতুষ্পুত্র সলামুল্লা আরব এবং অন্যান্য মনসবদার ও দরবারের কর্মচারী। তাদের বিদায় দেওয়ার সময় আমি প্রত্যেকের পদবৃদ্ধি করে সম্মানজনক পোশাক ও তাদের খরচের টাকা দিলাম। মহম্মদ বেগকে সেনাবাহিনীর খাজাঞ্চি নিযুক্ত করে দশ লক্ষ টাকা তার সঙ্গে দেওয়া হলো। পরভেজকে একটি বিশেষ অশ্ব এবং খানখানান ও অন্যান্য আমীর ও কর্মচারী যাঁরা এই সুবার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের জন্য সম্মান-সূচক পোশাক পাঠানো হলো।

এই সব ব্যাপার সমাধা করে আমি শিকারের উদ্দেশ্যে নগর ত্যাগ করি। রবি ফসলের সময় হয়ে এসেছে। সৈন্যবাহিনী চলার সময় যাতে কৃষকদের ফসলের কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য একদল আহদির সঙ্গে একজন বিশেষ কর্মচারীকে শস্যক্ষেত্রগুলি রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা সত্ত্বেও আরও কয়েকজন কর্মচারীকে আদেশ দিই যে তারা সৈন্যবাহিনীর চলার পথে স্থানে স্থানে শস্যের কি রকম ক্ষতি হচ্ছে তা যেন পরীক্ষা করে দেখে এবং ক্ষতিগ্রস্ত

রায়তদের ক্ষতিপূরণ করে।

১২ই তারিখ শিংওয়ালা দুইটি হরিণ এবং একটি হরিণী ও ১৩ই তারিখ দুইটি হরিণ ও তিনটি হরিণী শিকার করি। ১৪ই তারিখ, বুধবার আমি একটি মাদী নীল গাই ও কৃষ্ণসার হরিণ বন্দুক দিয়ে মারি। ১৫ই তারিখ আর একটি মাদী নীল গাই ও একটি চিকার শিকার করি।

১৭ই তারিখ জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ দুইটি চুনি ও একটি মুক্তা গুজরাট থেকে আমার জন্য নিয়ে আসে। তা ছাড়া ক্যাম্বে বন্দর থেকে মোকারব খাঁ যে রত্নখচিত আফিংয়ের কৌটা সংগ্রহ করেছিল সেটা আনে। ২০শে তারিখ বন্দুক দিয়ে একটি বাঘিনী ও একটি নীল গাই শিকার করি। বাঘিনীর সঙ্গে দুইটি বাচ্চা ছিল। কিন্তু তারা ঘন জঙ্গল ও গাছের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। লোকজনদের আদেশ দিই যে ঐ দুইটি বাঘের বাচ্চাকে যে করে হোক ধরে আনতে হবে। আমি যখন বিশ্রাম শিবিরে যাই সেই সময় পুত্র খুররাম একটি শাবক নিয়ে আসে। পরদিন মহবত খাঁ আর একটি আনেন।

২২শে তারিখ যখন আমি একটি নীল গাইকে শিকারের আওতায় পাই, সেই সময় হঠাৎ একজন সহিস ওদুইজন কাহার সামনে এসে পড়ে। নীল গাইটি পালিয়ে যায়। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে সহিসকে ঐ জায়গাতেই হত্যা করতে এবং কাহারদের পায়ের শিরা কেটে ফেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে শিকারস্থলের চারপাশে ঘোরানোর জন্য আদেশ দিই যাতে এমন কাজ ভবিষ্যতে করার সাহস যেন আর কারও না হয়। এরপর আমি ঘোড়ায় চড়ে শিকারী বাজ নিয়ে শিকার করে বিশ্রাম শিবিরে ফিরে আসি।

পরদিন ইস্কান্দার মুইনের তত্ত্বাবধানে আমি একটা বড় নীল গাই শিকার করি। আমি তাকে পুরস্কার স্বরূপ ছয়শ পদাতিক ও পাঁচশত অশ্বারোহীর মনসবদার পদে উন্নীত করি।

২৪শে শুক্রবার সাদার খান বেহার সুবা থেকে এসে আমার দর্শনলাভ করে শ্রদ্ধা জানানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি একশটি মোহর, একটি তরবারি, পাঁচটি হস্তিনী ও একটি হস্তী উপঢৌকন স্বরূপ উপস্থিত করেন। আমি হস্তীটিকে গ্রহণ করি। এইদিনই সমরকন্দের ইয়াদগার খাজা বাল্‌খ থেকে এসে সম্মান জানান। তিনি আমাকে একটি অ্যাল্‌বাম, কয়েকটি অশ্ব এবং অন্যান্য জিনিস উপঢৌকন দেন। আমি তাঁকে একটি পোশাক দিয়ে সম্মানিত করি।

৬ই জিলহিজ্জা বুধবার বিদ্রোহী রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর খাজাঞ্চির পদ থেকে বরখাস্ত মুইজ্জুম মুল্‌ক পীড়িত ও দুস্থ অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কুতুবউদ্দিন খাঁর পুত্র কিস্‌ওয়ার খাঁ রোটাস্ দুর্গ থেকে এসে আমাকে সম্মান জানানোর সৌভাগ্য অর্জন করে।

শুভ রাজ্যাভিষেকের পর পঞ্চম নওরোজ

২৪শে জিলহিজ্জা, রবিবার (২০শে মার্চ, ১৬১০) দুই প্রহর তিন ঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর রবি তাঁর গৌরবজনক তুঙ্গস্থান মেষ রাশিতে আগমন করেন। এই শুভ সময়ে বারি পরগণার বাক্‌ভাল নামে একটি পল্লীতে নওরোজ উৎসব পালন করি এবং আমার মহামান্য পিতার নিয়মানুযায়ী সিংহাসনে উপবেশন করি। নববর্ষের প্রভাত চারিদিক আলো করে আছে। এই দিনটিতে আমার রাজ্যাভিষেকের পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হওয়ায় প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়। দরবারের সমস্ত আমীর ও কর্মচারীরা আমাকে সম্মান জানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। কোনও কোনও আমীরের উপঢৌকন আমার সম্মুখে রাখা হলো। খান আজম চার হাজার টাকার একটি মুক্তা, মিরণ সদর জাহান দেন আঠাশটি শিকারী বাজ উপহার। মহবত খাঁ দেন ইউরোপে তৈরী দুইটি বাক্স—যার দুইধারের আবরণ কাঁচের। এইজন্য বাক্সের ভিতর কোনও জিনিস রাখলে তা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, মনে হয় যেন কোনও আবরণ নেই। কিস্‌ওয়ার খাঁ দেন কুড়িটি হস্তী ও হস্তিনী। এই ভাবে দরবারের সমস্ত কর্মচারী তাঁদের সাধ্যমত কিছু না কিছু উপহার দেন। ফতেউল্লা শরবতচির (শরবত তৈরীর ভারপ্রাপ্ত) নসরুল্লাকে এই সব উপহারগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়।

গাজি খানের পুত্র হুসামুদ্দিন দরবেশ এবং সংসারত্যাগীর জীবন গ্রহণ করেছেন। তাঁকে এক হাজার টাকা ও শাল উপহার দিই। নওরোজের পরদিন বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়ি। দুইটি বাঘ ও একটি বাঘিনী মারা পড়ে। যেসব আহদিরা সাহস দেখিয়ে বাঘের সন্ধান দেয় তাদের পুরস্কার দিয়ে বেতন বাড়িয়ে দিই। ২৬শে তারিখ বেশীর ভাগ সময় নীল গাই শিকারে ব্যস্ত থাকি। আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠায় এবং আগ্রায় ফেরার শুভ সময় আসন্ন হওয়ায় আমি রূপবাসে যাই। সেই অঞ্চলে কয়েকদিন হরিণ শিকার করি।

১লা মহরম শনিবার রূপ খাবাস—যিনি রূপবান গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা—আমাকে তাঁর নিজের তৈরী কতকগুলি জিনিস উপহার দিতে আসেন। আমার পছন্দমত জিনিস গ্রহণ করে অবশিষ্টগুলি তাঁকেই পুরস্কার স্বরূপ

অর্পণ করি।

আমার রাজ্যাভিষেকের পঞ্চম বৎসরের ৩রা মহরম সোমবার আমি মন্দাকর উদ্যানে আসি। উদ্যানটি আগ্রা নগরের কাছেই। সকালে এক প্রহর দুই ঘড়ি অতিবাহিত হলে নগরে প্রবেশের শুভ সময় উপস্থিত হলে প্রথমে ঘোড়ায় চড়ে নগরের প্রান্তে আসি। সেখান থেকে হাতির পিঠে উঠি যাতে দূর এবং নিকটের জনসাধারণ আমাকে দেখার সৌভাগ্যলাভ করে। হাতির পিঠ থেকে রাস্তার দুই পাশে টাকা পয়সা ছড়াতে ছড়াতে যাই। যে সময় জ্যোতিষীরা প্রাসাদে প্রবেশের শুভক্ষণ নির্দেশ করে দিয়েছেন সেই দুপুরের পর হৃষ্টচিত্তে প্রাসাদে প্রবেশ করি।

নওরোজের রীতি অনুসারে প্রাসাদ সজ্জিত করার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। প্রাসাদ যেন স্বর্গপুরী। প্রাসাদের সাজসজ্জা দেখার পর খাজা জাহান আমার সামনে তাঁর উপঢৌকন নিয়ে আসেন। অলঙ্কার, মণিমুক্তা, পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে আমার পছন্দমাফিক জিনিস গ্রহণ করে অবশিষ্ট জিনিস তাঁকেই পুরস্কার স্বরূপ দিই। শিকার দপ্তরের কেরানীদের আমি নগর ত্যাগ করার সময় থেকে নগরে প্রত্যবর্তন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সব প্রাণী শিকার করি তার তালিকা প্রস্তুত করতে আদেশ দিই। তারা আমাকে জানায়—৫৬ দিনে চতুষ্পদ জন্তু ও পাখী ইত্যাদি মিলে ১৩৬২টি শিকার করেছি। তার মধ্যে বাঘ ৭টি, নীল গাই মাদী ও মদ্দা মিলে ৭০, কৃষ্ণসার হরিণ ৫১, পাহাড়ী ছাগল ইত্যাদি ৮২, সারস, ময়ূর সুরখাব (ব্রাহ্মিণী হাঁস) এবং অন্যান্য পাখী ১২৯, মাছ ১০২৩।

৭ই শুক্রবার ক্যাম্বে ও সুরাটবন্দর থেকে মোকারব খাঁ এখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি রত্ন, রত্নখচিত অলঙ্কার, ইউরোপে তৈরী স্বর্ণ ও রৌপ্য বাসন এবং আরও অনেক সুন্দর দুষ্প্রাপ্য উপহার দ্রব্য, আবিসিনিয়ার স্ত্রী ও পুরুষ ক্রীতদাস, আরবের ঘোড়া এবং আরও নানা ধরনের জিনিসপত্র যা তাঁর ভাল লেগেছিল আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য সঙ্গে এনেছিলেন। তাঁর এই সব উপহার দ্রব্য আড়াই মাস ধরে আমার সামনে ক্রমে ক্রমে আনা হয়। উপহারগুলির অধিকাংশই আমার মনোরঞ্জন করে।

আফজল খাঁর (আবুল ফজলের পুত্র) জন্য একটি লড়াইয়ে হস্তী তাঁর পুত্র বিশুতালের সঙ্গে পাঠানো হলো। খাজা মুইনউদ্দিন চিস্তির বংশধর খাজা হুসেনের ষান্মাসিক বৃত্তি এক হাজার টাকা প্রথামত দেওয়া হলো। খানখানান্

মোল্লা মিরআলির হাতের লেখা সচিত্র 'ইউসুফ ও জুলেখা' নামে বইখানি আমাকে উপঢৌকন পাঠান। সোনার জলে লেখা বইখানির বাঁধাই অতি চমৎকার। এর মূল্য এক হাজার মোহর। বইখানি তাঁর ভকিল মাসুম নিয়ে আসেন এবং আমাকে অর্পণ করেন।

নওরোজ উৎসবের শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন আমীর ও দরবারের কর্মচারীরা একে একে উপহার দ্রব্য আমার সম্মুখে ধরে দিতেন। যেসব দুষ্প্রাপ্য জিনিস আমার ভাল লাগত, সেগুলি নিজের জন্য রেখে দিয়ে অবশিষ্ট-গুলি ফিরিয়ে দিতাম। ১৩ই তারিখ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৯শে ফারওয়ারদিন, রবি গ্রহের আনন্দক্ষেত্রে সর্বোচ্চস্থানে অবস্থান করার দিন। আমি সুরাপান উৎসবের আয়োজন করতে নির্দেশ দিই। এই উৎসবে নানারকম উত্তেজক সুরা ও পানীয় পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হয়। আমীর ও দরবারের কর্মচারীরা পছন্দমত সুরাপান করতে পারেন এই ব্যবস্থা হয়। অনেকেই সুরাপান করলেন, কেউ কেউ উত্তেজক পানীয়, আবার কেউ কেউ আফিং দিয়ে তৈরী খাদ্যদ্রব্য খেলেন।

জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ গুজরাট থেকে আমার জন্য একটি রৌপ্য সিংহাসন উপঢৌকন পাঠান। সিংহাসনটি চিত্রিত, নতুন ফ্যাশান ও গড়নের।

আমার রাজত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বারংবার এই আদেশ দিই যে কেউ খোজা করতে পারবে না। খোজা বিক্রয় অথবা ক্রয় বে-আইনী। যে কেউ এই কারবার করবে তারা দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এই সময় আফজল খাঁ বেহার সুবা থেকে কয়েকজন আসামীকে পাঠান যারা এই ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী। আমি এইসব বি-আকিব্‌তান্‌দের (অবিবেচক) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিই।

১২ই তারিখ রাত্রে একটি অসাধারণ ও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কয়েকজন দিল্লীর গায়ক আমার সম্মুখে গান করছিল। সই-ইয়াদি শা' (ভাঁড়) কৌতুক করে একটি ধর্মীয় নৃত্যের ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করে নাচ শুরু করে দিল। আমীর খসরুর সঙ্গীতের একটা ধুয়া এই!

"বিশ্বাসের খাঁটি পথ আর 'কিবলা-গহি' (মন্দির) সব ধর্মেই আছে।
আমার কিব্‌লা করেছি খাড়া তাঁরই পথে, (বাঁকা) টুপি মাথায় রেখে।"

আমি জিজ্ঞাসা করি শেষ পদটির অর্থ কি?

সীল-মোহর খোদাইকার মোল্লা আলি আহম্মদ যে তার নিজ শিল্পকাজে

এযুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং যার পিতার কাছে আমি শৈশবকালে প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম—এগিয়ে এসে বলে—"আমার বাবার কাছে শুনেছি একদিন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া মানার এক পাশে টুপি পরে যমুনার তীরে একটি আনন্দের ছাদে বসে হিন্দুদের যমুনায় ধর্মীয় পুণ্যস্নান দেখছিলেন। সেই সময় আমীর খসরু সেখানে এলেন। শেখ তাঁর দিকে ফিরে চেয়ে বললেন—এই জনতাকে দেখতে পাচ্ছ তো? সঙ্গে সঙ্গেই এই পদটি আবৃত্তি করলেন—'বিশ্বাসের খাঁটি পথ আর কিব্‌লা গহি, সব ধর্মেই আছে।' আমীর কিছুমাত্র দ্বিধা না করে শেখকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন। 'আমার কিব্‌লা করেছি খাড়া তাঁরই পথে (বাঁকা) টুপি মাথায় রেখে।'

উপরোক্ত মোল্লা কথাগুলি উচ্চারণ করার সময় এবং শেষ পদের কথাগুলি জিভের ওপর মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তার এই পতনে আতঙ্কিত হয়ে আমি তার মাথার কাছে যাই। উপস্থিত অধিকাংশ লোক সন্দেহ করল যে তার মৃগী রোগ আছে। চিকিৎসক যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার নাড়ী পরীক্ষা করে ওষুধ নিয়ে এলেন। চিকিৎসকদের হাত-পা নাড়া ও অধ্যবসায় বৃথা হলো। তার জ্ঞান আর ফিরলো না। পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মা আল্লার দরবারে চলে যায়। তার শরীর তখনও গরম থাকায় মনে হয়েছিল যে সম্ভবতঃ তার জীবনীশক্তির কিছুটা হয়তো অবশিষ্ট আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য জানা গেল যে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তার মৃতদেহ তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। এমন মৃত্যু আমি আর কখনও দেখিনি। কবর দেওয়ার জন্য তার ছেলেদের কাছে টাকা পাঠালাম। পরদিন সকালে তার শবদেহ দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের পূর্বপুরুষের সমাধিস্থলে তার কবর দেওয়া হয়।

ইফ্‌তিকার খাঁ বাংলাদেশ থেকে একটি দুর্লভ জাতের হাতি পাঠাল। হাতিটিকে আমার খুব পছন্দ হয়। তাকে আমার ব্যক্তিগত হস্তীশালায় স্থান দিলাম। আমেদ বেগ খাঁ বংগাশে প্রেরিত সেনাবাহিনীর সেনাপতি মনোনীত হন। তাঁর এবং তাঁর পুত্রদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পদাতিক সৈন্যসংখ্যা পাঁচশ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এখন তিনি হলেন আড়াই হাজার পদাতিক ও দেড় হাজার অশ্বারোহীর মনসবদার।

একটি রত্নখচিত স্বর্ণাসন পরভেজের জন্য এবং একটি দুই হাজার টাকা মূল্যের চুনি ও মুক্তার শিরপ্যাচ খান জাহানের জন্য সরবরা খাঁর পুত্র হবিবের

হাতে বুরহানপুরে পাঠাই।

এই সময় জানতে পারি যে কামার খাঁর পুত্র কেকিব একজন সন্ন্যাসীর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে সেই সন্ন্যাসীর দূষণীয় ও অসাধু বাক্য তার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। সে নকিব খাঁর পুত্র আবদুল লতিফ, সরিফ, তার আত্মীয়স্বজনদেরও তার ভুলের অংশীদার করেছে। এই ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়লে একটু ভীতি প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিজের সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো যা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তাদের শাস্তি হওয়া উচিত বিবেচনা করে কেকিব ও সরিফকে বেত্রাঘাত শাস্তি দেওয়ার পর কারারুদ্ধ করি এবং আবদুল লতিফকে আমার সামনে একশ বেত্রাঘাত করার আদেশ দিই। এই রকম বিশেষ শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে আল্লার আইন মেনে চলতে হবে এবং যাতে অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রকম কুকার্যের দিকে ঝোঁক না দেয়।

২৪শে সোমবার মুয়াজ্জম খাঁকে দিল্লী পাঠানো হয়—সেদিকের বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। সাজাত খাঁ দক্ষিণীকে দুই হাজার টাকা দেওয়া হয়। শেখ হোসেন দর্শনিকে কতকগুলি ফর্মান ও উপহার দ্রব্য নিয়ে বঙ্গদেশে রওনা হওয়ার জন্য আদেশ দিই। ঐ সুবার প্রত্যেক আমীরকে ঐ ফর্মান ও উপহার দ্রব্য দেওয়ার হুকুম দিয়ে তাকে বিদায় করি। ইসলাম খাঁর কাজের ওপর দৃষ্টি রেখে এবং তাঁর কাজ অনুমোদন করে তাঁকে পাঁচ হাজার মনসবদারি পদে উন্নীত করি এবং একটি সম্মানসূচক পোশাক দিই। কিস্ওয়ার খাঁকে একটি বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক, রাজা কল্যাণকে একটি ইরাকি ঘোড়া এবং অন্যান্য আমীরদেরও এইরূপ সম্মানসূচক পোশাক অথবা ঘোড়া উপহার দিই।

১লা সফর সোমবার রাত্রে ভৃত্যদের অসাবধানতায় খাজা আবুল হাসানের বাড়ীতে ভীষণ আগুন লাগে। বাড়ীর লোকজন আগুন লাগার কথা জানতে পারার আগেই ও আগুন নেভাতে নেভাতে তাঁর অনেক সম্পত্তি পুড়ে নষ্ট হয়। খাজার মনকে প্রবোধ দেওয়া ও তাঁর ক্ষতিপূরণের জন্য আমি তাঁকে চল্লিশ হাজার টাকা পাঠাই।

একজন বিধবা স্ত্রীলোক আমার কাছে নালিশ জানায় যে মকারব খাঁ জোর করে তার কন্যাকে ক্যাম্বে বন্দর থেকে ধরে আনেন এবং তাঁর বাড়ীতে কিছুদিন রাখেন। তারপর সে তার কন্যার সন্ধান করতে গেলে মকারব খাঁ

জানান যে তার মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু ঠেকানোর কোনও উপায় ছিল না। আমি এই বিষয়ে তদন্ত করার আদেশ দিই। অনেক অনুসন্ধানের পর আবিষ্কার করি যে তাঁর একজন ভৃত্য এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। মকারব খাঁর মনসব অর্ধেক ধার্য করলাম। সেই কন্যাশোকগ্রস্তা স্ত্রীলোকটির একটা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম।

৭ই তারিখ, রবিবার নিসর্গে অমঙ্গল-সূচক গ্রহসন্নিবেশ হওয়ায় আমি সোনা, রূপা, অন্যান্য ধাতু, নানাপ্রকারের খাদ্যশস্য সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভাগ করে দিই।

৮ই তারিখ, সোমবার রাত্রে শেখ হোসেন সির্‌হিন্দি এবং শেখ মুস্তাফাকে —যাঁরা দরবেশ ও দরিদ্রের জীবন যাপন করার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছে— আমন্ত্রণ করে আনি। তাঁদের জন্য একটি উৎসব শুরু হয়ে যায়। সমবেত জনতা ক্রমে ক্রমে সমা ও ওয়াজদ্ (দরবেশ নৃত্য ও স্বতস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি) শুরু করে। সভায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। উৎসবের পর আমি প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় দিই।

মির্জা গাজি বেগ তারখান পুনঃ পুনঃ কান্দাহার দুর্গের সেনাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও তাদের মাসিক বেতন পাঠানোর জন্য নিবেদন করায় লাহোরের কোষাধ্যক্ষকে দুই লক্ষ টাকা পাঠানোর জন্য আদেশ দিই।

আমার রাজত্বকালের পঞ্চম বৎসর ১৯শে উরদিবিহিস্ত (৪ঠা সফর) বেহার প্রদেশের রাজধানী পাটনায় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। এই সুবার শাসক আফজল খাঁ তাঁর নতুন পাওয়া জায়গীর পরিদর্শনের জন্য পাটনা থেকে ৬০ ক্রোশ দূরে যান। যাওয়ার সময় পাটনার দুর্গ ও নগরের ভার শেখ বানারসি, দেওয়ান খিয়াম জইন খানি এবং কয়েকজন মনসবদারের ওপর দিয়ে যান। তাঁর ধারণা ছিল যে ঐদিকে কোনও শত্রু নাই। সেইজন্য নগর ও দুর্গরক্ষার জন্য যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল তা তিনি করেন নি। সেই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে 'আকে'র অধিবাসী কুতুব নামে একজন দুরভিসন্ধি-পরায়ণ রাজদ্রোহী অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি পাটনার নিকটবর্তী ভোজপুরে আসে। পরিধানে ভিক্ষুকের ন্যায় বস্ত্র, চোখের দৃষ্টিভঙ্গিটা যেন দরবেশের মত। সে এই দেশের লোক—যারা স্বভাবতই রাজদ্রোহী তাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে। তাদের বলে যে সেই হচ্ছে খসরু। সে কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছে। যদি তারা তাকে সাহায্য

করে ও এই ব্যাপার তার অনুকূলে নিষ্পত্তি হয় তাহলে তাদের তার রাজ্যের মন্ত্রীপদ দেবে। বাস্তবিকপক্ষে মিথ্যা স্তোক দিয়ে এইসব বেকুবদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয় যে সে সত্যই খসরু। এই মূর্খদের তার চোখের ওপরের কতকগুলি দাগ দেখিয়ে বলে যে বন্দীদশায় তার চোখ দুটি অন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল—সেইজন্যই এই দাগ। এই মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ কথায় বিশ্বাস করে কয়েকজন পদাতিক ও অশ্বারোহী তার সঙ্গে মিলিত হয়। তারা এই সংবাদ পায় যে আফজল খাঁ পাটনায় নেই। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা আক্রমণের উদ্যোগ করে। রবিবারের দুই তিন ঘণ্টা অতীত হওয়ার পর তারা বিনা বাধায় দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়। শেখ বানারসি তখন দুর্গে ছিল। সে এই সংবাদে হতভম্ব হয়ে দুর্গের ফটক বন্ধ করতে যায়। কিন্তু শত্রুরা দ্রুত অগ্রসর হয়ে আসায় সে আর ফটক বন্ধ করার সময় পায় না। সে ইলিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারের ফটক দিয়ে বেরিয়ে একটা নৌকা সংগ্রহ করে আফজল খাঁর কাছে যাওয়ার সঙ্কল্প করে। বিদ্রোহীরা অনায়াসেই দুর্গে প্রবেশ করে আফজল খাঁর জিনিসপত্র ও রাজকোষাগার দখল করে। কয়েকজন হতভাগ্য জীব যারা নগরে ও নিকটবর্তী জায়গায় সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সংবাদ আফজল খাঁর কাছে খরকপুরে পৌছায়। শেখ বানারসি ও ঘিয়াসও নদীপথে ইতিমধ্যে চলে আসে। নগর থেকে চিঠি আসে যে খসরু বলে যে নিজের পরিচয় দিয়েছিল সেই শয়তান প্রকৃতপক্ষে খসরু নয়। আফজল খাঁ আল্লার দয়া ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে আমার সৌভাগ্যবশতঃ অনতিবিলম্বে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে রওনা হলো। পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি পাটনার কাছে পৌছান। আফজল খাঁর আগমন সংবাদ এই শয়তানের কাছে পৌছালে তারা তাদের একজন বিশ্বাসী লোকের ওপর দুর্গের ভার দিয়ে অশ্বারোহী ও পদাতিকদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে চার ক্রোশ দূরে আফজল খাঁর সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে যায়। 'পুন পুন' নদীর তীরে যুদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর সেই দুর্ভাগ্যদের যুদ্ধের সাধ মিটে যায়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। হতবুদ্ধি হয়ে দ্বিতীয়বার সেই শয়তান কিছু লোক নিয়ে দুর্গের দিকে আসতে থাকে। আজফল খাঁ তাদের পেছন পেছন চলে আসেন। তাদের দুর্গফটক বন্ধ করার অবকাশ দেন না। হতচকিত বদমায়েশরা আফজল খাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করে সেটা সুরক্ষিত করে। সেখান থেকে তিন

প্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চালায়। তারা ত্রিশজনকে তীর নিক্ষেপ করে আহত করে। সঙ্গীরা জাহান্নমে যাওয়ার পর সেই মুখ্য শয়তান নিজে আশ্রয়ভিক্ষা করে আফজল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এই ব্যাপার বন্ধ করার জন্য সেইদিনই আফজল খাঁ তার প্রাণদণ্ড দেন এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা জীবন্ত অবস্থায় তাঁর হাতে পড়ে তাদের বন্দী করেন। এই সমস্ত সংবাদ একের পর এক আমার কানে পৌঁছায়। আমি আগ্রায় শেখ বানারসি, গিয়াস জৈন খানি এবং অন্যান্য মনসবদার যারা দুর্গ ও নগররক্ষায় গাফিলতি করেছে—ডেকে পাঠাই। তাদের চুল দাড়ি কামিয়ে, স্ত্রীলোকের পোশাক পরিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে আগ্রা নগরীর চারদিকে এবং বাজারে ঘুরিয়ে আনার আদেশ দিই—যাতে এই দৃষ্টান্ত দেখে অন্য লোক ভবিষ্যতে সাবধান হয়।

এই সময় পরভেজ ও যেসব আমীর দাক্ষিণাত্যের কাজে নিযুক্ত আছেন এবং যাঁরা সাম্রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁদের কাছ থেকে পরপর আবেদন আসছিল এই মর্মে যে আদিল খাঁ বিজাপুরী প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে মির জামালুদ্দিন হোসেন ইনজুকে তাঁর কাছে পাঠানো হোক। কারণ তাঁর (ইনজু) কথার ওপর দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের বিশ্বাস আছে। তিনি নিজে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের মনের ভীতি দূর করলে আদিল খাঁ—যিনি রাজানুগত্য ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের পথই বেছে নিয়েছেন—ওদিকের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবেন। তিনি ওদিককার শাসকদের মনে যে ভয় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা দূর করে রাজকীয় অনুগ্রহলাভের ভরসা দিতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে এই মাসের ১৬ই তারিখ উল্লিখিত মিরকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দাক্ষিণাত্যে পাঠাই।

ইফ্‌তিকার খাঁ বাংলায় বেশ ভাল কাজ করেছেন। সেখানকার শাসকের সুপারিশে তাঁর পদবৃদ্ধির আদেশ দিই। ২৮শে তারিখ আবদুল্লা খাঁ ফিরোজজং এক আবেদন পাঠান। তাঁর সঙ্গে যেসব কর্মচারীকে রাণার বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন আগ্রহী কর্মচারীর পক্ষে সুপারিশ ছিল। খজনিন খাঁ জালওয়ারি কাজে সব চেয়ে বেশী পারদর্শিতা প্রদর্শন করায় তার মনসবের পনেরোশ পদাতিক ও তিনশ অশ্বারোহীর সংখ্যা আরও পাঁচশ পদাতিক ও চারশ অশ্বারোহীর বাড়িয়ে দেওয়া হলো। অনুরূপ ভাবে অন্যান্যদেরও তাদের কাজের তারতম্য অনুসারে পদবৃদ্ধির আদেশ দেওয়া হয়।

যে লোককে কালো পাথরের সিংহাসন আনার জন্য এলাহাবাদ পাঠানো হয়েছিল সে মিজর মাসের ৪ঠা তারিখ, বুধবার (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৬১০) ফিরে আসে। পাথরের সিংহাসনটি অতি সাবধানে অক্ষত অবস্থায় নিয়ে এসেছিল। বাস্তবিকপক্ষে সিংহাসনটি প্রস্তরখণ্ডদিয়ে অদ্ভুত ভাবে তৈরী। যেমন কালো এর রং তেমনি উজ্জ্বল এর দ্যুতি, অনেকে বলে এ এক জাতের পরশ পাথর। লম্বায় এটা চার হাতের চেয়ে এক হাতের এক অষ্টমাংশ কম। প্রস্থে আড়াই হাত এক তসা (তসা—এক ইঞ্চির এক-তৃতীয়াংশ) এবং ৩ তসা (এক ইঞ্চি) পুরু। আমি খোদাইকারদের কয়েকটি কবিতার পদ এর পাশে খোদাই করতে আদেশ করি। আলাদা ভাবে এই রকম পাথরের গায়ে কবিতা খোদাই করে এই সিংহাসনে জুড়ে দেয়। আমি প্রায়ই এই সিংহাসনে বসি।

এই মাসের ১২ই তারিখ খান জাহানের কাছ থেকে সংবাদ আসে যে আমার আদেশানুযায়ী মহবত খাঁর সঙ্গে খানখানান দরবারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন এবং মির জালাহুদ্দিন হোসেন—যাঁকে দরবার থেকে বিজাপুর যাওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়—বুরহানপুর থেকে আদিল খাঁর ভকিলদের সঙ্গে বিজাপুর রওনা হয়ে গিয়েছেন।

এই মাসের ২১শে তারিখ আমি মূর্তজা খাঁয়ের পদোন্নতির আদেশ দিয়ে আমার সাম্রাজ্যের সব চেয়ে বড় সুবা পাঞ্জাবের সুবেদার নিযুক্ত করি। তাঁকে একটি বিশেষ ধরনের শাল উপহার দিই।

মুলতানের সুবেদার তাজ খাঁকে কাবুলের শাসকপদে নিযুক্ত করে তাঁর মনসবের তিন হাজার পদাতিক ও দেড় হাজার অশ্বারোহীর সঙ্গে আরও পাঁচশ অশ্বারোহী বাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিই। আবদুল্লা খাঁ ফিরোজ জংএর অনুরোধে রাণা শঙ্করেরও পদোন্নতি হয়।

মহবত খাঁকে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত আমীরদের সৈন্যসংখ্যা নিরূপণ করার পর খানখানানকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে ফেরার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আগ্রার কাছাকাছি পৌছিয়ে খানখানানকে পেছনে ফেলে আমার দরবারে পৌছিয়ে আমার সাক্ষাৎলাভ করার সৌভাগ্য ও সম্মানলাভ করেন। কয়েকদিন পর আবান মাসের ১২ই তারিখ খানখানান্ আগ্রায় পৌছান ও আমার সাক্ষাৎলাভ করেন। অনেক অনুগত ব্যক্তি আমার নিকট তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানা অভিযোগ পাঠালে আমি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হই। আমার মনে হয় যে আমি তাঁকে যেরূপ অনুগ্রহ বে দেখিয়েছি এবং

আমার মাননীয় পিতার আমলেও যে অনুগ্রহ তিনি পেয়েছেন তাতে কোনও ফলই লাভ হয়নি। আমি তাঁকে দাক্ষিণাত্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করে স্থলতান পরভেজ ও অন্যান্য আমীরদের সঙ্গে পাঠাই। বুরহানপুরে পৌঁছানোর পর তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেননি। অল্প খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যথোচিত সংস্থান না করেই তিনি স্থলতান পরভেজ ও তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে 'ঘাটে'র নিকট অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। সর্দারদের সহযোগিতার অভাব, তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা এবং নানা বিরোধী মতবাদের সংঘর্ষে এমন অবস্থার স্বষ্টি হয় যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে ওঠে। অনেকগুণ মূল্য দিয়েও এক 'মান' শস্যসংগ্রহ সম্ভব হয়নি। সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলার স্বষ্টি হয় যে কিছুই ঠিকভাবে চলেনি। ফলে ঘোড়া, উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু মারা যায়। বেকায়দায় পড়ে শত্রুর সঙ্গে কোনও রকমে সন্ধি স্থাপন করে তিনি পরভেজ ও সেনাবাহিনীকে বুরহানপুরে ফিরিয়ে আনেন। সাম্রাজ্যের শুভানুধ্যায়ীরা বুঝতে পেরেছিলেন—খানখানানের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সময়োচিত কার্য না করার দরুন এইরূপ বিশৃঙ্খলা ও মতভেদের স্বষ্টি হয়েছে। সেই কথা তাঁরা দরবারে জানান। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে না করলেও আমার মনে অবশেষে একটা সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এই সময় খান জাহানের নিকট থেকে এই মর্মে আবেদন আসে যে এই সমস্ত গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার কারণ হচ্ছে খানখানানের বিশ্বাসঘাতকতা। যদি আমি তাঁকে দরবারে তলব করে এনে তাঁকে এখানকার কাজের সম্পূর্ণ ভার দিই এবং তার সঙ্গে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাই তাহলে যাকে আমি শৈশবকাল থেকে বড় করে তুলেছি সেই ক্রীতদাস (খান জাহান) দুই বছরের মধ্যে সমস্ত দাক্ষিণাত্য শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবে, কান্দাহার ও অন্যান্য দুর্গ দরবারের ভৃত্যদের কর্তৃত্বের মধ্যে আনবে ও বিজাপুর প্রদেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করবে। যদি এই সমস্ত কাজ সে ঐ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না করতে পারে তাহলে তাকে যেন ভবিষ্যতে আমার দর্শনলাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করি। কর্তব্য সম্পাদনে বিফল হলে সে দরবারের কারও কাছেই আর মুখ দেখাবে না।

যখন খানখানান্ এবং সর্দারদের মধ্যে সম্বন্ধ এমন তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন আমি খানখানানকে আর সেখানে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। খান জাহানকে ওখানকার অধিনায়কের পদে নিযুক্ত করে খানখানানকে দরবারে

ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দিই। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর ওপর আস্থার অভাব এবং অনুগ্রহের দৈন্যের ব্যাপারের মূলীভূত কারণগুলি আমার মনে তখনও খুব গভীর রেখাপাত করেনি। তাঁর প্রতি আমার অনুরাগ ও বিরাগ বাড়বে কি কমবে তা যখন সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে আসবে তখনই বোঝা যাবে।

কিছুদিন পূর্বে সুলতান হোসেন মির্জা সফাইয়ের পুত্র মির্জা মুজাফ্ফর হোসেনের কন্যার সঙ্গে খুরামের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়। ১৭ই আজান বিবাহ সভার আয়োজন হলে আমি বাবা খুরামের প্রাসাদে যাই। সে রাতটা সেখানেই থাকি। আমিরদের অনেককেই সম্মানসূচক পোশাক দিই। যাদের গোয়ালিয়র দুর্গে আটক করে রেখেছিলাম তাদের অনেককেই বিশেষ করে হাজি মিরককে মুক্তি দিই। ইসলাম খাঁ খালিসা (খাসমহল) পরগণাগুলি থেকে এক লক্ষ টাকা আদায় করেন। তিনি সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানে থাকায় এবং তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য এই টাকা পুরস্কারস্বরূপ তাঁরই হাতে তুলে দিই। আমার বিশ্বাসী লোকেদের হাতে কিছু সোনা-রূপা, কিছু কিছু জড়োয়ার অলঙ্কার এবং খাদ্যশস্য আগ্রার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। এইদিনই খানজাহানের নিকট থেকে সংবাদ এলো যে খানখানানের পুত্র ইরাজ সম্রাটপুত্রের কাছ থেকে ছুটি পেয়েছে। আদেশমত তাকে দরবারে পাঠানো হলো। বিজাপুরের আবুল ফথের সম্বন্ধে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে খানজাহান নিবেদন করেছে যে ঐ ব্যক্তিটি অভিজ্ঞ। তাকে যদি এখন আগ্রায় পাঠানো হয় তাহলে দাক্ষিণাত্যের যে সব সর্দারদের কথা দেওয়া হয়েছে তারা হতাশ হবে। সেইজন্য খানজাহান তাকে ঐখানেই নজরবন্দী করে রাখতে চায়।

পরভেজের কাজে নিযুক্ত কেশোদামকে পাঠানোর জন্য এক আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশে জানানো হয় যে তাকে আগ্রায় পাঠানোর ব্যাপারে যদি কোনও বাধা ওঠে তাহলে পরভেজের ইচ্ছা থাক বা না থাক খানজাহান যেন নিশ্চয়ই তাকে পাঠায়। এই কথা শোনামাত্র পরভেজ তাকে বিদায় দেয়। খানজাহানকে সে বলে—"আমার মুখের এই কয়েকটি কথা তুমি নিবেদন করো। আমি আমার অস্তিত্ব ও জীবন আমার প্রত্যক্ষ দেবতার (জাহাঙ্গীর) কাজে বিসর্জন দিতে পারি। কেশোদামের জীবনমরণ তো আমার কাছে অতি তুচ্ছ। তাহলে কেন তাকে পাঠানোর ব্যাপারে আমি বাধা দেব? যখন তাঁরা (সম্রাট) আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের কাউকে কোনও কারণে

ফিরে যাওয়ার জন্য বলেন, তখন অন্যান্যদের মনে নিরাশা ও ভীতির সঞ্চার হয় এবং এইদিকে এই ভাবই প্রকাশ পায় যে আমাদের প্রভু ও কিব্‌লার বিরাগভাজন হয়েছি। সমস্ত বিষয়েই সম্রাটের আদেশ বলবৎ থাকবে।

যেদিন থেকে আমেদনগর দুর্গ আমার পরলোকগত ভ্রাতা দানিয়ালের চেষ্টায় বিজয়ী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সেই দিন থেকে এ পর্যন্ত এইস্থানে পরম সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল শা তমাস্‌পের আত্মীয় খাজা বেগ মির্জা সাফাইয়ের হাতে থাকে। দক্ষিণীদের বিদ্রোহ চরম অবস্থায় উঠলে ও এই দুর্গ অবরুদ্ধ হলে তিনি দুর্গরক্ষার ব্যাপারে কোনও রকম চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কাউকে অবহেলা করেননি। যখন খান্‌খানান্‌, আমিররা ও অন্যান্য নেতারা পরভেজের পাশে থেকে বিদ্রোহীদের বিতাড়নের জন্য বুরহানপুর ছিলেন এবং যখন আমিরদের মধ্যে মতপার্থক্য এবং বিবাদ, খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্যের অভাবের দরুণ বিপুল সৈন্যবাহিনী পরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে এবং তাদের বিপথে পাহাড়ী জায়গা ও গিরিসঙ্কটের মধ্যে টেনে আনা হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে, এমন অবস্থায় পড়ে যে তখন তারা একখানা রুটির জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, এই অবস্থায় তারা উপায়ন্তর না দেখে উদ্দেশ্য পূরণ না করেই ফিরে আসে। আমেদনগর দুর্গরক্ষীরা এই সেনাবাহিনীর কাছ থেকেই সাহায্য পাবে আশা করেছিল। কিন্তু তারা রাজসৈন্যবাহিনীর দুর্দশার কথা শুনে হতাশ হয়ে পড়ে এবং অবিলম্বে দুর্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য গণ্ডগোল শুরু করে। খাজা বেগ মির্জা এই ব্যাপার জানতে পারলে তাদের শান্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কিন্তু তাঁর চেষ্টা বিফল হয়। তিনি একটা চুক্তি করে দুর্গ ত্যাগ করে বুরহানপুর চলে আসেন এবং সম্রাটপুত্রের কাছে উপস্থিত হন। তাঁর বুরহানপুর আগমন সংবাদ আমার কাছে পৌছায়। এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁর বীরত্ব ও আনুগত্যের লেশমাত্র অভাব ছিল না। তাঁর পাঁচহাজারি মনসবদারি পদ স্থায়ী করে একটি জায়গীর দেওয়ার আদেশ দিলাম।

দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন আমির আবেদনে জানান যে মীর জামালুদ্দিন হোসেন ২১শে সাবান বিজাপুর গিয়েছেন। আদিল খাঁ তাঁর ভকিলাকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ ক্রোশ দূরে পাঠান এবং স্বয়ং তিন ক্রোশ এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে তাঁর আবাসে নিয়ে যান।

আমার শিকারে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় জ্যোতিষীদের ধার্য শুভ সময়ে আমার রাজ্যাভিষেকের পঞ্চাশ বৎসরে ১০ই আজর (১৫ই রমজান)

শুক্রবার রাতের এক প্রহরে ছয় ঘড়ি অতীত হওয়ার পর যাত্রা করি এবং প্রথম শিবির নগরের নিকটবর্তী উদ্যান দরজা-উদ্যানে আসি। এই সময় মীর আলি আকবরকে দুই হাজার টাকা ও গরম আলোয়ান উপহার দিয়ে নগরে ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় দিই, মাঠের শস্য এবং চাষ যাতে আমার লোকেরা পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট না করে সেজন্যে আদেশ দিই যে আমার বেশীর ভাগ লোকই নগরেই থাকবে, কেবল শিকারে যাদের একান্ত প্রয়োজন তারা এবং আমার নিজস্ব পরিচারক আমার সঙ্গে যাবে। নগরের ভার খোজা জাহানের ওপর দিয়ে তাকে বিদায় দিই। ১৪ই আজর সৈয়দ খাঁর পুত্র সাদুল্লা খাঁকে একটি হস্তী দিই। কাশিম খাঁর পুত্র হাসিম খাঁ উড়িষ্যা থেকে ৪৪টি হস্তী উপঢৌকন পাঠান। তাদের আমাকে দেখানো হয়। এর মধ্যে একটি খুবই ভাল ও শান্ত। এইটিকে আমার নিজস্ব হস্তীশালায় রাখার আদেশ দিই।

২৪শে তারিখ সূর্যগ্রহণ হয়। গ্রহণের মন্দ ফল দূর করার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুতে আমার ওজন নেওয়া হয়। ওজন হলো ১৮০০ তোলা স্বর্ণ ও ৪৯০০ টাকা। সোনা, টাকা, নানা রকমের সবজি; নানা জাতির পশু যেমন হাতি, ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি সহায়হীন উপযুক্ত ব্যক্তি এবং আগ্রার নিকটবর্তী স্থানের অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে আদেশ দিই।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ দখল করার জন্য পরভেজের অধিনায়কত্বে ও খান্‌খানান্ এবং অন্যান্য আমিরদের—যেমন রাজা মানসিংহ, খানজাহান, আমির-উল-উমরা আসফ খাঁ, অন্যান্য মনসবদার এবং উপজাতিদের সর্দারদের নেতৃত্বে যে অভিযান চালানোর ব্যবস্থা করা হয় তা এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় তারা অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এসে বুরহানপুর পৌছায়। গোপন তথ্য সংগ্রহকারী গোয়েন্দা কর্মচারীদের এবং সংবাদ লেখকরা যারা সত্য কথাই বলে থাকে—দরবারে এই মর্মে তথ্য পাঠাতে লাগলো যে সেনাবাহিনীর ধ্বংসের অনেক কারণ থাকলেও প্রধান কারণ আমিরদের মধ্যে মতের অমিল বিশেষ করে খান্‌খানানের বিশ্বাস-ঘাতকতা।

আমার মনে হলো এই বিপুল ক্ষতি পূরণের জন্য আর একটি নতুন শক্তিশালী বাহিনী খান আজমের সঙ্গে অবিলম্বে পাঠাতে হবে যাতে যে সব কুকার্য আমিরদের মতপার্থক্যে ঘটে গেছে বলে সংবাদ এসেছে তার ক্ষতি-পূরণ হতে পারে। খান আলম, ফরিদুল খান বরলাম, ইউসুফ খান (হোসেন খান তুকরিয়ার পুত্র), আলি খান নিয়াজি, বজবাহাদুর কলমকে এবং

অন্যান্য মনসবদারদের দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ খান আজমের সঙ্গে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত করলাম। এই ব্যবস্থাও স্থির হলো যে সব আহদি এই কাজে নিযুক্ত হয়েছে তারা ছাড়াও আরও দুই হাজার তাঁর সঙ্গে যাবে যাতে অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা বারো হাজার হয়। তাঁর সঙ্গে ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং কতকগুলি হাতি এবং তাঁর নিজস্ব খরচের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে বিদায় করা হয়। দেওয়ানি দপ্তরে এই আদেশ যায় যে তাঁকে দেওয়া টাকা তাঁর জায়গীর থেকে আদায় করে নিতে হবে। খান আজম এবং সেনাবাহিনীকে বুরহানপুর পৌঁছে দেওয়ার ভার মহব্বত খাঁর ওপর অর্পণ করি। তাঁকে আদেশ দিই—তিনি যেন আমার সেনাবাহিনীর ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং সেখানকার আমিরদের খান আজমের নিয়োগপত্র দেখিয়ে আমার এই আদেশ জানান যে সকলকে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর উপদেশ মত কাজ করতে হবে। ঐদিককার সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং ওদিককার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে তিনি খানখানানকে সঙ্গে নিয়ে দরবারে ফিরে আসেন।

সাওয়াল মাসের ৪ঠা তারিখ প্রায় দিনের শেষে চিতা শিকারে বেরোই। স্থির করেছিলাম—এই দিন (রবিবার) এবং বৃহস্পতিবার কোনও পশুহত্যা করবো না, পশুমাংস খাব না—বিশেষ করে রবিবারে। কারণ এই যে আমার বাবা এই দিনটিকে বিশেষভাবে সম্মান করতেন। তিনি এই দিন কোনও রকম মাংস গ্রহণ করতেন না। ঐদিন পশুবধ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কারণ রবিবার রাত্রে তাঁর শুভ জন্ম হয়। তিনি এই কথা বলতেন যে অন্ততঃ একটা দিন পশুরা জল্লাদ স্বভাবের মানুষের হাত থেকে বাঁচুক। বৃহস্পতিবার আমার রাজ্যাভিষেকের দিন। ঐদিনেও পশুবধ নিষেধাজ্ঞা জারি করি। এমন কি শিকারে গেলেও আমি তীর অথবা বন্দুকের গুলি বন্যপশুর দিকে না ছোঁড়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করি।

আমার ঘনিষ্ঠ সহচর অনুপ রায় চিতা শিকার করার জন্য কয়েকজন শিকার-সঙ্গীর পুরোবর্তী হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সে একটা গাছের ওপর কয়েকটি চিতা দেখতে পায়। একটা ধনুকে ভোঁতা তীর লাগিয়ে সেই চিতাগুলির দিকে যায়। সেই গাছটির কাছে একটা অর্ধেক খাওয়া ষাঁড় দেখতে পায়। তারই কাছে একটা বিশালদেহ বলিষ্ঠ বাঘ উঠে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে। দিনের তখন দুই ঘড়িও অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু আমার বাঘ শিকারে প্রবল

আগ্রহ থাকায় সে তার সঙ্গীদের নিয়ে বাঘটিকে ঘিরে ফেলে এবং তাদেরই মধ্যে একজনকে দিয়ে এই সংবাদ আমার কাছে পাঠায়। সেই সংবাদ শোনা মাত্র আমি উত্তেজিত হয়ে দ্রুতগতিতে ঘোড়ায় চড়ে চলে আসি।

বাবা খুরাম, রামদাস, ইতমাদ রায়, হায়াৎ খাঁ এবং আরও দুই-একজন আমার সঙ্গে আসে। সেখানে পৌঁছিয়ে বাঘটিকে একটা গাছের তলায় দাঁড়ানো দেখতে পাই। তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকেই গুলি করবো মনে করি। কিন্তু ঘোড়াটার অস্থির ভাব দেখতে পেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে লক্ষ্য ঠিক করে গুলি ছুঁড়ি। আমি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, বাঘটি নীচে ছিল। আমি বুঝতে পারিনি, গুলিটি তার গায়ে লেগেছে কিনা। উত্তেজনার মুহূর্তে আমি আবার বন্দুকের গুলি ছুঁড়ি। মনে হলো গুলিটা বাঘের গায়ে লেগেছে। বাঘটির সামনেই ছিল প্রধান শিকারী। তার হাতের কব্জিতে বাঁধা ছিল শিকারী বাজ। বাঘটি তাকে আক্রমণ করে আহত করে। তারপর তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। এই অবস্থায় একটা তেপায়ার ওপর আর একটা বন্দুক রেখে লক্ষ্য স্থির করি।

অনুপ রায় অন্য শিকারীদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কটিবন্ধে ছিল তরবারি, হাতে ছিল ডাণ্ডা। বাবা খুরাম ছিল কিছুদূরে আমার বাঁ পাশে। রামদাস ও অন্যান্য ভৃত্য ছিল তার পেছনে। একজন শিকারী আর একটি বন্দুকে গুলি ভরে আমার হাতে দেয়। আমি গুলি ছুঁড়তে যাব এমন সময় বাঘটি গর্জন করতে করতে আমাদের দিকে ধেয়ে এসে আক্রমণ করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করি। গুলিটা বাঘের মুখ ও দাঁতের মধ্যে ঢুকে যায়। বন্দুকের আওয়াজে বাঘটি আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। ভৃত্যরা এক জায়গায় ভিড় করছিল। তারা বাঘের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে একজনের ওপর আর একজন পড়ে। আমিও তাদের ঠেলাঠেলিতে ও ভয়ে আমার জায়গা থেকে কয়েক পা সরে মাটিতে পড়ে যাই। আমি নিশ্চিত যে দুই-তিনজন আমার বুকের ওপর পা দিয়ে আমাকে ডিঙ্গিয়ে চলে যায়।

এই সময় বাঘটা যারা বাঁদিকে ছিল তাদের দিকে ধাওয়া করে। অনুপ রায় অন্য সকলকে ঠেলে দিয়ে বাঘের দিকে এগিয়ে যায়। বাঘটি সমান তেজের সঙ্গে তাকে আক্রমণ করতে আসে। সেও পুরুষোচিত বীরত্বে তার হাতে যে ডাণ্ডা ছিল সেটা দুই হাতে ধরে বাঘের মাথায় সজোরে দুইবার আঘাত করে। বাঘ মুখব্যাদান করে অনুপ রায়ের দুই বাহু একসঙ্গে চেপে ধরে

এমন ভাবে কামড়ায় যে তার দাঁত দুই হাতেই বসে যায়। তবে তার হাতে লাঠি ও বালা থাকায় হাত দুটো একেবারে ছিন্ন হয় না। বাঘের আক্রমণের ধাক্কায় অনুপ রায় বাঘের সম্মুখের পায়ের মধ্যে পড়ে আর তার মাথা আর মুখ বাঘের বুকের তলায় ঢুকে যায়। এই সময় বাবা খুরাম ও রামদাস অনুপ রায়ের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। খুরাম তার তরবারি দিয়ে বাঘের কটিদেশে আঘাত করে। রামদাসও দুইবার তরবারির আঘাত করে। একটা ঘা পড়ে বাঘের ঘাড়ে। মোটের ওপর ব্যাপারটা খুবই উত্তেজক হয়ে উঠেছিল। হায়াৎ খাঁও তার হাতের লগুড় দিয়ে বাঘের মাথায় কয়েকবার আঘাত করে। অনুপ রায় জোর করে বাঘের মুখ থেকে তার হাত দুটো বের করে নেয়। তারপর তার মুখে দুই-তিনবার মুষ্ট্যাঘাত করে একপাশে কাত হয়ে হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে দাঁড়ায়। বাঘের মুখ থেকে হাত বের করার সময় বাঘের দাঁতে হাতের চামড়ার খানিকটা ছিঁড়ে যায়। বাঘের দুই পায়ের থাবা তার কাঁধ বিদ্ধ করে। সে উঠে দাঁড়ালে বাঘও উঠে দাঁড়ায় এবং নখর দিয়ে তার বুকে ক্ষত করে দেয়। এই ঘা তাকে কিছুদিন কষ্ট দিয়েছিল। মাটি অসমতল থাকায় তারা দুই মল্লযোদ্ধার মত গড়াগড়ি খেতে থাকে।

আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানকার মাটিটা ছিল সমতল। অনুপ রায় বলে পরমশক্তিমান পরমেশ্বর তাকে এমন বুদ্ধি দিয়েছিলেন যাতে সে বাঘটিকে অন্যদিকে গড়িয়ে দিতে পেরেছিল। তারপরই যে কি হয়েছে আর কিছুই সে জানে না। এই সময় বাঘটা তাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে থাকে। সেই বিমূঢ় অবস্থাতেই সে তরবারি তুলে বাঘকে অনুসরণ করে। তার মাথায় আঘাত করে। বাঘটা মুখ ফিরোলে তার মুখে আবার আঘাত করে যার ফলে তার দুটো চোখই কেটে যায় ও তার ভুরুর চামড়া তরবারির আঘাতে ছিন্ন হয়ে চোখের ওপর ঝুলে পড়ে। এইরকম অবস্থা যখন ঘটছে সেই সময় 'সাথি' নামে একজন আলোবরদার আলো জালানোর সময় হয়েছে দেখে সেইদিকে আসতে থাকে। ভবিতব্য তাকে বাঘের সামনেই টেনে আনে। বাঘ একটি থাবার আঘাতে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। বাঘের থাবার আঘাতে পড়ে যাওয়া আর প্রাণত্যাগ করা একই কথা। এই সময় অন্যান্য লোকেরাও এসে পড়ে এবং বাঘের ব্যাপারের ইতি করে।

অনুপ রায় আমাকে রক্ষা করার জন্য কিভাবে তার জীবন উৎসর্গ করতে

যায় তা আমার নিজের চোখে দেখা। সে তার ক্ষতের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য অর্জন করে। আমি তাকে 'অনিরাই সিংহদলন' এই উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি। হিন্দী ভাষায় 'অনিরায়' মানে সেনাবাহিনীর নেতা এবং 'সিংহদলন' হচ্ছে ব্যাঘ্রহন্তা। আমার নিজের একটি তরবারি তাকে উপহার দিয়ে তার 'মনসব' বৃদ্ধি করে দিই।

খান আজমের পুত্র খুরামকে জুনাগড়ের শাসকপদে নিযুক্ত করার পর 'কামিল খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ৩রা জিল্কদ রবিবার আমি মাছ ধরায় কাটাই। আমার সামনেই মাছগুলি আমির ও অধিকাংশ ভৃত্যদের ভাগ করে দেওয়া হয়। যে মাছের আঁশ নাই সে মাছ আমি খাই না। তার কারণ এই নয় যে সিয়া সম্প্রদায়ের মৌলানারা আঁশহীন মাছকে ধর্মবিরুদ্ধ খাদ্য বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আমার অপ্রবৃত্তির কারণ হচ্ছে এই যে প্রাচীন লোকদের মুখে শুনেছি এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েও জানতে পেরেছি যে এই জাতীয় মাছ মৃত জন্তুর মাংস খায় কিন্তু আঁশওয়ালা মাছ তা খায় না। এই কারণে আঁশহীন মাছ খাওয়া আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সিয়ারাই জানে তারা কেন এই মাছ খায় না এবং কোন্ কারণে এ মাছ খাওয়া ধর্মবিরুদ্ধ মনে করে।

আমার গৃহপালিত উট যেটি শিকারে আমার সঙ্গে ছিল সে তার পিঠে হিন্দুস্থানি ৪২ মণের পাঁচটি নীল গাই বহন করে নিয়ে যায়।

হেকিম হামিদ গুজরাটিকে ডেকে পাঠাই। মূর্তজা খাঁ তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করেছিলেন। তিনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন। চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতার চেয়েও তাঁর সদ্‌গুণ এবং সাধুতা অনেক বেশী। আমার সঙ্গে তিনি কিছুদিন থাকেন। যখন জানতে পারি যে তিনি ছাড়া গুজরাটে আর কোনও চিকিৎসক নাই এবং যখন তিনি নিজেই ফিরে যাওয়ায় ইচ্ছুক দেখলাম তখন তাঁকে আর তাঁর পুত্রদের এক হাজার টাকা, কয়েকখানি শাল উপহার দিয়ে তাঁর ভরণপোষণের জন্য একটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দিলাম। তিনি মনের আনন্দে দেশে ফিরে গেলেন।

১০ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার কুরবানি উৎসবের দিন। এইদিন পশুবধ নিষিদ্ধ থাকায় আদেশ দিই যে পরদিন শুক্রবার সকলে কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট পশু জবাই করবে। আমি নিজহাতে তিনটি ভেড়া জবাই করে শিকারে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় উঠি এবং যখন ফিরি তখন রাতের ছয়ঘড়ি অতিবাহিত হয়েছে। এইদিন নয় মণ পঁইত্রিশ ওজনের একটি নীলগাই মারা পড়ে।

গেল দুই বছর আমি এই জায়গাতেই ঘুরে বেড়াতে ও শিকার করার জন্য এসেছিলাম। প্রত্যেকবারই এই নীলগাইটিকে গুলি করি। কিন্তু আঘাত ঠিক মর্মস্থলে না লাগায় সে মাটিতে না পড়ে পালিয়ে যায়। এবারও আমি শিকারক্ষেত্রে এই নীলগাইটি দেখতে পাই। পাহারাদাররা দেখে চিনতে পারে যে এই নীলগাই আমার বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে দুইবারই পালিয়ে ছিল। এইদিন আবার তার ওপর তিনটি গুলি ছুঁড়ি। কিন্তু বৃথা হলো।

আমি পায়ে হেঁটে এটিকে অনুসরণ করে তিন ক্রোশ চলে আসি কিন্তু ধরতে পারি না। অবশেষে আমি শপথ নিলাম যে যদি এই নীলগাই মাটিতে পড়ে, আমি এর মাংস রন্ধন করিয়ে খাজা মুইনউদ্দিনের আত্মার মঙ্গলার্থে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করবো। আমি আমার মহামান্য পিতার নামেও একটি টাকা ও একটি মোহর মানত করি। কিছুক্ষণ পরেই নীলগাইটা অবসন্ন হয়ে পড়ে। আমি তাড়াতাড়ি মাথার কাছে যাই। আমার লোকদের আদেশ দিই যে মাংসটি ধর্মসিদ্ধ করার জন্য আল্লার নামে সেই জায়গাতেই জবাই করতে হবে। নীলগাইটিকে শিবিরে এনে আমার শপথ পূরণ করি। নীলগাইয়ের মাংস রান্না করে এবং মিষ্টির জন্য এক মোহর এক টাকা ব্যয় করে দরিদ্র ও ক্ষুধার্তদের ডাকিয়ে এনে আমার সম্মুখে তাদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করি।

দুই-তিনদিন পরে আবার একটি নীলগাই দেখতে পাই। আমি যতই চেষ্টা এবং ইচ্ছা করি না কেন যে এক জায়গায় দাঁড়াবে আর তাকে গুলি করবো—কিন্তু আমি কোনও স্থবিধাই পেলাম না। কাঁধে বন্দুক নিয়ে আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার পেছনে পেছনে গেলাম। কিন্তু তাকে শিকার করতে সক্ষম হবো না ভেবে হতাশ হলাম। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—'খাজা, এই নীলগাইটি তোমাকেই উৎসর্গ করলাম'। আমার এই কথা উচ্চারণ আর নীলগাইটিরও বসে পড়ার ব্যাপার একই সঙ্গে ঘটলো। আমি তাকে গুলিবিদ্ধ করলাম। আদেশ দিলাম—এই নীলগাইয়ের মাংসও রান্না করে দরিদ্রদের খাওয়ানো হবে।

১৯শে জিলহজ্জ শনিবার আবার মাছ ধরি। এবার ৩৩০টি মাছ ধরা পড়ে। এ মাসের ২৮শে বুধবার রূপবাসে শিবির ফেলি। আমার নির্বাচিত শিকার ক্ষেত্রের মধ্যে এটি একটি। আদেশ ছিল যে এখানে কিংবা আশেপাশে অন্য কেউ শিকার করতে পারবে না। তার ফলে অনেক হরিণ এখানে জড়ো হয়েছিল। এমন কি তারা নিকটবর্তী লোকালয়ে গেলেও কেউ তাদের বিরক্ত

করেনি। এই জনশূন্য ক্ষেত্রে দুই-তিনদিন শিকার করি। শিকারি চিতা দিয়ে অনেক হরিণ মারি।

আমার নগরে ফেরার সময় আসন্ন হওয়ায় পথে দুইবার বিশ্রাম নিয়ে ২রা মহরম, বৃহস্পতিবার (১৭ই মার্চ, ১৬১১) নগরের নিকটবর্তী আবদুর রজ্জাক মামুরের বাগানে আসে। এইদিন রাত্রে অনেক কর্মচারী—যেমন খাজা জাহান, দৌলত খাঁ এবং আরও অনেকে যাঁরা রাজধানীতে ছিলেন এখানে এসে আমাকে শ্রদ্ধা জানান। ইরাজকে আমি দাক্ষিণাত্য সুবা থেকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলাম—সেও এই সময় আমার দরজা চুম্বন করার সৌভাগ্য-লাভ করে। রবিবারও এই বাগানেই অবস্থান করি। এই দিন আবদুর রজ্জাক তার নিজের উপঢৌকন দেয়। দিনটি শিকারের শেষ দিন হওয়ায় আদেশ দিই যে এইবারকার শিকারের সময় কতগুলি পশু মারা হয়েছে তার হিসাব দিতে হবে। আমার শিকার আজর মাসের ৯ই তারিখ থেকে পঞ্চম বর্ষের ২৯শে ইস্‌ফান্‌দার-মুজ পর্যন্ত চলে। এই সময়ে ১২টি বাঘ, গার্ডজন (এক প্রকারের হরিণ) ১, চিকারা ৪৪, কুচপাচা ১, হরিণ শাবক ২, কৃষ্ণসার ৬৮, হরিণী ৩১, শেয়াল ৪, কুরারা হরিণ ৮, পাতল (?) ১, ভালুক ৫, হায়ানা ৩, খরগোস ৬, নীলগাই ১০৮, মাছ ১০৯৬, ঈগল ১, বাসটার্ড (?) ১, বন মোরগ ৫, হিরণ ৫, ঠিঠ (?) ১, তিতির ৫, মোট—১৪০৮ শিকার করা হয়।

২২শে ইস্‌ফানদার মুজ (৪ঠা মহরম) আমি হস্তীপৃষ্ঠে রাজধানীতে প্রর্ত্যাবর্তন করি। আবদুর রজ্জাকের উদ্যান থেকে নগরের দূরত্ব এক ক্রোশ কুড়ি তনবে। আমি ১৫০০ টাকা জনতার মধ্যে ছিটিয়ে দিই। নির্দিষ্ট শুভ সময়ে প্রাসাদে প্রবেশ করি। নওরোজ উৎসবের মত বাজার কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছিল। শিকারে যাওয়ার সময় খাজা জাহানকে আদেশ দিয়ে যাই যে জেনানা মহলে আমার বসার উপযুক্ত একটি অট্টালিকা তৈয়ারি করতে হবে। উক্ত খাজা তিন মাস সময়ের মধ্যে অতি সুন্দর বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেলেছে। সত্যই সে তার কার্যক্ষমতার পরিচয় অত্যন্ত বিনীতভাবে দিয়ে আমার আদেশ মান্য করেছে। পথের ধুলো নিয়েই আমি সেই স্বর্গসদৃশ অট্টালিকায় প্রবেশ করি। আবাসটির চারদিক ঘুরে দেখি। এটা আমার পছন্দমাফিক হয়েছে। খাজা জাহানের কাজের প্রশংসা করে খুব তারিফ করি। এই নতুন গৃহেই তার উপঢৌকন দ্রব্য আমার সামনে ধরে দেয়। কিছু দ্রব্য আমি গ্রহণ করি। অবশিষ্টগুলি তাকেই উপহার দিই।

শুভ রাজ্যাভিষেকের পর ষষ্ঠ নওরোজ উৎসব

সোমবার দিনের দুই ঘড়ি চল্লিশ সেকেণ্ড অতিবাহিত হওয়ার পর মহান গ্রহ রবি তাঁর সম্মানের শীর্ষস্থান মেষ রাশিতে প্রবেশ করলেন। দিনটা ১লা ফারওয়ারদিন (৬ই মহরম, ২১শে মার্চ, ১৬১১)। নববর্ষের উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে আমি সৌভাগ্যের সিংহাসনে আরোহণ করি। আমির ও দরবারের কর্মচারীরা আমার দর্শনলাভ করে শ্রদ্ধা জানানোর মহৎ গৌরব লাভ করেন। দরবারের কর্মচারী মিরণ সদর জাহান, আবদুল্লা খাঁ ফিরোজ জং এবং জাহাঙ্গীর খানের উপঢৌকন আমার সম্মুখে রাখা হয়। ৮ই মহরম, বুধবার বঙ্গ দেশ থেকে প্রেরিত রাজা কল্যাণের উপঢৌকন আমার সম্মুখে আনা হয়। এই মাসের ৯ই তারিখ বৃহস্পতিবার সাজাত খান এবং আরও কয়েকজন মনসবদার—যাঁদের দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল—আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রত্নখচিত একটি কটি-ছোরা রজ্জাক উইরদি উজবেগকে উপহার দিই। সেইদিনই মূর্তজা খানের নববর্ষের উপঢৌকন আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি নানা জিনিস তৈরী করেছিলেন। জিনিসগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমি পছন্দমত মূল্যবান রত্ন, সূক্ষ্মবস্ত্র, হস্তী ও অশ্ব গ্রহণ করি। অবশিষ্টগুলি তাঁকে ফেরত দিই।

২৪শে মহরম (১৮ই ফারওয়ারদিন) রবিগ্রহ তাঁর তুঙ্গতম স্থানে গিয়েছেন। সেইদিন পারস্যের রাজা শা আব্বাসের দূত ইয়াদগার আলি সুলতান তাঁর পক্ষ থেকে পরলোকগত সম্রাটের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ এবং আমার সিহাসনারোহণে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আমার ভ্রাতৃপ্রতিম শা আব্বাসের উপহার আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তেজী ঘোড়া, উত্তম বস্ত্র এবং বহু উৎকৃষ্ট উপহার তিনি নিয়ে আসেন। উপহার দেওয়ার পর সেইদিনই আমি তাঁকে মহার্ঘ্য সম্মানসূচক পোশাক এবং ত্রিশ হাজার টাকা যা পারস্যের মুদ্রামানে এক হাজার তুমান—দিই। তিনি আমার হাতে শা আব্বাসের একটি চিঠি দেন। তাতে আনন্দ ও আমার পিতার মৃত্যুতে শোক এই দুইয়েরই মিশ্র প্রকাশ ছিল। ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর চিঠিতে

সম্মান ও সহযোগিতার বাণী থাকায় আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে সেই চিঠিখানির অবিকল নকল এইখানে তুলে রাখছি।

শা আব্বাসের পত্র

"বর্ষণধর্মী মেঘের মত আল্লার মহিমা এবং সর্বশক্তিমানের অনুগ্রহধারা নব নব পদার্থের আবিষ্কারক ও বিস্ময়কর মানবের উদ্যানে সজীবতা আনুক।

যিনি সাম্রাজ্য ও শাসনের পুষ্পোদ্যান, ঔদার্যের শস্যক্ষেত্র, স্বর্গীয় মহিমায় সম্মানজনিত অপার আনন্দের উৎস, সূর্যের মত তেজস্বী, অধীশ্বর—যাঁর ভাগ্য এখনও নবীন যুবজনোচিত, সানির ন্যায় ক্ষমতাধর প্রসিদ্ধ সম্রাট, নানা দিকে যাঁর প্রভাব ব্যাপ্ত, যিনি খেদিভ সম, পৃথিবী যাঁর মুষ্টির মধ্যে (জাহাঙ্গীর), দেশবিজয়ী অধিপতি, যিনি সিকেন্দারের মত মহিমময় রাজা, হাতে যাঁর দরায়ুসের পতাকা, যিনি মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের আসনে উপবিষ্ট, সাত সমুদ্রের অধিপতি, যিনি সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিবর্ধক, সুখোদ্যান রচনাকারী গোলাপবাগের জঙ্গলাকার, তুঙ্গস্থানে সুখী গ্রহাধিপতি, স্থৈর্যে ও রাজকীয় গুণের পূর্ণ বিকাশ, নিসর্গ রহস্যের ব্যাখ্যা তা বিদ্যা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে যাঁর আসন উদ্ভাসিত, মানবীয় গুণাবলীর আধারে যিনি আল্লার মহিমা প্রকাশের আয়না স্বরূপ, মহান আত্মার উদ্গাতা, সৌভাগ্যবর্ধনের হেতু, সৃষ্টিকর্তার দয়ার যিনি ছায়া, যিনি গগন-গৌরব সূর্যের মত দীপ্ত, জেমসিদের মত যাঁর মহিমা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রভুর মত যাঁর প্রভাব, পৃথিবীর আশ্রয়, যিনি আল্লার অনুগ্রহ বিতরণের স্রোতস্বতী, যিনি অসীম করুণার প্রস্রবণ এবং পবিত্রতার সমতলভূমিতে সবুজতৃণক্ষেত্র—তাঁর রাজ্য কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে রক্ষা পাক, সত্য, প্রেম ও ভালবাসায় তাঁর হৃদয়-প্রস্রবণ পূর্ণ হোক। তাঁর মহান গুণাবলী ও উদারতার কথা লিখে শেষ করা যায় না।

"কলম জিভের আছে কি শক্তি
প্রেমের রহস্য করিতে প্রকাশ ?"

বাহ্যতঃ আমাদের অবস্থানস্থলের দূরত্ব আমার মিলন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দিচ্ছে না। কিন্তু আমার আধ্যাত্মিক মিলন স্পৃহার মন্দির তিনিই। আল্লাকে ধন্যবাদ একত্বের ধর্মানুসারে এই বিনীত নিবেদক এবং সেই পবিত্র মহিমার ধারক পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। স্থানের দূরত্ব ও দেহের বাহ্যিক মিলনের অভাব আত্মার নৈকট্য ও আধ্যাত্মিক সংযুক্তিকে নিবারণ করতে

পারেনি। আমার চোখ সেই বন্ধুত্বের দিকে চেয়ে আছে। সেই জন্য দুঃখের ধূলি আমার অন্তরের মুকুরে জমতে পারেনি। বরং এই মুকুরে সেই সম্পূর্ণতা পরিদর্শনের সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে। আমার আত্মাই বন্ধুত্ব ও প্রেমের সুগন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে। প্রেম ও সৌহার্দ্যের, আধ্যাত্মিক সমধর্মিতা ও আত্মিক মিলনের সুগন্ধবাহী মলয় পবন বন্ধুত্বের ওপরে জমা ধূলিকণাকে নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

“চিন্তায় আমি আছি যে তোমার পাশে
তাই অন্তর মোর পূর্ণ রয়েছে সুখে।
চিরকালের এই মধুমিলনের কাছে,
বিচ্ছেদ-ব্যথা নাহি কোনও কানে আসে।”

পরম শক্তিমান মহান আল্লাকে ধন্যবাদ প্রকৃত বন্ধুত্বের মহতী ইচ্ছার যে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল তাতে এখন ফল ধরেছে। সফলতা—যার সৌন্দর্য এতকাল ঘোমটায় ঢাকা ছিল বিনয়ের গুণে, আল্লার আসনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার গোপন বাসর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং প্রতীক্ষমাণদের আশা ও আগ্রহের সমতলক্ষেত্রে সম্পূর্ণতার কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে। সে সভার অলঙ্কার, রাজকুলশিরোমণি সম্রাটের মঙ্গলময় সিংহাসনে সম্রাটের পাশে এসে বসেছে। বিশ্ব উন্মেষকারী খিলাফতের পতাকা এবং সেই সৃষ্টিকর্তার বিশ্বব্যাপী শাসন ও ন্যায়বিচারের গগনচুম্বী ছত্র এবং সেই দোনরজ্জুর গ্রন্থি মোচনকারী পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর মস্তকে সাম্য, আধিপত্য এবং করুণার শীতল ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। আমার আশা এই—মনোবাঞ্ছা পূরণের যিনি প্রধান কর্তা তিনি সৌভাগ্যবানের শুভ রাজ্যাভিষেককে গৌরবমণ্ডিত করে রাখবেন। তাঁর রাজমুকুট উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং তিনি রাজসিংহাসন আলোকিত করে রাখবেন। এই অভিষেক আনন্দের বার্তা বহন করে এনে সকলেরই সম্পদবৃদ্ধির কারণ হবে। যে সব ব্যাপার রাজ্যশাসনের সঙ্গে জড়িত তার গৌরব ও মহিমা ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকুক আমি এই ইচ্ছাই পোষণ করছি।

আমাদের দুইজনের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বহুদিন থেকে সদ্ভাবের রীতি ও আন্তরিকতার ধারা চলে এসেছে। বন্ধুত্বের বন্ধনে আমরা নতুন করে বদ্ধ হয়েছি। আমি এই বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য সদাই উদগ্রীব হয়ে আছি। যখন তাইমুরের রাজমুকুট মাথায় পরে গুরগণি সিংহাসনে শুভ আরোহণের সংবাদ

এদেশে এসে পৌঁছায় তখনই আমি আমার প্রাসাদের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দূত হিসাবে তাড়াতাড়ি পাঠাবো স্থির করি। কিন্তু আজারবাইজানের ব্যাপার ও শিরওয়ান প্রদেশ জয়ের ঘটনা নিয়ে সেই সময় অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকায় এবং সেইখানকার বিলিব্যবস্থা সম্পন্ন না করে রাজধানীতে ফিরে আসতে না পারায় আমার এই বিশেষ কর্তব্যকার্যে বিলম্ব ঘটে গিয়েছে। যদিও বাহ্যিক সামাজিকতা ও শিষ্টতার অভিব্যক্তিকে জ্ঞানী ও দূরদর্শী ব্যক্তিরা খুব গুরুত্ব দেন না, তবুও বন্ধুত্বের নিদর্শন বলে—এ রীতি পালন করা উচিত।

আমার শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছা অনুযায়ী ওদিকের বিলিব্যবস্থা করে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার স্থায়ী রাজধানী ইস্পাজানে ফিরে এসেছি। আমি এখন কামালউদ্দিন ইয়াদগার আলিকে—যিনি অনেক মহৎ গুণের অধিকারী, বিশ্বাসী, আন্তরিকতায় পূর্ণ, আমার অনুগত কর্মচারীদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন, আমার পরিবারের একজন পবিত্রমনা সুফি—আপনার মহান দরবারে প্রেরণ করলাম। আপনাকে তিনি শ্রদ্ধাপূর্ণ সেলাম জানাবেন, আপনার পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবেন। তারপর আপনার সম্মানিত গালিচাকে চুম্বন করে আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন এবং আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর ফিরে আসার অনুমতি পাবেন! এখানে ফিরে দেবদূত সদৃশ আপনার নিরাপত্তা এবং সূর্যকিরণের মত উজ্জল ও আনন্দবর্ধনকারী মেজাজের কথা আমাকে জ্ঞাপন করবেন। আশা করি, বংশপরম্পরায় বন্ধুত্ব ও একাত্মতার বৃক্ষটি এবং অন্তরঙ্গতা ও শ্রদ্ধার উদ্যানটি, প্রেমের নদী ও শ্রদ্ধার প্রস্রবণের জলধারায় সিক্ত হয়ে ক্রমশঃ আরও সজীব ও সবুজ হয়ে উঠবে এবং তা থেকে একটি পাতাও খসে পড়বে না। অন্তরঙ্গতার বাতাস বিরোধের ধূলি উড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং আমাদের প্রকাশ্য বন্ধুত্ব ও আত্মিক বন্ধনের শৃঙ্খল আরও মজবুত করে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য সম্পাদনে সহায়ক হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লা তাঁর অদৃশ্য শক্তিপ্রভাবে এই মহান পরিবারের গৌরব ও সৌভাগ্য ক্রমশঃ বর্ধন করুন—এই প্রার্থনা করি।"

ভাই শা আব্বাসের চিঠির নকল তুলে দিলাম।

আমার ভাই সুলতান মুরাদ ও দানিয়াল আমার পিতার জীবনকালেই মারা যায়। লোকেরা তাদের নানা নামে ডাকতো। আদেশ দিই—একজনকে শাহাজাদা মগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত সম্রাটকুমার) এবং আর একজনকে শাহাজাদা মরভুম (দয়াপ্রাপ্ত সম্রাটকুমার) নামে ভবিষ্যতে উল্লেখ করতে হবে।

আমার রাজ্যাভিষেকের সময় মোহর ও টাকার ওজন তিন রতি বাড়িয়ে দিই। এই সময় আমার কাছে আবেদন আসে যে ব্যবসায়ের লেনদেন ব্যাপারে জনসাধারণের সুবিধার জন্য আগেকার ওজনের মোহর ও মুদ্রা প্রচলন করা ভাল। সমস্ত বিষয়ে জনসাধারণের সুবিধা ও সন্তোষই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত স্থির করে আমার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে আজকের দিন (১১ই উর্দিবিহিস্ত) থেকে আমার রাজ্যের সমস্ত টাকশালে আগেকার ওজন অনুসারে নতুন মোহর ও টাকা তৈরী হবে।

কিছু আগে, সফর মাসের ২রা তারিখ, শনিবার, ১০২০ সাল দুষ্টস্বভাব আবদাদ কাবুলে কোনও উপযুক্ত নেতা নেই শুনে সুবিধা বুঝে অপ্রত্যাশিত ভাবে অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে কাবুলে উপস্থিত হয়। খানান্ তখন অন্যত্র গিয়েছেন। কেবলমাত্র মুইজ্জুল মুল্‌ক কয়েকজন লোকসহ কাবুলে ছিলেন। মুইজ্জুল মুল্‌ক তাঁর কার্যদক্ষতার সঙ্গে তাল রেখে ক্ষমতার পরিচয় দেন। কাবুলি ও অন্যান্য অধিবাসীর বিশেষ করে ফারমুলি জাতির লোকেরা রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করে তাদের গৃহ সুরক্ষিত করে ফেলে। আফগানীরা নানা দিক থেকে কিছু কিছু বন্দুক নিয়ে রাস্তায় ও বাজারে জমায়েত হয়। কাবুলবাসী তাদের গৃহ ও অলিন্দের আশ্রয় থেকে তীর ছুঁড়ে ও বন্দুকের গুলি চালিয়ে ঐ হতভাগ্যদের অনেককে হত্যা করে। আবদাদের একজন বিশ্বস্ত সর্দার বর্গিও মারা পড়ে। এই ব্যাপার ঘটার পর কাবুলবাসীরা চারদিক থেকে সমবেত হয়ে রাস্তা অবরোধ করে তাদের বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দেবে এই ভেবে ভগ্নমনোরথ হয়ে কম্পিতপদে আতঙ্কিত হয় ফিরে যায়। ৮০০ জন কুকুরকে জাহান্নামে পাঠানো ও ২০০ জনকে বন্দী করার পর অবশিষ্ট শয়তানরা প্রাণ নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর স্থান থেকে পালিয়ে যায়। নাদআলি ময়দানি লাহুগড়ে ছিল। সে সেইদিনই কাবুলে পৌঁছিয়ে কিছুদূর তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে যায়। তবে তারা বেশীদূর চলে যাওয়ায় এবং তার লোকের সংখ্যা কম থাকায় সে ফিরে আসে। সে তাড়াতাড়ি কাবুলে ফিরে আসার চেষ্টা করায় এবং মুইজ্জুল মুল্‌ক তার কর্মপটুতা দেখানোয় তাদের দুই-জনেরই পদবৃদ্ধি করা হয়।

খান দোরাণ এবং কাবুলিরা অসতর্ক অবস্থায় দিন কাটাতে অভ্যস্ত হয়েছে দেখে আমার মনে হলো যে খানখানান কোনও কাজে নিযুক্ত না থাকায় তাঁকে আর তাঁর পুত্রদের কাবুলে পাঠানো যেতে পারে। এই চিন্তা মনে উদয়

হওয়ার পরই কিলিজ খাঁ—যাঁকে পাঞ্জাব থেকে আসার জন্য ফর্মান গিয়েছিল—আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো খানখানানকে বদমেজাজি আবদাদকে শায়েস্তা করার কাজে নিযুক্ত করায় তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে এই কাজের ভার দিলে বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই কাজ করবেন বলায় স্থির হয় যে পাঞ্জাব সুবার শাসকপদ মুর্তজা খানকে দেওয়া হবে। খানখানান এখানেই থাকবেন এবং কিলিজ খাঁকে ছয় হাজার পদাতিক ও পাঁচহাজার অশ্বারোহী মনসবদার পদে উন্নীত করে তাঁকে আবদাদ ও তার দস্যুদলকে বিতাড়িত করার জন্য কাবুলে পাঠানো হবে।

খানখানানকে আগ্রা সুবায় একটি জায়গীর দিই যাতে তিনি ঐদিককার বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারেন।

দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত বিজয়ী রাজকীয় সৈন্যদের প্রয়োজন মত প্রস্তুতি এবং আমিরদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপনের জন্য মহবত খাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তির মাসের ১২ই তারিখ (২১শে রবিউস্‌সানি) তিনি রাজধানী আগ্রায় ফিরে আসেন। ইসলাম খাঁর এক পত্রে জানতে পারি যে ইনায়াৎ খাঁ সুবা বাংলায় বেশ ভাল কাজ করছে। এইজন্য তার মনসব দুই হাজার থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার করা হয়। বাংলা সুবার আর একজন কর্মচারী রাজা কল্যাণের মনসব বাড়িয়ে পনেরশ পদাতিক ও আটশ অশ্বারোহী করা হয়। উড়িষ্যায় নিযুক্ত হাসিম খাঁকে কাশ্মীরের ভার নেওয়ার জন্য নিযুক্ত করে তার সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত সেখানকার কার্য পরিচালনার জন্য কাকা খাজা মহম্মদ হোসেনকে সেখানে পাঠানো হয়। আমার মহামান্য পিতার সময় মহম্মদ কাশিম কাশ্মীর জয় করেন। কিলিজ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিন্ কিলিজ কাবুল থেকে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তার স্বাভাবিক উৎকর্ষ ছাড়াও মর্যাদায় সে খান্‌জাদ হওয়ায় তাকে 'খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি।

১৪ই মুরদাদ মনিবের কাজে নিষ্ঠা কর্মদক্ষতা ও আন্তরিকতার জন্য ইতমাদুদ্দৌলৎকে রাজ্যের উচ্চপদ উজিরি প্রদান করি। এই দিনই ইরাণের রাজদূত ইয়াদগার আলিকে রত্নখচিত ঘোড়ার সঙ্গে একটি কটিবন্ধ উপহার দিই। বিদ্রোহী রাণার বিরুদ্ধে সৈন্যচালনার জন্য আবদুল্লা খাঁ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি গুজরাটের দিক থেকে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করবেন প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আমি তাঁকে সেই প্রদেশের সুবাদারের পদে উন্নীত করি। তাঁর

অনুরোধে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য রাজা রাসোকে অধিনায়ক নিযুক্ত করে তাঁর মনসবে আরও পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য বাড়িয়ে দিই। গুজরাটের স্থলে মালব সুবার ভার খান আজমের উপর দিই। আবদুল্লা খাঁয়ের সঙ্গে যে সৈন্যবাহিনী দাক্ষিণাত্য প্রদেশের নিকটস্থ নাসিকের পথে যাবে তাদের ব্যয়নির্বাহ ও যুদ্ধসংক্রান্ত জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য চার লক্ষ টাকা পাঠানো হলো।

আমার একজন ক্রীতদাস সিলমোহর তৈরীর দপ্তর করে শিল্পকলার একটি নক্সা আমাকে দেখায়। এমন সুন্দর শিল্পদ্রব্য আমি কোনও দিন দেখিনি। এমন জিনিস যে তৈরী হতে পারে তাও কোনও দিন শুনিনি। জিনিসটি এমন অদ্ভুত সুন্দর যে তার বিশদ বিবরণ এখানে দিচ্ছি। হেজেল কাঠের বাক্সের ভেতর হাতীর দাঁতে তৈরী চারটি কক্ষ। প্রথম কক্ষটি কুস্তিগীরদের জন্য। এখানে দুইজন পালোয়ান কুস্তি করছে, তৃতীয়জন হাতে বর্শা নিয়ে এবং চতুর্থজন শক্ত পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন মাটিতে দুই হাত রেখে বসে আছে—তার সম্মুখে একটা কাঠের টুকরো, একটি ধনুক ও একটি পাত্র।

দ্বিতীয় কক্ষটিতে আছে একটি সিংহাসন। তার ওপর সামিয়ানা খাটানো। সিংহাসনে বসে আছে একজন রাজপুত্র এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দিয়ে। তার পেছনে একটি তাকিয়া। পাঁচজন ভৃত্য তাকে ঘিরে আছে আর গাছের শাখা সিংহাসনের ওপর ছায়া ফেলেছে।

তৃতীয় কক্ষটিতে আছে একদল রজ্জুনর্তক। তারা একটা দণ্ড খাড়া করেছে আর সেই দণ্ডে তিনগাছি রজ্জু বাঁধা। একজন নর্তক দণ্ডের ওপর তার বাঁ হাত দিয়ে ডান পা মাথার পেছনে ধরে আছে। সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে একটা ছাগলকে দণ্ডের মাথায় তুলে দিয়েছে। আর একজন তার গলায় একটা ডঙ্কা ঝুলিয়ে সেটা বাজাচ্ছে। আর একজন লোক তার দুই হাত তুলে রজ্জুনর্তকের দিকে চেয়ে আছে। আরও পাঁচজন সেখানে দাঁড়িয়ে, একজনের হাতে লাঠি।

চতুর্থ কক্ষটিতে একটি গাছ। তার নীচে হজরত যীশুর মূর্তি। যীশুর পায়ে একটি লোক মালা রেখেছে, একজন বৃদ্ধ যীশুর সঙ্গে আলাপ করছে, আর চারজন লোক কাছেই দাঁড়িয়ে। এমন শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার জন্য আমি ক্রীতদাসকে উপহার দিয়ে সম্মানিত করি। তার মাহিয়ানাও বাড়িয়ে দিই।

চতুর্থ কক্ষ সম্বন্ধে সৈয়দ আমেদের মন্তব্য :— বাস্তবিকপক্ষে এটা

কোনও সৈন্যদপ্তরের ক্রীতদাসের কাজ নয়। চতুর্থ কক্ষে যীশুর প্রতিকৃতি কেন রাখা হবে তার কোনও কারণ বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ এই শিল্পনিদর্শনটি কোনও ইউরোপীয় কলাবিদের কাজ। এটা কোনও রকমে এই ক্রীতদাসের হাতে পড়েছে এবং সে এটা তার নিজের শিল্পকলা বলে প্রচার করেছে।

৩০শে শারিওয়ার মির্জা সুলতান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সফদর খাঁর পদবৃদ্ধি করে বিদ্রোহী রাণার বিরুদ্ধে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়। আবদুল্লা খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নাসিকের পথে প্রবেশ করবেন প্রস্তাব করায় আমার মনে হলো যে আমার মাননীয় পিতার আমলের বিশ্বস্ত কর্মচারী রামদাস কাচওয়াকে তাঁর সঙ্গে পাঠানো দরকার যাতে তিনি তাঁর ওপর সব সময়েই নজর রাখতে পারবেন। যাতে তিনি বেহিসেবী হঠকারিতায় কোনও কাজ না করেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে অনেক অনুগ্রহ দেখাই এবং 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি, যা পাওয়ার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আমি তাঁকে (রণ) ডঙ্ক ও হিন্দুস্থানের একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ রণতানবুর দিই। একটি শ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক পোশাক, একটি হাতি ঘোড়া দিয়ে সম্মানিত করে তাঁকে বিদায় দিই। খাজা আবুল হাসান প্রধানকে দেওয়ানপদ থেকে বদলি করে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার পদে বহাল করা হয়—কারণ, তিনি আমার পরলোকগত ভাই দানিয়ালের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঐদিকে কাটিয়েছেন।

এই সময়ে মাওয়ান্‌নাহারে গোলমাল ঘটার ফলে ওখানকার আমিরদের ও উজবেগ সেনানায়কদের মধ্যে অনেকেই যেমন হুসেন বি, পালোজান বাবা, নেরিস বি দরমন, বরম বি ও আরও অনেকে আমার দরবারে আসেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের সকলকেই সম্মানসূচক পোশাক, ঘোড়া, নগদ টাকা, মনসব ও জায়গীর দিয়ে সম্মানিত করি, ২রা আজর হাসিম খাঁ বঙ্গদেশ থেকে এসে আমার ফটকের চৌকাঠ চুম্বনের সম্মানলাভ করেন। আবদুল্লা খানের নেতৃত্বে যে বিজয়ী রাজকীয় সেনাবাহিনী দাক্ষিণাত্যে আছে তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য রূপ খাবাস ও সেখ আনরিয়ার হাতে গুজরাটের অন্তর্গত আহমেদাবাদে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঠানো হলো।

আমার নির্বাচিত একটি শিকারের স্থান সমোনগর গ্রাম। ১লা তারিখ সেখানে শিকারে যাই। ২২টি হরিণ মারা পড়ে। আমি মারি ১৬টি আর

খুররাম ৬টি। সেখানে দুই দিন দুই রাত্রি কাটিয়ে রবিবার রাত্রে বহাল তবিয়তে রাজধানীতে ফিরে আসি।

৩রা তারিখ খান আজমের কাছে থেকে একটা চিঠি আসে তাতে জানতে পারি যে আদিল খাঁ তাঁর দুষ্ট পন্থা ত্যাগ করেছে এবং অনুতপ্ত হয়ে কর্মচারী-দের মধ্যে সেই বেশী রাজভক্ত হয়ে উঠেছে। ১৫ই তারিখ অর্থাৎ সাওয়াল মাসের শেষ দিন কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য হাসান খাঁকে বিদায় দেওয়া হলো। পারস্যের রাজদূত ইয়াদগার আলিকে একটি বিশেষ ধরনের শাল (ইউরোপ থেকে আনা) উপহার দিই।

আমি যে হরিণগুলি নিজে শিকার করেছি তা দিয়ে 'জাই-নমাজ' (নমাজ পড়ার সময় বসার আসন) তৈরী করতে আদেশ দিই! সেগুলি সর্ব-সাধারণের নমাজ পড়ার জায়গায় রাখারও নির্দেশ দিই যাতে সকলেই তার ওপর বসে নমাজ পড়তে পারে। আইনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদেশ দিই যে মির-ই-আদল ও কাজি যাঁরা ধর্মীয় নিয়মকানুনের প্রবক্তা এবং সেই আইনপ্রয়োগকারী তাঁরা যেন আমার সম্মুখে এসে ভূমি চুম্বন না করেন।

২২শে বৃহস্পতিবার পুনরায় সমোনগরে আমি শিকার করতে যাই। কামারঘা শিকারের ব্যবস্থা করার জন্য খাজা জাহানকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠাই যে যতগুলি হরিণ ঐ এলাকায় আছে তাদের চারদিক থেকে তাড়িয়ে একটি প্রশস্ত জায়গায় এনে ফেলতে হবে। জায়গাটাকে সরা পর্দা (ক্যানভাসের পর্দা) দিয়ে ঘিরতে হবে। ওরা দেড় ক্রোশ জায়গা সরা পর্দা দিয়ে ঘিরে ফেলে। সংবাদ এলো যে শিকারের জায়গা তৈরী। অনেক শিকারের পশু সেখানে এসে জমা হয়েছে। আমি সেখানে গেলাম। শুক্রবার থেকে শিকার আরম্ভ করলাম।

পরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আমি প্রত্যেক দিন বেগমদের সঙ্গে নিয়ে কামারঘায় যাই এবং যতগুলি খুশী শিকার করি। কতকগুলি হরিণ জীবন্ত ধরা হয়। কতকগুলি তীরধনুক ও বন্দুকের গুলিতে মারা হয়। রবি ও বৃহস্পতিবার আমি পশুহত্যা করি না। এই দুই দিন আমার লোকেরা জাল দিয়ে জীবন্ত হরিণ ধরে। সাত দিন ৯১৭টি হরিণ ও হরিণী শিকার করা হয়। তার মধ্যে ৬৪১টিই জীবন্ত ধরা হয়। ৪০৪টি হরিণ ও হরিণী ফতেপুর পাঠানো হলো সেখানকার সমতলভূমিতে ছেড়ে

দেওয়ার জন্য। ৮৪টি হরিণের নাকে রূপার আংটি পরিয়ে এই জায়গাতেই ছেড়ে দিতে আদেশ দিই। ২৭৬টি হরিণ—যা তীর অথবা বন্দুকের গুলি দিয়ে মারা হয় সেগুলো দৈনিক বেগম, প্রাসাদের ক্রীতদাস, আমির ও ভৃত্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। আমি শিকার করতে করতে দিলগির (ক্লান্ত) হয়ে পড়ায় কামারঘার (শিকারক্ষেত্রে) যেসব জন্তু এখনও অবশিষ্ঠ আছে সেগুলো শিকার করার জন্য আমিরদের আদেশ দিয়ে আমি নিরাপদে রাজধানীতে ফিরে আসি।

১লা বামন (১৭ই জিল্কদ) এই আদেশ জারি করি যে আমার রাজ্যের বড় বড় শহরে যেমন আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতিতে বুলসরখানা অর্থাৎ রসুইখানা তৈরী করে সেখান থেকে রান্না করা খাদ্য দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। ত্রিশটি জেলার (মহল্লা) জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়। আগেই ছয়টি জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু করা হলো।

৪ঠা বামন রাজা বীর সিং দেওয়ের মনসবের পদাতিক সংখ্যা এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়া হলো। আগে ছিল ৪০০০ পদাতিক, দুই হাজার অশ্বারোহী। তাঁকে একটি রত্নখচিত তরবারিও উপহার দিই। 'শা বাচ্চা' (রাজপুত্র) নামে একটি বিশেষ তরবারি শা নওয়াজকে দিলাম।

১৬ই ইসফানদার মুজ মির্জা সারুলের পুত্র বদিউজ্জমানকে বিদ্রোহী রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়। তার হাত দিয়ে একটি তরবারি রাজা বাসোর জন্য পাঠাই।

সীমান্ত প্রদেশগুলির আমিররা তাদের অধিকার বহির্ভূত ব্যাপারগুলিতেও মাথা ঘামাচ্ছে, আইন ও পদ্ধতি মেনে চলছে না এ কথা পুনরায় শুনতে পেয়ে আমি বক্সিদের এই হুকুম সীমান্তের সমস্ত আমিরদের ওপর জারি করতে আদেশ দিই যে নিম্নলিখিত আদেশগুলি তাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে—এর পর থেকে যে ব্যাপারগুলি রাজার নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে, তাতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। প্রথম—তারা 'ঝার কোঠা'য় বসবে না। কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের পাহারা দেওয়ার কাজে অথবা তাদের সেলাম দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে না। হস্তীযুদ্ধের ব্যবস্থা করতে পারবে না, শাস্তি স্বরূপ কারও চোখ অন্ধ করা, কান অথবা নাক কেটে ফেলার আদেশ দিতে পারবে না। কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য জুলুম করতে পারবে না। নিজেদের কর্মচারীদের

কোনও পদবী দিতে পারবে না। সম্রাটের কর্মচারীদের কুর্নিশ করার আদেশ দিতে পারবে না। সম্রাটের দরবারে যে নিয়ম আছে সেই রীতিতে গায়কদের হাজির থাকার জন্য জুলুম করতে পারবে না। বাহিরে যাওয়ার সময় ডঙ্কা বাজাতে পারবে না। রাজকর্মচারীই হোক কিংবা তাদের নিজের ভৃত্যই হোক—তাদের যদি হস্তী কি অশ্ব উপহার দেওয়া হয়—তাহলে তাদের পিঠে গদি বা জিন থাকবে না এবং তাদের দিয়ে কোনও সম্মান দেখানোর কাজ করাতে পারবে না। মিছিল করে যাওয়ার সময় সম্রাটের ব্যক্তিগত পরিচারকদের পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। কোনও চিঠি কিংবা দলিলের ওপরদিকে তাদের নিজস্ব মোহর ছাপ দেওয়া চলবে না। বিধানগুলি যা আইনি জাহাঙ্গীর (জাহাঙ্গীরের বিধান) নামে পরিচিত—তা এখন চলছে।

শুভ রাজ্যাভিষেকের পর সপ্তম নওরোজ উৎসব

আমার রাজ্যাভিষেকের সপ্তম বৎসরে ১লা ফারওয়ারদিন, মঙ্গলবার (১৬ই মহরম-উল-হরাম—১৯শে মার্চ, ১৬১২) হিজরা ১০২১ সালে রাজধানী আগ্রায় আনন্দদায়ী নওরোজ উৎসব শুরু হয়। ঐ মাসের ৩রা তারিখ, বৃহস্পতিবার রাতের ৪ ঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর জ্যোতিষীদের বিধানমতে আমি সিংহাসনে বসি। প্রতি বছরের নিয়মানুসারে বাজার সজ্জিত করার ও রুজ-ই-খরফ (উৎসবের শেষ দিন) পর্যন্ত উৎসব চলতে থাকবে এই আদেশ দিই।

খসরু বি উজবেগ যিনি উজবেগদের মধ্যে খসরু কিম্‌বি নামে পরিচিত, এই সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সম্মানলাভ করেন। তিনি মাওয়ারান্ নাহারের একজন প্রশাসক। তাঁকে নানা রকমের অনুগ্রহ দেখিয়ে একটি সুন্দর সম্মানজনক পোশাক উপহার দিই। ইরাণের রাজদূতকে তাঁর নিজের খরচের জন্য পনেরো হাজার টাকা দিই। সুবা বেহার থেকে আফজল খাঁ যে উপহার পাঠিয়েছিলেন তা আমার সম্মুখে আনা হয়। উপঢৌকনের মধ্যে ছিল ৩০টি হস্তী, ১৮টি অশ্বশাবক, বাংলার কাপড়ের থান, চন্দন কাঠ, কস্তুরী, অগুরু কাঠ। খান তুরাণের উপহারও আমার সম্মুখে রাখা হয়। তিনি পাঠিয়েছেন ৪০টি অশ্ব, তুইটি উট, পোর্সিলেনের চীনা বাসন, সম্বরের চামড়ায় তৈরী লম্বা কোট এবং আরও অনেক মূল্যবান জিনিস যা কাবুল ও নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া যায়। প্রাসাদের কর্মচারীরাও উপঢৌকন দেওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। উৎসব চলার সময় পূর্বরীতি অনুযায়ী দিনের পর দিন তারা একে একে এসে উপঢৌকন দেয়। উপহারদ্রব্যগুলি ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করে মনোমত জিনিসগুলি গ্রহণ করে অবশিষ্ট জিনিস তাদেরই প্রত্যর্পণ করি।

১৩ই ফারওয়ারদিন (২৯শে মহরম) ইসলাম খাঁর কাছ থেকে এই নিবেদন আসে যে আল্লার অনুগ্রহে এবং সম্রাটের বিরাট ব্যক্তিত্বের গরিমায় বঙ্গদেশ ওসমান আফগানের বিদ্রোহের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। এই যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার আগে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। বঙ্গভূমি একটি বিরাট দেশ। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে গৌড় পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ক্রোশ, উত্তরের পর্বত (হিমালয়) থেকে মাদারণ সরকার

পর্যন্ত প্রস্থে ২২০ ক্রোশ। এর রাজস্ব ৬০ কোটি দাম (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)। এখানকার পূর্বতন শাসকদের কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, এক হাজার হস্তী এবং চার-পাঁচ হাজার যুদ্ধনৌকা ছিল। শের খাঁ ও তার পুত্র সলিম খাঁর সময় থেকে এ রাজ্য আফগানদের অধীন ছিল। হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসনে আমার মহামান্য পিতা উপবেশন করার পর সাম্রাজ্য যখন সৌন্দর্য ও গরিমায় উজ্জল হয়ে ওঠে সেই সময় তিনি তাঁর বিজয়ী সৈন্য এই রাজ্যে প্রেরণ করে এই দেশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তারপর এই প্রদেশ বিজয়ী সেনাপতিদের অক্লান্ত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এখানকার শেষ রাজ্য দাউদ কররানির দখল থেকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সেই হতভাগ্যটি খান জাহানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে অত্যন্ত দুর্দশায় পড়ে। সেই দিন থেকে এ পর্যন্ত এই প্রদেশ সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের অধীনে থাকে। শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু আফগান এই প্রদেশের সীমান্তে এবং দূরবর্তী স্থানে কিছু কিছু জায়গা তাদের দখলে রাখে। ক্রমে ক্রমে এই আফগানদের বেশীর ভাগই ঘৃণার পাত্র এবং সহায়হীন হয়ে পড়ে। ফলে তারা স্থানচ্যুত হয়ে সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের হাতে ধরা পড়ে।

সাম্রাজ্য শাসনের ব্যাপারটি একান্ত ভাবেই আল্লার অনুগ্রহে তাঁর এই দীন ভৃত্যের ওপর এসে পড়লে আমার রাজ্যাভিষেকের প্রথম বছরই রাজা মানসিংহকে—যিনি বাঙ্গলার শাসক নিযুক্ত হয়ে সেখানে ছিলেন—আমার দরবারে ডেকে পাঠাই। তাঁর স্থলে আমার কর্মচারীদের মধ্যে যিনি আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বলে সবিশেষ খ্যাতি সেই কুতুবউদ্দিন খাঁকে পাঠাই। সে এই প্রদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার কাজে নিযুক্ত একজন শয়তান কর্মচারী তাঁকে হত্যা করে। অগ্রপশ্চাৎবিবেচনাহীন বিবেক-বর্জিত এই লোকটিও তার প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গে পায় এবং সে হত হয়। জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বেহার স্থবার স্থবেদার এবং জায়গীরদার। এজন্য জাহাঙ্গীর কুলি খাঁকে পাঁচহাজারি মনসবদারি পদে উন্নীত করে তাঁকে বঙ্গদেশের শাসকরূপে নিযুক্ত করে সেখানে যেতে আদেশ করি। বাংলাদেশ তাঁর শাসনে অল্প কিছুদিন থাকার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন! বাংলার দূষিত হাওয়ায় তাঁর অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি এমন দুর্বল হয়ে

পড়েন যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হয়।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমার কাছে লাহোরে পৌছালে আমি ইস্‌লাম খাঁকে অবিলম্বে বঙ্গদেশে যাত্রার জন্য আদেশ দিই। তাঁকে এই গুরুতর দায়িত্বের ভার অর্পণ করলে অনেকে তাঁর অল্প বয়স এবং অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সুন্দর স্বভাব ও স্বাভাবিক কর্মপটুতা আমার বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সেইজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁকেই নিয়োগ করি। এই প্রদেশের কাজ তিনি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে থাকেন যে এটি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও কর্মচারীই এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে পারেননি। তাঁর বিশেষ প্রশংসাজনক কাজ হচ্ছে বিদ্রোহী আফগান ওসমানকে বিতাড়ন। পরলোকগত সম্রাটের সময় থেকে সে সাম্রাজ্যের সৈন্যদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত হতো কিন্তু কেউই তাকে পরাস্ত করতে পারেনি।

ইসলাম খাঁ ঢাকায় তাঁর কার্যস্থল নির্বাচন করার পর জমিদারদের বশে আনা তাঁর প্রধান কর্তব্য স্থির করেন। তাঁর মনে হয় যে বিদ্রোহী ওসমানের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠানো উচিত। যদি সে বিদ্রোহের পথ থেকে সরে এসে আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে ভাল কথা। তা না হলে অন্য রাজদ্রোহীদের মত তাকেও শাস্তি পেতে হবে। এই সময় সাজাত খাঁ ইসলামের সঙ্গে যোগ দেন এবং এই কাজের ভার তাঁর ওপরই পড়ে। আরও অনেক কর্মচারী—যেমন কিসওয়ার খাঁ, ইফতিকার খাঁ, সৈয়দ আদম বারহা, মুকাব খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ আচ্‌ছে, মুতামদ খাঁ, মুয়াজুম খাঁয়ের পুত্ররা, ইতিমাদ খাঁ এবং আরও অনেকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত হন। মুলসারি (বৃহস্পতি) গ্রহ শুভস্থানে অবস্থান করার সময় তিনি সদলবলে যাত্রা করেন। মির্জা মুরাদের পুত্র মির-কাশিমকে প্রধান খাজাঞ্চি এবং সংবাদলেখক নিযুক্ত করে তাকেও সঙ্গে নেন। পথ দেখানোর জন্য কয়েকজন জমিদারকেও সঙ্গী করেন। ওসমানের দুর্গের কাছে পৌছিয়ে তাদের মধ্যে কয়েকজন বাক্যবাগীশ লোককে, ওসমানকে মৃদু ভর্ৎসনা করে তাকে বিদ্রোহের পথ থেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য উপদেশ দিতে পাঠানো হয়। কিন্তু তার মাথার খুলিতে অহঙ্কার এঁটে বসে আছে। বাংলাদেশ পুরো অধিকারের ইচ্ছা এবং আরও অনেক বিচিত্র অভিলাষ তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং সে সদুপদেশে কর্ণপাত

করলো না, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো।

যুদ্ধক্ষেত্র একটা জলা জায়গার মধ্যে একটা নালার ধারে। ৯ই মহরম (১২ই মার্চ, ১৬১২) সাজাত খাঁ যুদ্ধের দিন স্থির করে বিজয়ী সৈন্যদের অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত করলেন। ওসমান কিন্তু সেদিন যুদ্ধ আরম্ভ করার কথা ভাবেনি। যখন সে শুনলো যে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে, তখন সে আর উপায়ান্তর না দেখে নালার ধারে এসে পৌছায় এবং তার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের সাজিয়ে বিজয়ী রাজকীয় বাহিনীর মুখোমুখি হয়। ব্যাপারটা যখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে এবং দুই পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, সেই সময় প্রথমেই সে তার ভীষণ যুদ্ধহস্তী অগ্রবর্তী রক্ষী সৈন্যদের মধ্যে চালনা করে। ভীষণ যুদ্ধের পর অগ্রবর্তী সৈন্যদের অনেক অধিনায়ক, যেমন—সৈয়দ আদম বার্‌হা ও সেখ আচ্‌ছে প্রাণ দিয়ে শহীদের সম্মান লাভ করেন। দক্ষিণ বাহুর অধিনায়ক ইফ্‌তিকার খাঁও এই সময় শত্রুকে আক্রমণ করতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু তিনিও তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর দলের সমস্ত সৈন্য এমন ভীষণ যুদ্ধ করে যে তাদের সকলেরই দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। এই ভাবে বামবাহুর অধিনায়ক কিসওয়ার খাঁ এবং তাঁর সেনারা তাঁদের প্রভুর জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। শত্রুপক্ষেরও অনেকে হত ও আহত হয়।

সেই পাপাশয় যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে স্থিরনিশ্চয় হলো যে অগ্রবর্তী এবং দক্ষিণ ও বামবাহুর অধিনায়করা হত হয়েছে। কেবলমাত্র কেন্দ্রের সেনাদল অবশিষ্ট আছে। ওসমান তার নিজপক্ষের হত ও আহতদের কথা কিছুমাত্র বিবেচনা না করে সমান তেজের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে। এই পক্ষে সাজাত খাঁর পুত্র, ভাই এবং জামাতারা ও অন্যান্য সেনাপতিরা বিপুল বিক্রমে বিপক্ষদলের অগ্রগতি রুদ্ধ করে এবং হিংস্র বাঘ ও চিতার মত তাদের আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই শহীদের মৃত্যু-বরণ করে। যারা বেঁচে ছিল তারাও গুরুতর আহত হয়। এই সময় ওসমান তার একটি শ্রেষ্ঠ রাগী হস্তী গজপতকে সাজাত খাঁয়ের দিকে ধাওয়া করে নিয়ে আসে। সাজাত খাঁ তাঁর বর্শা তুলে হাতীর গায়ে আঘাত করেন। কিন্তু বদমেজাজি হাতীর একটা বর্শার আঘাত কি করতে পারে? তিনি পুনরায় একটি তরবারি নিয়ে পর পর

দুইবার আঘাত করেন। এই আঘাতই বা হাতীর কি ক্ষতি করবে? তারপর তিনি ছোরা টেনে নিয়ে হাতীকে আবার দুইবার আঘাত করেন। কিন্তু এতেও হাতীটি পেছনে ফেরে না। ধাক্কা দিয়ে সাজাত খাঁকে তাঁর ঘোড়াসুদ্ধ মাটিতে ফেলে দেয়। ঘোড়া থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তিনি জাহাঙ্গীর শা এই ধ্বনি দিয়ে লাফ মেরে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ান। তাঁর অশ্বরক্ষক দুধারি তলোয়ার দিয়ে হাতীটির সামনের দুই পায়ে আঘাত করে। হাতীটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লে অশ্বরক্ষক হাতীর মাহুতকে হাতীর পিঠ থেকে নামিয়ে আনে। সাজাত খাঁ মাটিতে দাঁড়িয়েই তাঁর হাতের ছোরা দিয়ে হাতীর শুঁড়ে এবং কপালে এমন সজোরে আঘাত করেন যে হাতীটি যন্ত্রণায় তীব্র চীৎকার করে ঘুরে দাঁড়ায়। সে গুরুতররূপে আহত হয়ে তার নিজের সেনাদের দিকে চলে যায় এবং সেখানেই মাটিতে পড়ে যায়। সাজাত খাঁর ঘোড়া ইতিমধ্যে নিরাপদে উঠে দাঁড়ায়। যখন তিনি ঘোড়ার পিঠে উঠছেন ঐ শয়তানগুলো আর একটি হাতী তাঁর পতাকাবাহীর দিকে তাড়িয়ে এনে তাকে আর তাঁর ঘোড়াকে মাটিতে ফেলে দেয়। সাজাত খাঁ পুরুষোচিত হুঙ্কার দিয়ে পতাকাবাহীকে সচেতন করে বলেন—'মনে সাহস আন। আমি বেঁচে আছি। পতাকা আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে।'

এই সঙ্গিন মুহূর্তে সাম্রাজ্যের ভৃত্য যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা তাদের হাতের তীর, ছোরা ও তরবারির আঘাতে হাতীটিকে জর্জরিত করে। সাজাত খাঁ নিজে পতাকাধারীর কাছে এসে চীৎকার করে তাকে মাটি থেকে উঠতে বলেন এবং আর একটি ঘোড়ায় পতাকাবাহীকে চড়িয়ে দেন। পতাকাবাহী তখন পতাকাটিকে মেলে ধরে স্থির হয়ে থাকে। যুদ্ধের এই সময় একটি বন্দুকের গুলি সেই বিদ্রোহীর (ওসমান) কপালে এসে লাগে। কে এই গুলি করেছে তার সন্ধান নেওয়ার জন্য যত চেষ্টাই করা হোক সবই বিফলে যায়। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। গুলির আঘাত খেয়েই সে বুঝতে পারলো যে এইবার সে মরেছে। গুরুতর আঘাতের পরও দুই প্রহর অবধি তার লোকদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র তখনও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে আছে। অবশেষে শত্রুপক্ষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। বিজয়ী বাহিনী এই শয়তানের দলকে আঘাত হানতে হানতে তাদের অনুসরণ করে তাদের শিবির পর্যন্ত তাড়িয়ে

নিয়ে আসে। ওসমানের ভাই ওয়ালি, ওসমানের পুত্র মমরেজ, তার অন্যান্য আত্মীয় ও অনুচররা তার আহত অবস্থার কথা জেনে স্থিরনিশ্চয় হলো যে তার আর বাঁচবার আশা নাই। তারা মনে করে যে এইরকম পরাজিত এবং পলায়নপর হয়ে যদি তারা দুর্গে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাদের একজনও পথে জীবিত থাকবে না। তারা ঠিক করলো যে রাতটা কোনও রকমে শিবিরেই কাটিয়ে রাতের শেষে দুর্গে ফেরার চেষ্টা করবে। রাতের দুই প্রহরের পর ওসমান জাহান্নমে গেল। তৃতীয় প্রহরে তার মৃতদেহ নিয়ে, তাঁবু ও আসবাবপত্র সেখানেই ফেলে রেখে তারা নিঃশব্দে তাদের দুর্গের দিকে অগ্রসর হলো। সংবাদ-সংগ্রাহকরা এই সংবাদ পাওয়ার পর সাজাত খাঁকে জানিয়ে দেয়।

সোমবার সকালে সম্রাটপক্ষের কর্মচারীরা একত্র হয়ে স্থির করেন যে শত্রুপক্ষকে অনুসরণ করে যেতে হবে। তাদের নিশ্বাস ফেলার সময় দেওয়া হবে না। সৈন্যদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য ক্লান্তি, শহীদদের কবর দেওয়ার ব্যবস্থা ও আহতদের শুশ্রূষার কথা চিন্তা করে তাঁরা শেষ সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না যে এগিয়ে যাবেন না এখানেই থাকবেন। ঠিক এই সময় মুয়াজ্জেম খাঁর পুত্র আবদুস্ সালাম রাজ্যের কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনশ অশ্বারোহী ও চারশ বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। এই নতুন দল পৌঁছানোর পরই শত্রুসৈন্যকে অনুসরণ করাই ঠিক হয় এবং সবাই অগ্রসর হয়।

ওসমানের পর ওয়ালিই বিদ্রোহের নেতা। সে যখন শুনলে যে বিজয়ী সেনাদের নিয়ে সাজাত খাঁ এদিকে আসছেন এবং সেই সঙ্গে নতুন বাহিনীও যোগ দিয়েছে সে তখন আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সোজা পথ ধরে সাজাত খাঁর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় দেখলো না। শেষে সে দূত মারফৎ এই বার্তা পাঠায়—যে এই গোলমালের সৃষ্টি করেছে সে আর ইহজগতে নাই। যারা আছে তারা সকলেই সম্রাটের ভৃত্য ও মুসলমান। যদি সাজাত খাঁর কাছ থেকে কথা পায় তাহলে তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করবে এবং রাজানুগত্যের শপথ নেবে। তাদের হস্তীবাহিনী উপঢৌকন দেবে। সাজাত খাঁ এবং অন্যান্য অনুগত কর্মচারীরা রাজ্যের মঙ্গল হবে মনে করে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে তাদের উৎসাহ দেন। পরদিন ওয়ালি, ওসমানের পুত্র, অন্যান্য ভাই, জামাতারা সকলেই সাজাত খাঁ ও অন্যান্য কর্মচারীর

সঙ্গে দেখা করে। উপঢৌকন দেওয়ার জন্য তারা উনপঞ্চাশটি হাতি আনে। এখানকার কাজ সম্পন্ন করে কয়েকজন কর্মচারীকে সেখানে ও নিকটবর্তী স্থানে—যা এই হতভাগ্যের দখলে ছিল—মোতায়েন রেখে ওয়ালি ও অন্যান্য আফগানদের সঙ্গে নিয়ে সফর মাসের ৬ই তারিখ সোমবার জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) ইসলাম খাঁর কাছে ফিরে আসে।

১৬ই ফারওয়ারদিন জাহাঙ্গীরি আমলের একজন পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং আমার একজন প্রধান সেনানায়ক কুবারব খাঁ ক্যাম্বে দুর্গ থেকে এসে আমাকে সেলাম জানানোর সম্মানলাভ করেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কাজের জন্য গোয়া বন্দরে যাওয়ার আদেশ দিই এবং আমার খাস সরকারের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করতে বলি। আদেশানুসারে তিনি তাড়াতাড়ি গোয়ায় চলে যান এবং কিছুদিন সেখানে থাকেন। ঐ বন্দরে যেসব মনোমত দুষ্প্রাপ্য জিনিস পান তা অর্থের দিক দিয়ে চিন্তা না করে যে দাম ফিরিঙ্গিরা চায় তাই দিয়েই কিনে ফেলেন। বন্দর থেকে ফিরে এসে ঐসব জিনিস আমার সম্মুখে হাজির করেন।

এইগুলির মধ্যে কতকগুলি অদ্ভুত ধরনের জন্তু ছিল যা আমি কখনও চোখে দেখিনি, কেউ তার নামও শোনেনি। সম্রাট বাবর তাঁর আত্মচরিতে কতকগুলি জন্তুর আকৃতি এবং গঠন সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোনও চিত্র-অঙ্কন-কারীকে তাদের ছবি আঁকতে নির্দেশ দেননি। এই জন্তুগুলি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হওয়ায় আমি তাদের বর্ণনা দিই এবং চিত্রকরদের তাদের ছবি জাহাঙ্গীরনামার জন্য আঁকতে আদেশ করি—যাতে এই জন্তুগুলির কথা শুনে যাদের মনে বিস্ময় জেগেছে তাদের বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। এই জন্তুদের মধ্যে একটি ময়ূরের চেয়ে ছোট কিন্তু মোরগের চেয়ে বড়। (সৈয়দ আমেদের মন্তব্য—এগুলিকে ইংরাজি ভাষায় বলে—টার্কি; হিন্দুস্থানীরা বলে পিরু, আর ফার্সিভাষা জানা ভারতীয়রা একে বলে—জিল মুর্গ)। যৌন সংসর্গের আগে এরা পুচ্ছ মেলে ময়ূরের মতই নৃত্য করে। এর ঠোঁট ও পা মোরগের মত। এর মাথা, ঘাড় ও গলার কিছু অংশের রং মিনিটে মিনিটে বদলায়। আসঙ্গলিপ্সা জেগে উঠলে রং হয়ে যায় সম্পূর্ণ লাল—যেন লাল প্রবালে সেজেছে। কিছু পরেই সেই অংশগুলি হয়ে যায় সাদা এবং তুলোর মত দেখায়। গিরগিটির মত এরা, অনবরত রং বদলায়। মাথার ওপর দুইটি মাংসখণ্ড ঠিক মোরগের ঝুঁটির মত।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে আসঙ্গলিপ্সা জাগলে এই মাংসখণ্ড মাথার ওপর থেকে হাতীর শুঁড়ের মত নীচে ঝুলে পড়ে। আর যখন এটা ওপরে তোলে তখন মনে হয় যেন দুই আঙ্গুল চওড়া গণ্ডারের সিংএর মত। পালকের রং নানা রকমের। ময়ূরের পালকের রংয়ের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই।

জন্তুগুলির মধ্যে একটা বিচিত্র ধরনের বাঁদরও ছিল। এর হাত, পা, কান, মাথা বাঁদরের মত আর মুখটা খ্যাঁকশেয়ালের মত। চোখের রং বাজপাখীর মত কিন্তু চোখ বাজপাখীর চেয়ে বড়। মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত এর মাপ এক হাতের মত। এটা বাঁদরের চেয়ে ছোট কিন্তু খ্যাঁকশেয়ালের চেয়ে লম্বা। চুল ভেড়ার লোমের মত, রং ছাইয়ের মত। কানের নীচ থেকে চিবুক পর্যন্ত রং মদের মত লাল। লেজ আধ হাতের চেয়ে দুই তিন আঙ্গুল বড়—যা অন্য বানরের মত নয়। লেজ বিড়ালের লেজের মত ঝুলে থাকে। মাঝে মাঝে বাচ্চা হরিণের মত আওয়াজ করে। মোটের ওপর একটি অদ্ভুত প্রাণী।

বন্য পাখী যাকে এখানকার লোকে বলে তাদ্‌রা, কখনও খাঁচায় বদ্ধ থেকে বংশবৃদ্ধি করে এ কথা কেউ শোনেনি। আমার পরম পূজনীয় পিতার আমলে এই পাখীর ডিম ও বাচ্চা করার জন্য চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। আদেশ দিলাম—এদের কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষকে এক জায়গায় রাখতে। ক্রমে তারা ডিম পাড়তে আরম্ভ করে। ডিমগুলিকে তা দেওয়ার জন্য মুরগীর তলায় রাখতে আদেশ দিই। দুই বছরের মধ্যে ৬০।৭০টা বাচ্চা হয়, তার মধ্যে ৫০।৬০টা বড় হয়। এই কথা শুনে সবাই বিস্মিত হয়। বলা হয় যে পারস্য দেশে এই পাখীর বাচ্চা করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু ডিমও হয়নি, বাচ্চাও পাওয়া যায়নি।

১৯শে ফারওয়ারদিন ছিল রুজ-ই-সরফ। সেদিন সুলতান খুরামের মনসব দশ হাজারের স্থলে বারো হাজার করে দিই। এই দিনেই দলিপ সিং দাক্ষিণাত্য থেকে এসে আমাকে অভিবাদন জানায়। তার পিতা রায় রায় সিংয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাকে আমি 'রায়' উপাধি দিই এবং বিশেষ পোশাক দিয়ে সম্মানিত করি। রায় রায় সিংয়ের সূর্য সিং নামে আর এক পুত্র ছিল। দলিপ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হলেও (কপালে টিকা পাওয়ার হকদার) রায় রায় সিং সূর্য সিংয়ের মায়ের প্রতি অনুরাগবশতঃ সূর্য

সিংকে তাঁর উত্তরাধিকারী করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমাকে জানানোর পর সূর্য সিং তার বুদ্ধির অভাবেই হোক অথবা তার অল্প বয়সের জন্যই হোক আমার কাছে আবেদন করে বলে—"আমার পিতা আমাকেই তাঁর উত্তরাধিকারী করে আমার কপালে টিকা দিয়ে গেছেন।" তার এই কথা আমার ভাল লাগেনি। আমি বলি—"যদি তোমার পিতা তোমাকেই টিকা দিয়ে থাকেন আমরা টিকা দেব দলিপকে।" তারপর আমার নিজের হাতে তার কপালে টিকা দিয়ে দলিপকে তার পিতার জায়গীর ও অন্যান্য ত্যক্ত সম্পত্তিতে দখল দিই।

কুমায়ুনের রাজা লক্ষ্মীচাঁদ পার্বত্য প্রদেশের রাজাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর পিতা রুদ্র পরলোকগত সম্রাটের রাজত্বকালে আবেদন জানান যে রাজা টোডরমলের পুত্র যদি হাত ধরে তাঁকে নিয়ে আসেন তাহলে তিনি সম্রাট শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আসতে পারেন। তার ফলে টোডরমলের পুত্রকে তাঁকে আনবার জন্য পাঠানো হয়। লক্ষ্মীচাঁদ সেই একই ভাবে আবেদন জানান যে ইতিমাদ্দৌল্লার পুত্র তাঁকে নিয়ে এলে তিনি আমাকে সেলাম দিতে আসতে পারেন। তদনুসারে আমি ইতিমাদ্দৌল্লার পুত্র সাপুরকে (ইতিকাদ) তাঁকে আনার জন্য পাঠাই।

তিনি তাঁর পার্বত্য রাজ্যের অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস উপঢৌকন স্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন—যেমন পার্বত্য অশ্বশাবক, নানা জাতের শিকারী পাখী—বাজ, জুররা, কটাস্ ইত্যাদি এবং মৃগনাভি, কস্তুরী মৃগের চামড়া, কস্তুরীদান, তরবারি যা তাদের দেশে বলে খাঁড়া। ছোরা যা তারা বলে কতার এবং আরও অনেক রকমের জিনিস। পার্বত্য দেশের রাজাদের মধ্যে এই রাজারই সোনার পরিমাণ সব চেয়ে বেশী বলে খ্যাতি আছে। লোকে বলে যে তাঁর রাজ্যে সোনার খনি আছে।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কাজ সর্দারদের মধ্যে মতের অমিল এবং খান আজমের অসতর্কতার জন্য সন্তোষজনক ভাবে চলছে না। আবদুল্লা খাঁর পরাজয়ও ঘটে গেছে। এইজন্য আমিরদের ঝগড়া-বিবাদ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানার জন্য খাজা আব্দুল হাসানকে পাঠাই। নানাভাবে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পর একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আবদুল্লা খাঁয়ের পরাজয়ের কারণ তাঁর অহঙ্কার এবং উগ্রস্বভাব, সৎপরামর্শে কর্ণপাত না করা এবং আংশিকভাবে আমিরদের মধ্যে বিবাদ ও মতের গরমিল।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছিল। স্থির হয় যে আবদুল্লা খাঁ নাসিক ও ত্র্যম্বক থেকে গুজরাটি সৈন্য এবং যেসব আমির তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্য নিযুক্ত তাদের নিয়ে যাত্রা করবেন। এই সেনাবাহিনী রাজা রামদাস, খান আজম, সইদ খাঁ, আলি মর্দান বাহাদুর, জাফর খাঁ এবং অন্যান্য কর্মচারীরা সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করেন। সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার থেকে চোদ্দ হাজারের কাছাকাছি হয়। কথা হয় যে বেরারের দিক থেকে রাজা মানসিংহ, খান জাহান, আমির উল উমরা ও আরও কয়েকজন সর্দার অগ্রসর হবেন। ঠিক ছিল যে এই দুই দল সৈন্য তাদের পরস্পর গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখবে এবং ধার্য দিনে দুই দিক থেকে আক্রমণ করে শত্রুসৈন্যকে পর্যুদস্ত করবে।

যদি এই নিয়ম মানা হতো এবং তাঁদের অন্তরে একই চিন্তা খেলতো এবং তাঁদের নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না উঠতেন তাহলে খুব সম্ভব সর্বশক্তিমান আল্লা এইদিন তাঁদেরই ললাটে জয়টিকা পরিয়ে দিতেন। আবদুল্লা খাঁ 'ঘাট' অতিক্রম করে শত্রুরাজ্যে পৌছালে তিনি অন্য সৈন্যদলের সংবাদ জানার জন্য কোনও 'কাসিদান' (হরকরা) পাঠাননি অথবা পূর্বনির্দিষ্ট কার্যধারা অনুসরণ করে অন্যদলের গতির সঙ্গে নিজ দলের গতির সামঞ্জস্য রাখেননি যাতে শত্রুসৈন্যকে দুই দিক থেকে আক্রমণ করা যেতো। বরং তিনি নিজের শক্তিরই ওপর আস্থা স্থাপন করে মনে করেছিলেন যে যদি তিনি একাই বিজয়ী হতে পারেন তাহলে জয়ের গৌরব তিনিই লাভ করবেন। এই ভাবটা তাঁর মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। রামদাস খুব বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়ার কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উপদেশে তিনি কর্ণপাত করেননি। শত্রুপক্ষ তাঁর গতিবিধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে আসছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে একটি বড় সেনাবাহিনী ও বর্গীদের নিযুক্ত করেছিল। তাদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই সংঘর্ষ চলছিল। রাত্রে তারা হাউই ও নানারকমের বাজি ছুঁড়তে কসুর করেনি। শেষে শত্রুরা কাছে এগিয়ে এলো। কিন্তু তিনি এ পক্ষের অন্য সেনাদলের কোনও সংবাদই পেলেন না যদিও তিনি দক্ষিণীদের সমবেত হওয়ার স্থান দৌলতাবাদের কাছে এসে পৌছেছেন।

কালোমুখ শয়তান অম্বর একটি শিশুকে রাজতক্তে বসিয়েছিল। তার মতে এই শিশুর নিজাম-উল-মুল্‌কের বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। যাতে

লোকে সেই শিশুকেই রাজা বলে স্বীকার করে নেয় সেই জন্য সে হাতে তুলে ধরে তাকেই পেশোয়া ও নেতা বলে ঘোষণা করে। আবদুল্লার বিরুদ্ধে সে বারংবার সেনা পাঠায়। তারপর তার সৈন্যসংখ্যা বেড়ে উঠলে সে আক্রমণ করে। সে হাউই ও বাজি ছুঁড়েও এ পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অন্য সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কোনও সাহায্য আসার সম্ভাবনা না দেখে এবং সমস্ত দক্ষিণীরা এক জোটে আক্রমণ করতে শুরু করায় রাজকীয়পক্ষের লোকরা আর কোনও পন্থার কথা না ভেবে পশ্চাদপসরণের কথাই চিন্তা করলো।

সকলেই এই ব্যবস্থায় সম্মত হলে তারা ভোরের আগেই যাত্রা শুরু করে। দক্ষিণীরাও তাদের রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত অনুসরণ করে আসে। প্রতিদিনই দুই পক্ষের সাক্ষাৎ ঘটে এবং সংঘর্ষ চলে। এই কয়েক দিনে কয়েকজন উচ্চাভিলাষী এবং উৎসাহী যুবকের মৃত্যু ঘটে। মর্দান খাঁ বাহাদুর বীরের মত যুদ্ধ করেন। তিনি গুরুতর আহত হয়ে শত্রুপক্ষের হাতে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্মুখেই বিশ্বস্ততা ও নিমকের মর্যাদা রক্ষা করে জীবন উৎসর্গের মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে যান। জুলফিকার খাঁও অসীম সাহস দেখান। তাঁর পায়ে আঘাত লাগে। দুদিন পর তিনি মারা যান। সৈন্যবাহিনী বগযোনার অনুগত রাজা ভর্জুর রাজ্যে প্রবেশ করলে শত্রুপক্ষ ফিরে যায়। আবদুল্লা খাঁ গুজরাটের দিকে এগোতে থাকেন। প্রকৃত কথা এই যে আবদুল্লা খাঁ যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সময় যদি একটু ধীরগতিতে যেতেন এবং অপরদিকের সেনাবাহিনীকে নিকটে আসার সুযোগ দিতেন তাহলে সাম্রাজ্যের প্রধানদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যাপারটা ঘটতে পারতো। আবদুল্লা খাঁর পশ্চাদপসরণের কথা বেরার থেকে অগ্রসর-মান সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের কাছে পৌঁছালে তাঁরাও আর এগিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক মনে করেন না। তাঁরা ফিরে এসে বুরহানপুরের নিকটবর্তী আদিলাবাদে পরভেজের শিবিরে হাজির হন।

এই সংবাদ আগ্রায় আমার কাছে পৌঁছালে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নিজেই সেখানে গিয়ে যেসব কর্মচারী ওদিকে নিজেরাই প্রভু হয়ে উঠেছে তাদের ঝাড়েমূলে শেষ করার প্রস্তাব করি। আমিররা এবং আমার অন্যান্য অনুরাগীরা এই প্রস্তাবে কোনও মতে সম্মতি দেন না। খাজা আবুল হাসান নিবেদন করেন যে খানখানানের মত ঐদিককার কাজ বোঝবার মত যোগ্য

লোক আর দ্বিতীয় কেউ নাই। সুতরাং তাঁকেই আবার সেখানে পাঠিয়ে সেখানকার বিশৃঙ্খল অবস্থা গুছিয়ে ফেলা উচিত। সকলেই এ বিষয়ে একমত হলে খানখানানকেই পাঠানো স্থির হয়। ১৭ই উর্দিবিহিস্ত, রবিবার খানখানানকে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে বিদায় দেওয়া হয়। শা'নওয়াজ খাঁ, খাজা আবুল হাসান, রজ্জাক বিরদি উজবেগ এবং খানখানানের আরও কয়েকজন সঙ্গী আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে যান।

অনেকদিন থেকেই আসফ খাঁর অসুখের সংবাদ আসছিল। কিছুদিন ব্যাধি আয়ত্তের মধ্যে থাকত, আবার বেড়ে যেতো। শেষে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি বুরহানপুরে মারা যান। তাঁর বিচারবুদ্ধি ও কার্যক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তিনি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন এবং কবিতা রচনাও করতেন। তিনি 'খুসরু ও সিরিণ' নামে একটি গ্রন্থ লিখে আমাকে উপহার দেন। নাম দেন—নূর নামা (আলোর লেখা অর্থাৎ নূরউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কথা)। আমার মাননীয় পিতার সময়েই তিনি আমিরি পান এবং উজিরিপদ লাভ করেন। আমি সম্রাটপুত্র থাকার কালে তিনি অনেক সময় অবিজ্ঞোচিত কাজ করেছিলেন। অনেকেই এমন কি খসরু মনে করেছিল যে সিংহাসন লাভের পর আমি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবো। কিন্তু তাঁর নিজের এবং অন্যান্য সকলের মনে যে ধারণা জন্মেছিল তার বিপরীত কাজ আমি করি। তাঁকে অনুগ্রহ দেখিয়ে পাঁচহাজারি মনসবদারি পদে উন্নীত করি। কিছুকাল তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতায় উজিরিপদে রাখি এবং নানাপ্রকারে অনুগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি করি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মনসবদারি দিয়ে নানাভাবে অনুগ্রহ দেখাই।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার কাছে একথা পরিষ্কার হয়েছিল যে তাঁর আচরণ ও আন্তরিকতা যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমনটি ছিল না। নিজের কুকর্মের কথা বিবেচনা করেই তিনি সর্বদাই আমার প্রতি সন্দেহ মনে পুষে রাখতেন। অনেকেই বলে থাকে যে কাবুল অভিযানের সময় যে ষড়যন্ত্র ও গোলমাল হয় তার কথা তিনি আগেই জানতেন এবং তিনি হতভাগ্য ষড়যন্ত্রকারীদেরই সাহায্য দিয়েছিলেন। আমার কাছ থেকে নানা অনুগ্রহ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি যে আনুগত্যহীন বিপরীত ভাবের লোক ছিলেন সে বিশ্বাস আমি এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

২৫শে উর্দিবিহিস্ত মির্জা গাজির মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। মির্জা ছিলেন তারখানি জাতির থাটার (সিন্ধু) রাজবংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা মির্জা

জানি আমার মহামান্য পিতার সময়ে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং খান-খানানের সঙ্গে লাহোরের কাছে এসে সম্রাট আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্যলাভ করেন। সম্রাটের অনুগ্রহে তাঁর নিজের প্রদেশই তিনি লাভ করেন। তিনি নিজেই দরবারের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন স্থির করে তাঁর নিজের লোকদের থাটার শাসনভার গ্রহণ করার জন্য পাঠান। নিজে তিনি সাম্রাজ্যের কাজেই আজীবন থেকে যান এবং শেষে বুরহানপুরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র মির্জা গাজি খাঁ তখন থাটায় ছিলেন। পরলোকগত সম্রাটের ফারমানের বলে ঐ দেশের শাসনভার লাভ করেন। সৈয়দ খাঁ তখন ছিলেন বাকুরে। তাঁর কাছে আদেশ যায় যে মির্জা গাজির শোকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে যেন দরবারে আনা হয়। সৈয়দ খাঁ তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য জানান। তাঁকে আগ্রায় এনে মাননীয় পিতার পদচুম্বনের গৌরব অর্জনের ব্যবস্থা করেন। আমার পিতার মৃত্যু ও আমার সিংহাসনে আরোহণ করার সময় তিনি আগ্রাতেই ছিলেন।

খসরুকে অনুসরণ করার জন্য আমি লাহোরে পৌছানোর পর সংবাদ আসে যে খোরাসানের সীমান্তের আমিররা একত্রে মিলিত হয়ে কান্দাহার দখল করার জন্য রওনা হয়েছে। সেখানকার শাসক শা' বেগ দুর্গে আটক হয়ে সাহায্যের জন্য প্রতীক্ষা করছে। মির্জা গাজি, অন্যান্য আমির ও সেনানায়ক-দের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। এই সেনাবাহিনী কান্দাহারের কাছে পৌছালে খোরাসানের সৈন্যরা তাদের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য নেই বুঝে ফিরে যায়। মির্জা গাজি কান্দাহারে প্রবেশ করে সেই দেশ ও দুর্গের ভার আদেশমত সর্দার খানের হাতে অর্পণ করেন এবং শা' বেগ নিজের জায়গীরে চলে যান। মির্জা গাজি ভাকরের পথে লাহোরে যাত্রা করেন। সর্দার খান কান্দাহারে কিছুদিন থাকার পর মারা গেলে সেখানে আর একজন নেতা ও শাসকের প্রয়োজন হয়। এই সময় কান্দাহার থাটার সঙ্গে যুক্ত করে শাসনভার মির্জা গাজির ওপর অর্পণ করি। সেই সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে থেকে বরাবর সুশৃঙ্খলভাবে শাসন পরিচালনা করেন। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিও তাঁর আচরণ ছিল অতি চমৎকার। মির্জা গাজির জায়গায় আবার একজন নেতা কান্দাহারে পাঠানোর প্রয়োজন হওয়ায় আবুন নবি উজবেগকে—যিনি নিকটবর্তী মুলতানে ছিলেন—ঐ পদে নিযুক্ত

করি। তাঁকে বাহাদুর খাঁ পদবী ও একটি পতাকা দিয়ে সম্মানিত করি।— দিল্লীর শাসকপদ ও এই প্রদেশের রক্ষণের দায়িত্ব মুকারব খাঁয়ের ওপর অর্পণ করি। আমার মাননীয় পিতার খাসভৃত্য খাবাসকে 'খাবাস খাঁ' উপাধি এবং এক হাজার পদাতিক ও পাঁচশ অশ্বারোহীর মনসবদারি দিয়ে সম্মানিত করে কনোজ সরকারের ফৌজদার পদে নিযুক্ত করি। ইতিমাদুদ-দৌলার পুত্র ইতিকাদ খাঁর কন্যার সঙ্গে খুররামের বিবাহ স্থির করে বিবাহ উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য ১৮ই খুরদাদ, বৃহস্পতিবার তার বাড়ীতে যাই। সেখানে এক দিন এক রাত কাটাই। খুররাম আমাকে উপঢৌকন দেয়। বেগমদের, তার নিজের মা ও সৎমাদের ও হারেমের বাঁদিদের এবং আমিরদের নানা মণিমুক্তা উপহার দেয়। (মন্তব্য—ইতিকাদ খাঁর কন্যা আর্জুমন্দ বানু ওরফে মমতাজ সাজাহানের প্রিয়তমা পত্নী। তিনি চোদ্দটি পুত্র-কন্যার জননী হন। মমতাজ ছিলেন নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সাজাহানের সঙ্গে বিবাহের কথা পাঁচ বছর তিন মাস আগে স্থির হয়। তখন সাজাহানের বয়স ছিল পনেরো বছর। বিবাহের সময় সাজাহানের বয়স কুড়ি বছর তিন মাস এবং আর্জুমন্দ বানুর বয়স উনিশ বছর এক মাস)।

'খুনপারা' (রক্ত জমাট বাঁধা) অসুখে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে বুধবার (তারিখ নাই) আমার বাম বাহু থেকে কিছু রক্ত মোক্ষণ করা হলে আমি বেশ হালকা বোধ করি। আমার মনে হয় চিকিৎসকরা রক্তমোক্ষণের ব্যাপারটিকে 'হাল্‌কি করণ' নাম দিলেই ভাল করতেন। আজকাল এই ব্যাখ্যাই চালু হয়েছে। মুকারব খাঁ আমার রক্ত বের করেছিলেন। তাঁকে একটি রত্নখচিত ছোরা দিই। হস্তী ও অশ্বশালের হিসাবনবিশ কিষণদাস আমার পিতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই দুই দপ্তরের কাজ করছে। সে অনেকদিন থেকে রাজা উপাধি ও এক হাজারি মনসবদারি পদলাভের আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করছিল। ইতিপূর্বে তাকে রাজা উপাধি দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলাম। এখন তাকে এক হাজারি মনসবদারির পদ দিই।

সাজাত খাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটি খুবই অদ্ভুত। তিনি তাঁর কাজ সুন্দরভাবে সমাপ্ত করার পর ইসলাম খাঁ তাঁকে উড়িষ্যা প্রদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় দেন। পথে এক রাত্রে তিনি একটি হস্তিনীর পিঠে 'চৌকন্দিদারে' (চতুষ্কোণ হাওদা) বসেছিলেন। তাঁর পেছনে ছিল একটি ছোকরা খোজা। তাঁর শিবির ত্যাগ করার সময় স্থানীয় লোকেরা একটা মদমত্ত হাতিকে রাস্তার ওপর বেঁধে

রেখেছিল। অশ্বক্ষুরের শব্দ, ঘোড়সওয়ারদের চলাফেরার আওয়াজে ক্ষিপ্ত হয়ে হাতিটি শেকল ছেঁড়ার চেষ্টা করতে থাকে। এই কারণে সেখানে ভীষণ গোলমাল ও চীৎকার শুরু হয়। সেই খোজার কানে আওয়াজ পৌঁছালে সে হতচকিত হয়ে নিদ্রালু অথবা মদের ঘোরে অজ্ঞান সাজাত খাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বলে—একটা মাতাল হাতি শেকল ছিঁড়ে এই দিকে ধেয়ে আসছে। এই কথা শোনামাত্র তিনি বিহ্বল হয়ে হাওদার সম্মুখ দিক থেকে লাফিয়ে পড়েন। নীচে পড়ার সময় তাঁর পায়ের গোড়ালি একটা পাথরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই পায়ের ক্ষতে তিনি দুই-তিনদিনের মধ্যেই মারা যান।

এই মৃত্যুর কথা শুনে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। একজন সাহসী ব্যক্তি একটি বালকের কান্না বা চীৎকার শুনে নিজেকে সংযত না করে এমন ভাবে জ্ঞান হারিয়ে হাতির পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে এটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। তির মাসের ১৯শে তারিখ এই মৃত্যুসংবাদ আমার কাছে পৌঁছায়। আমি তাঁর সন্তানদের সহানুভূতির সঙ্গে সান্ত্বনা দিই এবং কাজে বহাল করি। যদি তিনি এই দুর্ঘটনায় প্রাণ না হারাতেন তাহলে অনেক অনুগ্রহ লাভ করে গৌরবময় উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হতেন।

ভাগ্যের বিরুদ্ধে কি লড়তে পারে কেউ?

বঙ্গদেশ থেকে ইসলাম খাঁ ১৬০টি হস্তী ও হস্তিনী পাঠিয়েছে। তাদের আমার সম্মুখে আনা হয়। তাদের আমার নিজস্ব হাতিশালে রাখতে বলি। কুমায়ুনের রাজা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চান। আমার পিতার আমলে তাঁর পিতাকে একশত ঘোড়া দেওয়া হয়। আমিও সেই একই সংখ্যার ঘোড়া এবং উপরন্তু একটি হাতি তাঁকে বিদায়কালীন উপহার দিই। তা ছাড়া তিনি দরবারে থাকার সময় সম্মানসূচক পোশাক ও রত্নখচিত ছোরা উপহার দিয়েছিলাম। তাঁর ভাইদেরও পোশাক ও ঘোড়া দিই। আগের ব্যবস্থানুযায়ী তাঁর প্রদেশ তাঁকেই দেওয়া হলে তিনি সফলতার আনন্দ নিয়ে গৃহে ফিরে যান।

আমার মনে হঠাৎ আমির-উল-উমরার একটা কবিতা মনে হওয়ায় এইখানে তুলে দিলাম।

"হে বিশ্বত্রাতা!
প্রেমে-হত আমাদের
মাথার উপর দিয়ে যাও চলে।

একজনও যদি পুনঃ পায় প্রাণ
তোমার দয়ায়,
তা হবে, শতেক অবিশ্বাসী হত্যার সমান।"

আমি কবিতা-ভাবাপন্ন হওয়ায় কখনও ইচ্ছায় কখনও বা ভাবাবেগে দ্বিপদী ও চতুষ্পদী কবিতা রচনা করি। এইভাবে এই কবিতার ছত্রগুলি আমার মনে ভেসে ওঠে।

"ফিরাইও না গণ্ডদেশ, হে ললনে।
এক লহমাও বাঁচিব না তোমার বিহনে।
একটি হৃদয় যদি কর তুমি ভঙ্গ,
তা হবে, শতেক হত্যার সমান।"

এই কবিতাটি আবৃত্তি করলে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে কবি-ভাবাপন্ন প্রত্যেকেই এই ধরনের কবিতা রচনা করে। শিল-খোদাইকার মোল্লা আলি আহম্মদ যার সম্বন্ধে আগেই লিখেছি— এই ধরনের একটা কবিতা খুব খারাপ লেখেনি।

"হে নিয়ামক,
বৃদ্ধ সুরা বিক্রেতার কান্নার কথা ভেবে,
সুরার বোতল চূর্ণ করার আদেশটি
ফিরায়ে নাও।
যদি একটি বোতলও ভাঙ্গ তুমি
তা হবে শতেক হত্যার সমান।"

২২শে শারিওয়ার, ১০২১ সনের ১৭ই রজব বৃহস্পতিবার মরিয়ম জমানির প্রাসাদে আমার সৌর বৎসরের ওজন উৎসব সম্পন্ন হয়। এইভাবে নিজেকে ওজন করবার রীতি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। পরলোকগত সম্রাট আকবর— যিনি ছিলেন দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের অবতার স্বরূপ—এই রীতি সমর্থন করে গিয়েছেন। সৌর ও চান্দ্র বৎসরে দুইবার তিনি নানা ধাতু, সোনা, রূপা এবং অনেক রকমের মূল্যবান জিনিস দিয়ে নিজেকে ওজন করাতেন যার মূল্য প্রায় এক লক্ষ। সেই অর্থ তিনি ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। আমিও এই বাৎসরিক রীতি পালন করি। নিজেকে ঐভাবে ওজন করিয়ে ঐসব মূল্যবান জিনিস ফকিরদের মধ্যে ভাগ করে দিই।

বাংলার দেওয়ান মুতাকিদ খাঁ সেখানকার কাজ থেকে অবসর নিয়ে চলে

আসেন। ইসলাম খাঁ তাঁর সঙ্গে ওসমানের পুত্র, ভাই ও কয়েকজন ভৃত্যকে পাঠান। তাদের আমার সামনে আনা হয়। আমি প্রত্যেকটি আফগানের ভার এক-একজন দায়িত্বসম্পন্ন কর্মচারীর ওপর দিই। তারপর, মুতাকিদ খাঁ তাঁর নিজের উপঢৌকন—২৫টি হাতি, ২টি চুনী, একটি রত্নখচিত ফুলকাতারা (এক প্রকারের ছোরা) এবং বাংলার বস্ত্র আমার সম্মুখে রাখেন। মিহরমাসের ১১ই তারিখ মুতাকিদ খাঁ উচ্চসম্মানের বকসীপদে নিযুক্ত হন।

রামচাঁদ বান্দিলার মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র ভারতকে রাজা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি। ২৮শে আজান আমার আদেশানুসারে সে গুজরাট সুবা থেকে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। উপঢৌকন স্বরূপ সে একটি চুনী ও তিনটি মুক্তা নিয়ে আসে।

৬ই আজর, ৩রা সওয়াল বুরহানপুর থেকে সংবাদ আসে যে আমির-উল-উমরা নিহালপুর পরগণায় ২৭শে আজান প্রাণত্যাগ করেছেন। লাহোরে তাঁর অসুখের পর থেকেই তাঁর বিচারবুদ্ধি ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং বিশেষ ভাবে স্মৃতিভ্রংশ হয়। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর কোনও পুত্র নাই যাকে আমি অনুগ্রহ দেখাতে পারি।

এই ঋতু ভ্রমণ ও শিকারের উপযুক্ত সময়। ২রা জিল্কদ মঙ্গলবার আগ্রা ত্যাগ করে দর্হা উদ্যানে শিবির ফেলে চার দিন থাকি। এই মাসের ১০ই তারিখ সলিমা সুলতান বেগমের মৃত্যুসংবাদ আসে। তাঁর মা সম্রাট বাবরের কন্যা এবং পিতা নকস্বন্দী খাজাবংশীয় মির্জা নুরুদ্দিন মহম্মদ। তিনি সর্ব-গুণান্বিতা ছিলেন। সর্ববিষয়ে নৈপুণ্য ও দক্ষতা নারীজাতির মধ্যে দুর্লভ। মহামান্য সম্রাট হুমায়ুন বৈরাম খাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর ভগ্নীর এই কন্যার সঙ্গে বিবাহ ঠিক করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরলোকগত সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। বৈরাম খাঁ হত হওয়ার পর মাননীয় পিতা তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁর ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। [মন্তব্য—এই তথ্য ভুল। সলিমার মৃত্যু হয় ৭৬ বৎসর বয়সে। তাঁর জন্ম—৪ঠা সওয়াল, ৯৪৫ ; মৃত্যু—১০ই জিল্কদ ১০২১]।

এই দিনই আমি দর্হা উদ্যান থেকে চলে আসি। তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য ইতিমাদদ্দৌলাকে পাঠাই। তাঁর নিজ রচিত মন্দাকর উদ্যানে সমাধিস্থ করার জন্য আদেশ দিই।

খাজা জাহানকে কাবুল সুবায় পাঠিয়ে দিলাম। দাই মাসের ২১শে তারিখ

তিনি ফিরে আসেন। তাঁর যাওয়া আর ফিরে আসার সময় নিয়ে মোট তিন মাস এগারো দিন হয়। উপঢৌকন স্বরূপ তিনি ১২টি মোহর ও ১২টি টাকা এনেছিলেন। এই দিনেই রাজা রামদাস দাক্ষিণাত্যের বিজয়ী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে এসে আমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১০১টি মোহর উপঢৌকন দেন। কাবুলের আমিরদের উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ও তাদের এবং কিলিজ খাঁর মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তার ফয়শালা করার জন্য রাজা রামদাসকে সেখানে পাঠাই। তাঁকে একটি অশ্ব, সম্মানসূচক পোশাক এবং ব্যয়নির্বাহের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

৬ই বাহমন যখন আমি কারি পরগণার শিবিরে, সেই সময় খাজাগি মহম্মদ হোসেনের মৃত্যুসংবাদ আসে। তাঁর বড় ভাই মহম্মদ কাশিম খাঁ আমার মাননীয় পিতার সময়ে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। খাজা মহম্মদ হোসেনও তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি বকাওয়াল (রন্ধনশালার পরিচালক) প্রভৃতি অনেক পদে কাজ করেছিলেন। তাঁর কোনও পুত্র ছিল না। গোঁফে বা দাড়িতে একটিও চুল গজায়নি। কথা বলার সময় তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরুতো। তাঁকে দেখাতো একটা খোজার মত।

খানখানান বুরহানপুর থেকে শা' নওয়াজ খান্‌কে কতকগুলি বিষয়ে নিবেদন জানানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি ১৫ই তারিখ এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ১০০টি মোহর ও ১০০টি টাকা নজর দেন। আবদুল্লা খাঁর হঠকারিতা এবং আমিরদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ দাক্ষিণাত্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তারই সুযোগ নিয়ে দক্ষিণীরা কথা বলার সুযোগ পায়। তারা আমির ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীর নিকট শান্তি স্থাপনের কথা বলতে শুরু করে। আদিল খাঁ আনুগত্যের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে আবেদন জানান যে যদি তাঁকে দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য ভার দেওয়া হয়, তাহলে যে সমস্ত জেলা সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের হস্তচ্যুত হয়েছে সেগুলি আবার তিনি দখলে আনতে পারেন। অনুগতরা এই প্রস্তাব সময়োপযোগী মনে করেন। এক প্রকারের মীমাংসার কথা ঠিক হলে খানখানান এ বিষয়ে নিষ্পত্তি করার ভার নেন। খান আজমও বিদ্রোহী রাণাকে শায়েস্তা করে গাজি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে তাঁর জায়গীর মালবে গিয়ে সেখানকার কাজের ব্যবস্থা করে এই নতুন কাজ গ্রহণ করতে বলি।

আমার শিকার দুই মাস কুড়ি দিন ধরে চলেছিল। প্রত্যেক দিনই আমি

শিকারে বেরিয়েছি। জগৎ উজ্জ্বলকারী নববর্ষ আরম্ভ হতে আর মাত্র ৫০।৬০ দিন অবশিষ্ট থাকায় আমি ফিরে এসে ২৪শে ইস্‌ফানদিয়ার দরূহা উদ্যানে শিবির ফেলি। দরবারের কর্মচারী ও কয়েকজন মনসবদার, তাঁরা আমার আদেশে নগরে ছিলেন, এখানে এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মুকারব খাঁ একটি চিত্রিত কলস, ইউরোপীয় টুপি এবং রত্নখচিত চড়ুইপাখী (?) আমাকে উপহার দেন। তিন দিন আমি এই উদ্যানে থাকি। ২৭শে ইস্‌ফান্‌দিয়ার নগরে প্রবেশ করি। শিকারকালে ২২৩টি হরিণ, ৯৫টি নীলগাই, ৩৬টি সারস ইত্যাদি পাখী এবং ১৪৫৭টি মাছ শিকার করি।

রাজ্যাভিষেকের অষ্টম নওরোজ

১০২২ সন, ২৭শে মহরম, বৃহস্পতিবার (১লা ফারওয়ারদিন) আমার সিংহাসন আরোহণের অষ্টম বৎসরে দিনের সাড়ে তিন ঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর মহান সূর্য মীন রাশি থেকে মেষ রাশিতে আসেন—যে গৃহ তাঁর আনন্দ ও বিজয়লাভের স্থান। নববর্ষের প্রত্যূষে প্রতি বৎসরের রীতি অনুসারে উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ওঠে চারিদিক। অপরাহ্নে আমি রাজসিংহাসনে উপবেশন করি। আমির ও সাম্রাজ্যের মন্ত্রীরা এবং দরবারের কর্মচারীরা একে একে আমাকে অভিবাদন ও সম্বর্ধনা জানাতে আসেন। শুভ উৎসবের দিনগুলিতে আমি সারাদিন সদর দরবারকক্ষে বসি। সর্বসাধারণের আবেদন অথবা দাবীপত্র এবং প্রাসাদ-কর্মচারীদের উপহার-দ্রব্য এইখানে আমার কাছে রাখা হয়।

মুতাবিদ খাঁ আগ্রায় একটি বাড়ী কেনেন। সেখানে কয়েকটা দিন বাস করেন। সেই সময় একের পর এক তাঁর বিপদ ঘটে। শুনতে পাই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এই চারটি জিনিসের ওপর নির্ভর করে—(১) তোমার স্ত্রী, (২) তোমার ক্রীতদাস, (৩) তোমার বাড়ী এবং (৪) তোমার ঘোড়া। বাড়ী পয়মন্ত হবে কিনা তা জানার জন্য যে নিয়ম চালু আছে লোকে বলে তা সঠিক ফলে যায়, কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। বাড়ীর জায়গার একটু মাটি পরিষ্কার করে চেঁছে ফেলতে হবে। সেই চাঁচা মাটি আবার সেই জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। যদি জায়গাটি আগের মতই ভরে যায় তা হলে মধ্যমরকমের ভাল বলা যেতে পারে—অর্থাৎ সৌভাগ্যও হবে না, দুর্ভাগ্যও হবে না। যদি মাটি ছড়ানোর পরও জায়গাটা আগের চেয়ে নীচু দেখায় তাহলে সেটা হবে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আর যদি জায়গাটা আগের চেয়ে উঁচু হয়ে ওঠে তাহলে সেটা হবে সৌভাগ্যসূচক।

ইসলাম খাঁর পুত্র হুয়াং তার পিতার সঙ্গে বঙ্গদেশে ছিল। সে এই সময় এসে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কয়েকজন মগকে সে সঙ্গে করে আনে। তাদের দেশ পেগু ও আরাকানের কাছে। সে দেশ এখনও তাদেরই দখলে। তাদের রীতিনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুসন্ধান করি। সংক্ষেপে বলতে গেলে তারা মানুষের আকারে পশু। তারা সর্বভুক। মাটিতে বা সমুদ্রে যা

পাওয়া যায় তাই খায়। তাদের ধর্মে খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই। যে কোনও লোকের সঙ্গে তারা খেতে পারে। তারা সৎমায়ের মেয়েদের বিবাহ করে। ও-দেশের পর্ব্বতশ্রেণীর একপ্রান্ত কাসঘর প্রদেশ এবং আর একপ্রান্ত পেগু স্পর্শ করেছে। ওদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম কিংবা নীতি বলতে এমন কিছু নাই যাকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীদের থেকে তারা অনেক দূরে, হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের থেকেও পৃথক।

সরফের (রবিগ্রহের সুতুঙ্গ স্থানে গমন) দুই তিন দিন আগে পুত্র খুররাম তার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গিয়ে তার নববর্ষের উপহার দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার অনুরোধে সম্মতি দিই। তার বাড়ীতে এক দিন এক রাত থাকি।

১৯শে ফারওয়ারদিন সোমবার সরফের সম্মেলন বসে। সেই শুভদিনে আমি দরবারে বসি। হুকুম দিই যে সেখানে সুরা ইত্যাদি সমস্ত মাদক দ্রব্য আনা হোক—যাতে যে কেউ তার খুশী মত জিনিস নিতে পারে। বেশীর ভাগই সুরাপান করে। পারস্যের রাজদূত ইয়াদগার আলি খানকে কেকিব-ই-তালি (ভাগ্য-নক্ষত্র) নামে এক হাজার তোলার সোনার মোহর উপহার দিই। ভোজ সেদিন খুব ভাল হয়।

নববর্ষের দিন মুকারব খাঁয়ের উপঢৌকন আমার সামনে সাজানো হয়নি। এখন নানারকমের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য ও চমৎকার উপহারগুলি একসঙ্গে আমাকে দেখানো হয়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ছিল জাহাজে করে আনা বারোটি ইরাকি ও আরবি ঘোড়া, ফিরিঙ্গিদের হাতের কাজ রত্নখচিত জিন। বংশী-বদন নামে যে হাতিটি ইসলাম খাঁ বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়েছেন সেটা আমাকে দেখানোর পর আমার বিশিষ্ট হাতীগুলির মধ্যে তাকে রাখা হয়।

২৭শে উরদিবিহিস্ত, ২৬শে রবিউল আওয়াল আমার সিংহাসন আরোহণের অষ্টম বর্ষে, হিজরা ১০২২ সনে, বৃহস্পতিবার আমার মা মরিয়ম জমানির প্রাসাদে চান্দ্র বৎসরের ওজন নেওয়ার উৎসব সম্পন্ন হয়। যে মুদ্রায় আমার ওজন নেওয়া হয় তার কিছু আমি মহিলাদের এবং যে সব উপযুক্ত লোক সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে বিতরণ করতে আদেশ দিই।

কর্ণাটক থেকে একজন আফগান দুইটি ছাগল আনে যাদের দেহের ভেতর পাজ্জাহর (এক রকমের পাথর—যা বিষের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার হয়) আছে। আমি বরাবরই শুনে এসেছি যে সব পশুদেহে পাজ্জাহর পাথর আছে তারা

খুব ক্ষীণদেহী ও দুর্বল হয়। কিন্তু এই ছাগল দুটি বেশ মোটা এবং তাজা ছিল। আমি একটি ছাগলকে জবাই করতে আদেশ দিই। চারটি পাজ্জাহর পাথর তার দেহে পাওয়া গেল দেখে সবাই বিস্মিত হলো।

এটি একটি বাস্তব সত্য যে চিতারা অনভ্যস্ত স্থানে স্ত্রী-চিতার সঙ্গে জোড় বাঁধে না। আমার মহামান্য পিতা এক হাজার চিতা একসঙ্গে রেখেছিলেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল যে চিতার বাচ্চা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। তিনি অনেকবার স্ত্রী ও পুরুষ চিতা বাগানে ছেড়ে রাখতেন কিন্তু তাতেও কিছুই হয়নি। এই সময়, একটা পুরুষ চিতা বাঁধন ছিঁড়ে একটা মাদি চিতার কাছে চলে যায় ও জোড় বাঁধে। তার আড়াই মাস পরে তিনটি বাচ্চা হয় ও তারা বাড়তে থাকে। ব্যাপারটি অদ্ভুত বলে এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

চিতারা জোড় বাঁধে না কিন্তু একথা কি কেউ শুনেছে যে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় বাঘের বাচ্চা হয়েছে? আমার রাজত্বকালে বন্য পশুরাও তাদের হিংস্রস্বভাব ত্যাগ করেছে। এমন কি বাঘেরাও এমন পোষ মেনেছে যে তারা সদলে শৃঙ্খলমুক্ত অবস্থায় মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে তবু তারা মানুষের কোনও ক্ষতি করেনি কিংবা বন্যতা বা হিংস্রতা দেখায়নি। একটি বাঘিনীর গর্ভ হয় ও তিন মাস পর তিনটি বাচ্চা প্রসব করে। এ কথা কোনও কালে কেউ শোনেনি যে বনের বাইরে পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার সময় বাঘের বাচ্চা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে বাঘের দুধ চোখের জ্যোতি বাড়ায়। যদিও নানা রকমের চেষ্টা করা হলো কিন্তু দুধের ছিটেফোঁটাও বাঘিনীর বুকে পাওয়া গেল না। সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্যই মায়ের বুকের রক্ত দুধ হয়ে ঝরে পড়ে। আমার মনে হয় যে বাঘ ভীষণ রাগী জন্তু হওয়ায় শাবকরা যখন বুকের দুধ খেতে থাকে তখন তার মার রাগ বেড়ে যায় এবং তার বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

খাজা জাহান নগরীর কাছেই একটি তরমুজের বাগান করেন। ১০ই খুরদাদ, বৃহস্পতিবার দিনের দুই প্রহর অতীত হলে আমি বেগমদের সঙ্গে নিয়ে নৌকায় চড়ে সেই তরমুজের বাগান পরিদর্শন করতে আসি। দিনের দুই তিন ঘড়ি অবশিষ্ট থাকার সময় আমরা সেই বাগানে পৌছাই। সেই তরমুজের কেয়ারিগুলির মধ্যে বেড়িয়ে সন্ধ্যাবেলাটা কাটাই। এমন ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো যে তাঁবু ও পর্দা পড়ে গেল। সে-রাতটা নৌকাতেই কাটিয়ে দিই। শুক্রবারও দিনের অনেকটা তরমুজের বাগানে কাটিয়ে

নগরে ফিরে আসি।

আফজল খাঁ অনেকদিন থেকেই ফোড়া ও অন্যান্য ঘায়ে ভুগছিলেন। ১০ই খুরদাদ তিনি মারা যান। রাজা জগমোহন দাক্ষিণাত্যের কাজে অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁর জায়গীর এবং পৈত্রিক ভূসম্পত্তি মহবত খানের নামে হস্তান্তর করি। সেখ পীর একালের সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে নিস্পৃহ হয়ে থাকেন। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন হওয়ায় আমার সঙ্গী ও পরিচারক রূপে ছিলেন। তিনি তাঁর জন্মভূমি মৈরলা পরগণায় কিছুদিন আগে একটি মসজিদ তৈয়ারি করেন। এই কথা তিনি এতদিন পর আমাকে জানান। তিনি মসজিদটির নির্মাণ সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা মনে পোষণ করায় আমি তাঁকে চার হাজার টাকা দিই যাতে তিনি সেখানে গিয়ে এই টাকা ব্যয় করতে পারেন। তাঁকে একটি মূল্যবান শাল উপহার দিয়ে বিদায় দিই।

দরবারকক্ষে দুইটি পৃথক পৃথক রেলিং ঘেরা জায়গা আছে। একটি ঘেরার মধ্যে বসেন আমিররা, দূতরা এবং অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিরা। এখানে বিনা আদেশে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। দ্বিতীয় ঘেরাটির মধ্যে—যেটা প্রথম ঘেরাটির চেয়ে আয়তনে বড়—বসেন নীচু থাকের মনসবদার, আহদি এবং অন্যান্যরা যারা এখানে কাজের জন্য নিযুক্ত। রেলিংয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে আমিরদের ভৃত্য ও যেসব লোকের দেওয়ানখানায় প্রবেশাধিকার আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় রেলিংয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকায় আমার মনে হলো যে প্রথম রেলিংটা রূপো দিয়ে সাজাবো। আদেশ দিই যে এই রেলিং এবং যে সিঁড়ি রেলিং থেকে ঝরোখার ঘেরা বারান্দা পর্যন্ত উঠে গেছে এবং ঝরোখার আসনের দুইপাশে নিপুণ কারিগর দিয়ে তৈরী যে দুটি কাঠের হস্তী আছে তা রূপো দিয়ে সাজাতে হবে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে আমাকে জানানো হয় যে হিন্দুস্থানী ওজনের ১২৫ মণ যা পারস্য দেশের ৮৮০ মণের সমান ওজনের রূপো এতে ব্যবহার করা হয়েছে। সত্যিই এখন খুবই সুদৃশ্য হয়েছে।

জানতাম যে কোনও জীবন্ত প্রাণীকে পাগলা কুকুরে কামড়ালে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু হাতির ব্যাপারেও যে এমন হয় তা জানা ছিল না। এক রাত্রে এই কাণ্ড ঘটলো। গজপতি নামে আমার একটি হাতি যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে একটি হস্তিনীও ছিল। সেই সময় একটা পাগলা কুকুর হস্তিনীর পা কামড়ে দেয়। হস্তিনীটি চীৎকার করে ওঠে। মাহুতরা ছুটে আসে। তাড়া খেয়ে কুকুরটা একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার

কুকুরটা ফিরে মর্দ হাতিটির সম্মুখের পা কামড়ায়। হাতিটা কুকুরটিকে মেরে ফেলে। এই ঘটনার এক মাস পাঁচ দিন পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে, হস্তিনীটি তখন খাচ্ছিল, হঠাৎ মেঘের ডাক শুনে সে চীৎকার করে ওঠে। তার সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হয়। সে একবার মাটিতে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। সাত দিন সে জলস্পর্শ করে না। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকে। আট দিনের দিন সে মাটিতে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। হস্তিনীটির মৃত্যুর এক মাস পর মাহুতরা গজপতিকে একটা নদীর ধারে নিয়ে আসে। সেদিনও আকাশে মেঘ ছিল। ঘন ঘন মেঘের গর্জন হচ্ছিল। হাতিটি প্রবল উত্তেজনার বশে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ে। অনেক রকম চেষ্টা করে মাহুতরা তাকে তার নিজের জায়গায় নিয়ে আসে। হস্তিনীটির মত একই সময়ের ব্যবধানে এবং একই ভাবে গজপতিও মারা যায়। এই ব্যাপারটি সকলকেই বিস্মিত করে। এটা খুবই বিস্ময়ের কথা যে অত বড় বিশালদেহ জন্তুর একটা ক্ষীণদেহ ছোট্ট কুকুরের দংশনজনিত ছোট্ট ক্ষতে এমন বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

হিন্দুজাতি চার ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণী তাদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে থাকে। প্রথম হচ্ছেন—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁরা অতুলনীয় ব্রহ্ম (ঈশ্বর)-কে জানেন। তাঁদের করণীয় নীতি ছয় প্রকার (১) ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন (২) অন্যকে শিক্ষাদান (৩) অগ্নিপূজা (৪) অগ্নিপূজা সম্বন্ধে অপরকে বিধান দান (৫) দরিদ্রদের কিছু দেওয়া ও (৬) দানগ্রহণ। এই শ্রেণীর জন্য একটি নির্দিষ্ট শুভদিন আছে। সেদিন হচ্ছে বর্ষা ঋতুর দ্বিতীয় অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি। এই দিনটিকে তাঁরা শুভদিন মনে করেন। এই দিনে পূজারীরা নদী বা পুকুরের তীরে এসে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। উপবীত ও রঙ্গিন সূতার ওপর মন্ত্র আওড়ান। আর একদিন অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিন সেই সূতা রাজা ও সেই সময়কার বড়লোকদের হাতে বাঁধা হয় কারণ এটাকে মঙ্গলপ্রদ বলে গণ্য করা হয়। এই সূতার নাম রাখী অর্থাৎ যা রক্ষা করে। এই দিন পড়ে তির মাসে যখন জগৎ-তপ্তকারী সূর্য কর্কট রাশিতে আসেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ছত্রি যারা ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত। তাদের কর্তব্য হচ্ছে অত্যাচারিতদের অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করা। এই শ্রেণীর নীতি তিন প্রকারের। (১) তারা ধর্ম-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে কিন্তু অন্যকে শিক্ষা দেয় না

(২) তারা অগ্নিপূজা করে কিন্তু অন্যকে এই পূজা করতে শিক্ষা দেয় না। (৩) তারা দুঃস্থদের দান করে কিন্তু তারা নিজেরা দুঃস্থ হলেও অন্যের কাছ থেকে কোনও দান গ্রহণ করে না। এই শ্রেণীর বিশেষ দিন বিজয়া দশমী। এই দিন তাদের পক্ষে শুভ হবে মনে করে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে এই দিনে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করে। রামচন্দ্র—যাঁকে এরা ঈশ্বরের মত পূজা করে এই দিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে বিজয়ী হয়েছিলেন। সেজন্য এরা এই দিনকে একটি বিশেষ শুভদিন বলে মনে করে তাদের হস্তী, অশ্বকে সাজায় এবং পূজার্চনা করে। এই দিনটি শারিওয়ার মাসে পড়ে যখন সূর্য কন্যা রাশিতে যান। এই দিন তারা হস্তী ও অশ্বরক্ষকদের বকশিশ দেয়।

তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে বৈশ্য। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সেবা করাই এদের ধর্মের নীতি। তারা কৃষিকাজ ব্যবসায়, ঋনদান এবং সুদ আদায়ের কাজ করে। এই শ্রেণীরও একটি বিশিষ্ট নির্দিষ্ট দিন আছে—সেটিকে বলে দেওয়ালি। এই দিনটি মিহর মাসে পড়ে, যে মাসে সূর্য তুলা রাশিতে যান। এই দিন রাত্রে তারা বাড়ীতে আলো দেয়, পরস্পর বন্ধু ও আত্মীয়দের বাড়ী যায় এবং জুয়া খেলায় ব্যস্ত থাকে। এই শ্রেণীর লোকদের লাভ ও সুদের দিকে নজর। দিনটি শুভজনক বলে তারা এই দিনই নতুন হিসাবের খাতা খোলে।

চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে শূদ্র। এরাই নিম্নতম জাতি। তারা সকলেরই ভৃত্যের কাজ করে। অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরা যে সব কাজ করে জীবিকানির্বাহ করে এরা তা করতে পারে না। বৃহস্পতিবার তাদের পক্ষে পবিত্র। ইস্‌ফান্‌দার মুজ মাসে যখন রবিগ্রহ যান মীন রাশিতে সেই মাসের শেষ বৃহস্পতিবার তাদের কাছে অতি পবিত্র দিন। এই দিন রাত্রে তারা রাস্তা ও পথের মোড়ে আগুন জালায়। ভোর হলে দিনের এক প্রহর পর্যন্ত তারা ছাই নিয়ে পরস্পর মাথায় ও মুখে ঘষে এবং বেয়াড়া রকমের আওয়াজ ও চীৎকার করতে থাকে। তারপর তারা স্নান করে ধোয়া কাপড়জামা পরে বাগানে এবং মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ করাই রীতি। সেই জন্য তারা বছরের শেষদিন আগুন জালিয়ে জানাতে চায় যে মৃত বৎসরকে তারা পোড়াচ্ছে। আমার মাননীয় পিতার সময় হিন্দু আমিররা এবং তাঁদের অনুকরণ করে অন্যান্যরাও রাখী উৎসব পালন করতো এবং তাঁর মঙ্গলময় বাহুতে চুনী, মুক্তা ও মূল্যবান জহরতে নির্মিত ফুলের তাগা করে বেঁধে দিত। এই রীতি কয়েক বছর ধরে

চলেছিল। এই অপব্যয় বিলাস চরমে উঠলে তিনি ব্যাপারটি অপছন্দ করেন এবং এই ধরনের রাখীবন্ধন বন্ধ করে দেন। ব্রাহ্মণরা মঙ্গলসূচক বলে তাঁদের রীতি অনুযায়ী রেশমের সুতার রাখী তাঁর হাতে বেঁধে দিতেন। আমিও এই বছর এই প্রশংসার্হ রাখীবন্ধনের ধর্মীয় নীতি পালন করি। আমার হাতে আমির ও ব্রাহ্মণদের রাখী বাঁধার আদেশ দিই। ৯ই আমুরদাদ ছিল রাখী বন্ধনের দিন। তাঁরা সকলে আমার হাতে রাখী বাঁধেন। অন্যান্য জাতিরাও এই রীতি অনুকরণ করে রাখী বাঁধে। আদেশ দিই যে ব্রাহ্মণরা তুলা অথবা রেশমের সুতার রাখী বাঁধবে।

বৎসরের এই দিনই ঘটনাক্রমে পরলোকগত সম্রাটের মৃত্যুর দিন পড়ে। মৃত্যুর স্মৃতিদিবস পালন হিন্দুস্থানের একটি বিশেষ রীতি। প্রতি বৎসর হিন্দুস্থানীরা পিতা কিংবা অন্য প্রিয়জনের মৃত্যুদিবসে তাদের অবস্থানুযায়ী আহার্য প্রস্তুত করে, ধূপ-ধূনা ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য জ্বালায়, জ্ঞানী গুণী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে। অনেক সময় এই রকম সম্মেলন এক সপ্তাহ ব্যাপী চলে। এই দিন আমি বাবা খুররামকে পিতার পুণ্য সমাধিস্থলে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার জন্য পাঠাই এবং দশজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হাতে দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে আদেশ দিই।

আমুরদাদ মাসের ১৫ই তারিখ ইসলাম খাঁর উপঢৌকন আমার সম্মুখে আনা হয়। তিনি পাঠিয়েছিলেন ২৮টি হাতি, ৪০টি ঐদেশীয় ঘোড়া, ৫০ জন খোজা এবং ৫০০ খণ্ড সোনার গাঁওয়ের বিশেষ বস্ত্র।

নিয়ম করা হয় যে প্রত্যেকটি সুবার সীমানার মধ্যের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি পৃথকভাবে রিপোর্ট করতে হবে।

দরবার থেকে প্রতি সুবার জন্য পৃথক পৃথক সংবাদ-প্রেরক নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়ম আমার পিতা প্রবর্তন করেন। আমিও এই নিয়ম অনুসরণ করছি। ব্যবস্থাটা খুবই সুবিধাজনক। এতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও অধিবাসীদের সংবাদ জানতে পারা যায়। এই নিয়মের উপকারিতা সম্বন্ধে যদি বিশদভাবে লেখা যায় তাহলে সেটা খুব বড় ব্যাপার হবে। শুধু একটি বিবরণ এখানে লিপি-বদ্ধ করছি। লাহোরের সংবাদ-প্রেরক সংবাদ পাঠায় যে তির মাসের শেষে দশজন লোক আমানাবাদে যায়। জায়গাটি শহর থেকে ১২ ক্রোশ দূরে। খুব গরম হাওয়া বইতে থাকায় তারা একটা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ পরই ধুলোর ঝড় আরম্ভ হয়। সেই হাওয়া তাদের গায়ে লাগলে

তাদের কম্পন শুরু হয়। সেই গাছের তলাতেই নয়জনের মৃত্যু হয়। একজন মাত্র বাঁচে। সে অনেকদিন অসুস্থ থাকার পর অনেক কষ্টে ভাল হয়। এই জায়গায় এমন খারাপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে ঐ গাছে যে সব অসংখ্য পাখী বাসা বেঁধেছিল তারা সব মাঠিতে পড়ে মরে যায়। অনেক জন্তু যারা কাছাকাছি ছিল, চষাক্ষেতের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে প্রাণ হারায়।

১৩ই আমুরদাদ বৃহস্পতিবার নমাজ পড়ার পর নৌকায় উঠে শিকারের উদ্দেশ্যে শ্যামনগর গ্রামে আসি। এটিও আমার একটি নির্বাচিত শিকারক্ষেত্র। শ্যামনগর গ্রামটি মহবত খাঁর জায়গীরের মধ্যে। তিনি নদীর ধারে সুন্দর থাকবার জায়গা তৈরী করেছিলেন। আমার খুব পছন্দ হলো। তিনি একটি হস্তী এবং মরকতমণির অঙ্গুরী উপঢৌকন দেন। হাতিটি আমার ব্যক্তিগত হস্তীশালায় রাখা হয়। ৬ই শাহরিয়ার পর্যন্ত শিকার করি। এই কয়দিনই ৪৭টি মর্দা ও মাদি হরিণ এবং অন্যান্য জন্তু শিকার করি।

এই মাসের ২০শে তারিখ বৃহস্পতিবার শেষ বেলায় মরিয়ম জমানির প্রাসাদে আমার সৌর বৎসরের ওজন উৎসব সম্পন্ন হয়। আমি চুয়াল্লিশ সৌর বৎসরে পদার্পণ করি। ২২শে তারিখ হস্তীপৃষ্ঠে বিহিস্তাবাদে পিতার পবিত্র সমাধিক্ষেত্র দেখতে আসি। পথে পাঁচ হাজার টাকার খুচরা মুদ্রা চারপাশে ছিটোতে থাকি। দরবেশদের মধ্যে বিতরণের জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা খাজা জাহানকে দিই। এখানে সান্ধ্যনামাজ শেষ করে নৌকায় করে ফিরে আসি।

জ্যোতিষীরা ২রা সাবান ২৪শে শাহরিয়ার সোমবার রাতের আটঘড়ির সময় যাত্রার শুভ সময় ধার্য করায় আমি সেই সময় মনের আনন্দে আজমীঢ় যাওয়ার জন্য রাজধানী আগ্রা থেকে যাত্রা করি। এই যাত্রায় দুইটি মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম খাজা মুইনউদ্দিন চিস্তির মহিমময় সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা। এই মহান আত্মার আশীর্বাদে আমাদের উচ্চবংশ অশেষ সমৃদ্ধিলাভ করেছে। আমি তাঁর মহিমান্বিত সমাধিক্ষেত্রে সিংহাসনে আরোহণ করার পর আর যাইনি। দ্বিতীয় বিদ্রোহী রাণা অমর সিংহকে পরাজিত করে বিতাড়ন।

রাণা অমর সিংহ হিন্দুস্থানের রাজা ও জমিদারদের মধ্যে 'একজন প্রধান। তার এবং তার পূর্বপুরুষদের নেতৃত্ব এবং সর্দারি এই প্রদেশের প্রত্যেকটি রাজা এবং রায়রা মেনে চলেছে। এদিকের শাসনভার বরাবর এই বংশের হাতে

চলে এসেছে। 'পূরব' দেশের প্রতি আধিপত্য তারা বহুকাল থেকে করে আসছে। রাজা পদবীতে তারা অনেকদিন থেকেই ভূষিত হয়ে আসছে। দাক্ষিণাত্যের ওপর হামলা করে ওদিককার অনেক জায়গাই তারা দখলে আনে। এই বংশের বাপ্পার একজন পূর্বপুরুষ বেরার দখল করে। এই বিজয়ের পর তারা রাজার পরিবর্তে 'রাওয়াল' উপাধি গ্রহণ করে। এর পর তারা মেবারের পার্বত্য দেশগুলি দখল করে এবং ক্রমে ক্রমে চিতোর দুর্গ অধিকারে আনে। সেই সময় থেকে আমার সিংহাসন আরোহণের অষ্টম বর্ষের আজকের দিন পর্যন্ত ১৪৭১ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে (টডের মতে রাণা বংশের পূর্বপুরুষ বাপ্পা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর দখল করেন)।

এই জাতির ২৬ জন ১০১০ বৎসর রাজত্ব করে। 'রাওয়াল' উপাধি নেওয়ার পর থেকে বর্তমান রাণা অমর সিংহ পর্যন্ত আরও ২৬ জন ৪৬১ বৎসর রাজত্ব করে। (মন্তব্য—জাহাঙ্গীর লিখেছেন ছাব্বিশ জন ১০১০ বছর রাজত্ব করেন এবং আরও ২৬ জন ৪৬১ বৎসর। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। টড বলেন, এই বংশের প্রবাদমূলক আদিপুরুষ কণক সেন রামচন্দ্রের পুত্র লবের অধস্তত ত্রিষষ্টিতম বংশধর। তিনি পাঞ্জাব থেকে গুজরাটে আসেন ১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)। সুদীর্ঘকাল তারা কখনও হিন্দুস্থানের কোনও রাজার কাছে শির নত করেনি। বরাবরই বিদ্রোহীভাবাপন্ন স্বভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছে। ভূতপূর্ব সম্রাট বাবরের সময়েও রাণা সঙ্গ এই প্রদেশের রাজা, রায় এবং জমিদারদের জোটবদ্ধ করে এবং বিয়ানার কাছে এক জায়গায় এক লক্ষ আশি হাজার অশ্বারোহী ও কয়েক লক্ষ পদাতিক সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সর্বশক্তিমান আল্লার সহায়ে, ভাগ্যের জোরে ইসলামের বিজয়ী সৈন্য এই বিধর্মী সৈন্যদলকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত করে। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ সম্রাট বাবরের আত্মকথায় লিপিবদ্ধ আছে। আমার মহান পিতা—তাঁর দীপ্ত সমাধি অসীম মহিমার আলয় হোক—এই বিদ্রোহীদের দমনে অশেষ চেষ্টা করেছিলেন এবং বারংবার এদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দ্বাদশ বৎসরে তিনি নিজে চিতোর দুর্গ অধিকার করার জন্য যাত্রা করেন। এই দুর্গটি জন-অধ্যুষিত, পৃথিবীতে একটি সুরক্ষিত দুর্গ। চার মাস দশ দিন এই দুর্গ অবরোধ করার পর তিনি অমর সিংহের পিতার সৈন্যদের কাছ থেকে এই দুর্গ অধিকার করে এটি ধ্বংস করে ফিরে আসেন। রাণাকে বন্দী করার জন্য বিজয়ী বাহিনী বার বার চেষ্টা

করলেও সে চেষ্টা সফল হয়নি। পিতার রাজত্বের শেষের দিকে যেদিন তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন সেই দিনই তিনি আমাকে বিপুল সৈন্য-বাহিনী এবং বিশ্বস্ত সর্দারদের সঙ্গে দিয়ে রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় পাঠান। কিন্তু ভাগ্যদোষে এই দুই ব্যাপারেই সফলতা লাভ হয় না। বিফলতার কারণগুলির দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। অবশেষে আমি সিংহাসনে আরোহণ করেই অর্ধসমাপ্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য পুত্র পরভেজের অধিনায়কত্বে প্রথম সেনাবাহিনী পাঠাই। তার সঙ্গে যে সব প্রসিদ্ধ আমির রাজধানীতে ছিলেন তাঁরাও যান। প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রও পাঠানো হয়। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারের সাফল্য ও অসাফল্য সময় নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। এই সময়েই খসরুর বিদ্রোহের ব্যাপার ঘটে। আমাকে তাকে অনুসরণ করে পাঞ্জাবে যেতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে রাণার ব্যাপারটি যেমন ভাবে সমাধান হওয়া উচিত ছিল তা হয় না। আল্লার অনুগ্রহে খসরুর ব্যাপারের নিষ্পত্তি হলে আমার মন ঠাণ্ডা হয়। রাজকীয় পতাকা সগৌরবে আগ্রায় উড়তে থাকলে মহবত খান, আবদুল্লা খান এবং অন্যান্য সর্দারদের অধিনায়কত্বে রাজকীয় বাহিনী আজমীঢ় অভিযানে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত রাণার দেশ পদদলিত হাত থাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত ব্যাপারটি মনোমত নিষ্পত্তি না হওয়ায় আমার মনে হলো যে আগ্রায় বর্তমানে যখন আমার কিছুই করণীয় নাই তখন আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত না হলে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে না। এই স্থিরসিদ্ধান্তে আসার পর আমি আগ্রা দুর্গ ত্যাগ করে দরূহা উদ্যানে আসি।

পরদিন দশহরা উৎসবের দিন। চলতি রীতি অনুসারে হস্তী ও অশ্ব সজ্জিত করে আমার সম্মুখে আনা হয়। খসরুর মা ও বোনরা আমাকে বারংবার জানাতে থাকে যে সে এখন তার দুষ্কর্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত। পিতৃস্নেহের বন্যা আমার অন্তর প্লাবিত করছে দেখে আমি তাকে ডেকে পাঠাই। স্থির করি যে এখন থেকে প্রতি দিন সে আমার কাছে এসে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে।

এই উদ্যানে আমি আট দিন থাকে। ২৮শে তারিখ সংবাদ আসে যে রাজা রামদাস যাঁকে কিলিজ খাঁর সঙ্গে বংগাশ এবং কাবুলে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল—মারা গিয়েছেন। মিহর মাসের ১লা তারিখ আমি উদ্যান থেকে যাত্রা করি। খাজা জাহানকে আগ্রা নগরীর কার্য পরিচালনা ও প্রাসাদ-

রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বিদায় দিই। ২রা মিহর সংবাদ আসে যে সাহাবাদপ্যানায় অম্বর রাজ্যের (রাজপুতানার মধ্যে) সীমান্তে রাজা বাসো মারা গিয়েছেন।

এই মাসের ১০ই তারিখ আমি রূপবাসে আসি। রূপবাসের এখন নাম দেওয়া হয়েছে আমানাবাদ। পূর্বে এই জেলা রূপ খাবাসকে জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হয়। পরে মহবত খানের পুত্র আমানুল্লাকে এই জায়গা দেওয়ার পর আমার আদেশে তার নামেই জায়গাটির নামকরণ করা হয়। এখানে এগারো দিন কাটাই। এটা একটি নির্দিষ্ট শিকারের জায়গা। প্রত্যেক দিন অশ্বপৃষ্ঠে শিকার করতে যাই। এই অল্প কয়েকদিনে ১৫৮টি হরিণ-হরিণী এবং অন্যান্য পশু মারা পড়ে।

২৫শে তারিখ আমানাবাদ থেকে রওনা হই। ২রা আজান অর্থাৎ ১০ই রমজান কিলিজ খাঁয়ের মৃত্যুসংবাদ আসে। তিনি ছিলেন রাজ্যের একজন প্রধান কর্মী। ৮০ বছর বয়সে তিনি আল্লার কৃপা লাভ করেন। বিদ্রোহী আফগানদের শায়েস্তা করার জন্য তিনি পেশোয়ারে ছিলেন। তিনি ছয় হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মনসবদার ছিলেন।

মূর্তজা খান দক্ষিণী 'পুলতাবাজি' ক্রীড়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দক্ষিণীদের ভাষায় একে বলে 'ইয়াগানাগি' আর মোগলরা বলে 'সমসেরবাজি' অর্থাৎ তরবারির খেলা। কিছুদিন আমি তাঁর কাছে এই বিদ্যা শিখি। এই সময় তাঁকে 'ওয়ারজিম খাঁ' (ব্যায়ামবীর) উপাধি দিই।

আমি এই রীতি প্রচলন করি যে প্রতি রাত্রে আমার সামনে উপযুক্ত ব্যক্তি ও দরবেশদের আনতে হবে যাতে আমি নিজে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জমি, সোনা কিংবা বস্ত্র দান করতে পারি। এদের মধ্যে একজন নিবেদন করে যে 'আবজাদ' (অক্ষর গুণে সংখ্যা নিরূপণ) বিদ্যায় (বিজ্ঞানে) জাহাঙ্গীর নামটি আল্লা-হো-আকবর এই মহান বাক্যের সঙ্গে মিলে যায়। জাহাঙ্গীর ও আল্লা-হো-আকবর উভয় কথাই এই নিয়মে হয় ২৮৮। এই মিলটি খুব শুভপ্রদ মনে হওয়ায় যে লোকটি এই মিলটি আবিষ্কার করেছে তাকে জমি, ঘোড়া, নগদ টাকা ও পোশাক উপহার দিই।

৫ই সওয়াল অর্থাৎ ২৬শে আজান আমার আজমীঢ় প্রবেশের দিন স্থির করা হয়। এইদিন সকালে আমি নগরের দিকে অগ্রসর হই। দুর্গ এবং মহামান্য খাজার সমাধির অট্টালিকাগুলি দেখা গেলে আমি পায়ে হেঁটে এক ক্রোশ পথ যাই। পথের দুই ধারে বিশ্বাসী লোক দাঁড় করিয়ে ফকির এবং দরিদ্রদের অর্থ

বিতরণের ব্যবস্থা করি। দিনের চারঘড়ি অতীত হওয়ার পর আমি শহরের জনঅধ্যুষিত অঞ্চলে প্রবেশ করি ও পাঁচঘড়ির মধ্যে পুণ্য সমাধি দর্শন করার গৌরবলাভ করি। সমাধিস্থল পরিদর্শনের পর প্রাসাদে যাই। পরদিন আদেশ দিই যে আমার বিশ্রামস্থলে এই নগরীর ক্ষুদ্র ও মহৎ এবং বিদেশী পথিকদের আমার কাছে আনতে হবে যাতে আমি তাদের প্রকৃত অবস্থানুযায়ী কিছু দান করে তাদের সুখী করতে পারি।

৭ই আজর আমি পুষ্কর সরোবরের তীরে শিকার করতে যাই। স্থানটি হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। এই জায়গার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুন্দর গল্প সকলে বলে যা কোনও বুদ্ধিমান লোকই বিশ্বাস করতে পারে না। জায়গাটি আজমীঢ় থেকে তিন ক্রোশ দূরে। দুই তিন দিন আমি এই সরোবরের তীরে হাঁস, বক ইত্যাদি জলচর পাখী শিকার করি। তারপর আজমীঢ় ফিরে আসি। সরোবরের তীরে পুরাতন ও নতুন অনেক মন্দির আছে। হিন্দুরা একে বলে দেবহরা। বিদ্রোহী অমরের কাকা রাণা শঙ্কর—যিনি আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে একজন বড় রাজা ছিলেন—এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি বিশাল মন্দির এখানে নির্মাণ করেন। আমি এই মন্দির দেখতে যাই। একটি কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তি। তার গলা থেকে ওপর পর্যন্ত দেখতে শূকরের মত। শরীরের অন্য অংশ মানুষের মত। হিন্দুদের অপদার্থ ধর্মীয় বিবরণ এই যে একদা পরমেশ্বর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই মূর্তি পরিগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এইজন্য তারা এই মূর্তিকে প্রিয় মনে করে পূজা দেয়। আমি এই কুৎসিত মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিই। এই মন্দির দেখার পর পাহাড়ের শীর্ষে একটা সাদা গম্বুজ চোখে পড়ে। সেখান থেকে অনেক লোক চারপাশ দিয়ে নেমে আসছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি একজন যোগী সেখানে বাস করে। নির্বোধ লোকগুলি তাকে দেখতে গেলে সে তাদের হাতে এক মুঠা ময়দা (অন্যমতে নিষ্ঠিবন) দেয়। সেই ময়দা বা নিষ্ঠিবন মুখে দিয়ে নির্বোধরা যে সব পশুর কোনও সময়ে ক্ষতি করেছে তাদের মত আওয়াজ করতে থাকে এবং মনে করে যে সেই পশু নিপীড়নের পাপ থেকে তারা মুক্তি পেল। আমি মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলে যোগীকে তাড়িয়ে দিতে আদেশ দিই। মন্দিরের মধ্যে যে দেবমূর্তি ছিল তাও নষ্ট করতে বলি।

আর একটি বিশ্বাস হিন্দুদের ছিল যে পুষ্কর হ্রদের তল পাওয়া যায় না।

পরীক্ষার পর দেখা গেল জলের গভীরতা কোনও জায়গায়ই বারো হাতের বেশী নয়। সরোবরের চারপাশ মাপ করা হলো। মাপ হলো দেড় ক্রোশের মত।

১৬ই আজর সংবাদ এলো যে প্রহরীরা একটি ব্যাঘ্রীর সন্ধান পেয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ি। বাঘটিকে শিকার করে ফিরে আসি। কয়েক দিন পর একটি নীলগাই (ষাঁড়) শিকার করি। আদেশ দিই যে আমার সম্মুখে এর চামড়া ছাড়িয়ে মাংস রেঁধে গরীবদের খাওয়াতে হবে। দুইশ লোক জমায়েত হয়ে এই রান্না মাংস খায়। তাদের প্রত্যেককে আমার নিজের হাতে অর্থদান করি।

এই মাসেই সংবাদ আসে যে গোয়ার পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা চুক্তি অমান্য করে সুরাট বন্দর ও তার কাছাকাছি চারটি বাণিজ্যপোত আক্রমণ করে বহুসংখ্যক মুসলমানকে আটক করেছে এবং জাহাজের মালপত্র লুঠ করেছে। এই ঘটনার কথা শুনে আমার মনে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয়। ১৮ই আজর আমি এই বন্দরের ভারপ্রাপ্ত মুকারব খাঁকে একটি ঘোড়া, একটি হাতি ও একটি সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিয়ে সেখানে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পাঠাই।

একথা আগেই উল্লেখ করেছি যে খাজার সমাধি দর্শনের পর আমার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বিদ্রোহী রাণার বিদ্রোহ দমন। এই উদ্দেশ্যে আমি নিজে আজমীঢ়ে উপস্থিত থেকে আমার ভাগ্যবান পুত্র বাবা খুররামকে রাণার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠাতে মনস্থ করি। এই মনোভাবটা আমার কাছে বেশ ভাল মনে হয়। ৬ই 'দাই' নির্দিষ্ট সময়ে আনন্দ ও সফলতার আশা বুকে নিয়ে সে শুভযাত্রা করে। খান আজমের অধিনায়কত্বে যে সেনাদল পূর্বে নিযুক্ত হয়েছিল, তা ছাড়াও আমার পুত্রের সঙ্গে বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাই। খাজার সমাধিক্ষেত্রের জন্য আমি একটি বড় কড়াই তৈরী করার আদেশ দিই। এই দিনই সেটা আনা হয়। আমি এইখানে থাকার সময় এই পাত্রে গরীবদের জন্য খাদ্য রন্ধন করে এখানকার সমস্ত দরিদ্রদের একত্র করে খাওয়ানোর জন্য আদেশ দিই। পাঁচ হাজার লোক জমায়েত হয়। সকলেই উদর পূর্ণ করে আহার করে। আহার শেষ হলে আমি প্রত্যেক দরবেশকে নিজের হাতে অর্থদান করি।

৩রা ইসফানদারমুজ ইসলাম খাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌছায়। ১০২২ হিজরা সনে ৫ই রজব বৃহস্পতিবার (২১শে আগস্ট, ১৬১৩) তিনি মারা যান। তাঁর আগে কোনও অসুখ ছিল না। এক দিনের অসুখেই সব শেষ হয়ে যায়।

তিনি তাঁদেরই একজন যাঁরা প্রাসাদে লালিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে যে চারিত্রিক সৌন্দর্য ও কর্তব্যজ্ঞানের স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল তা অন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে বঙ্গদেশ শাসন করেছিলেন। এই প্রদেশের মধ্যে যে সব জায়গা কোনও জায়গীরদার অথবা সাম্রাজ্যের প্রধানদের শাসনে ছিল না সেই সব স্থানও তাঁর শাসনের আওতায় এনেছিলেন। যদি মৃত্যু তাঁকে অসময়ে গ্রাস না করতো তাহলে তিনি অনেক কাজের মত কাজ করতে পারতেন।

খান আজম নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে রাণার বিরুদ্ধে অভিযানে সম্রাটপুত্রকে নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু দেখা গেল যে আমার পুত্র (সাজাহান) তাঁকে সর্বপ্রকারে উৎসাহ দান ও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা সত্ত্বেও নিজ কাজে মনোযোগ না দিয়ে নিজের অপদার্থ নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন। এই কথা শুনতে পেয়ে আমি তাঁর কাছে আমার বিশ্বস্ত অনুচর ইব্রাহিম হুসেনকে পাঠাই এবং আমার এই প্রীতিপূর্ণ বার্তাটি জানাতে বলি যে যখন তিনি বুরহানপুরে ছিলেন সেই সময় প্রতিদিন আমার কাছে এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য প্রার্থনা জানাতেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে এই কাজ সম্পন্ন করতে পারলে তিনি ইহকাল ও পরকালের সুখ অর্জন করবেন। যদি এতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয় তা হলে তিনি শহিদ হবেন এবং জীবিত থাকলে গাজির সম্মানলাভ করবেন। আমার কাছে তিনি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের যতটা সাহায্য চেয়েছেন আমি তা দিয়েছি। তারপরও তিনি জানিয়েছেন যে রাজপতাকা-বাহীদের ঐদিকে চলাচল না হলে এই ব্যাপারের শেষ নিষ্পত্তি করতে অনেক কষ্ট হবে। তাঁর পরামর্শ মত আমি আজমীঢ় এসেছি এবং এই অঞ্চল আমার আগমনে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হয়েছে। তিনি নিজেই সম্রাটপুত্রকেও পাঠাতে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি উপদেশ অনুযায়ী কাজ করা হলেও, কেন তিনি যুদ্ধভূমি থেকে পা তুলে নিয়েছেন এবং এই প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন? বাবা খুররামের সঙ্গ থেকে আমি এ পর্যন্ত বিচ্যুত হইনি। তবু তাঁর (খান আজমের) ওদিককার ব্যাপার সম্পূর্ণ জানা থাকায় এবং তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বাবা খুররামকে পাঠিয়েছি। আমি এই আশা করি যে তিনি দিবারাত্র আমার পুত্রের প্রতি কর্তব্য করবেন এবং আনুগত্য ও সদিচ্ছা প্রদর্শন করবেন। যদি তিনি এর ব্যতিক্রম করে যে কাজ করতে চেয়েছিলেন তা না করেন

তাহলে তিনি জেনে রাখুন যে তাতে তিনি নিজেরই অনিষ্ট সাধন করবেন।

ইব্রাহিম হোসেন তাঁর কাছে এই কথাগুলি বিস্তৃত ও সঠিকভাবে তাঁর মনে দৃঢ়মূল করার জন্য ব্যক্ত করেন। কিন্তু এতে কোনও ফল হয় না। তিনি তাঁর নির্বুদ্ধিতা ও একগুঁয়েমির পথ থেকে বিচ্যুত হননি। বাবা খুররাম যখন দেখতে পায় যে সেখানে তাঁর উপস্থিতি গণ্ডগোলেরই কারণ হয়ে উঠেছে তখন সে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখে এবং আমার কাছে নিবেদন করে যে তাঁকে সেখানে রাখা আর কোনও রকমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁর এইরূপ আচরণের একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর সঙ্গে খসরুর সম্পর্ক (খসরু তাঁর জামাতা)। আমি তখন মহবত খাঁকে উদয়পুরে যেয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে আদেশ দিই এবং রাজপ্রাসাদের দেওয়ান তাকিকে তাঁর সন্তান ও পোষ্যদের মান্দসুর থেকে আজমীঢ়ে আনতে পাঠাই।

এই মাসের ১১ই তারিখ সংবাদ আসে যে রাম সিংয়ের পুত্র বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন দলীপকে তার ছোট ভাই রাও সুরজ সিং বিশেষভাবে পরাজিত করেছে। হিসার সরকারের কোনও এক জেলায় দলীপ গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। সুরজ সিংকে তার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়। ফৌজদার হাসিম ও ঐ অঞ্চলের অন্যান্য জায়গীরদার তাকে আটক করে এবং বন্দী হিসাবে আমার দরবারে পাঠায়। সারংবার দুষ্কার্য করার জন্য তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এই চরম শাস্তি অনুরূপ রাজদ্রোহীদের কাছে সাবধান বাণীরূপে বিবেচিত হবে। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ রাও সুরজ সিংহের মনসবে পাঁচশ পদাতিক ও দুইশ অশ্বারোহী বৃদ্ধির আদেশ দিই।

এই মাসের ১৪ই তারিখ বাবা খুররামের কাছ থেকে সংবাদ আসে যে রাণার অতি প্রিয় হস্তী 'আলম গুমান' এবং আরও ১৭টি হস্তী বিজয়ী সেনাদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের প্রভুও শীঘ্রই ধরা পড়বে।

শুভ রাজ্যাভিষেকের পর নবম নববর্ষ উৎসব

আমার রাজ্যাভিষেকের পর নবম বর্ষ শুরু হলো ১০২৩ হিজরা সনে (১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

৯ই সফর, শুক্রবার রাতের দুইপ্রহর একঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর জগৎ-উত্তপ্তকারী রবি তাঁর গৌরব ও সম্মান স্থান মেষ রাশিতে কিরণ বর্ষণ করলেন। দিনটা ফারওয়ারদিন মাসের ১লা। নববর্ষ সম্মেলন উৎসব শুরু হলো আজমীঢ়ের আনন্দময় পরিবেশে। সেই শুভ সময়ে আমি সৌভাগ্যের প্রতীক সিংহাসনে উপবেশন করি। রীতি অনুযায়ী মহার্ঘ্য বস্ত্র, মণিমুক্তা ও রত্নখচিত জিনিস দিয়ে প্রাসাদ সজ্জিত হলো। এই শুভ সময়ে 'আলম গুমান' (জগতের গুণ্ডা—টড) নামে হস্তী যা আমার নিজস্ব হস্তীশালায় স্থান পাওয়ার উপযুক্ত এবং বাবা খুররাম প্রেরিত আরো সতরটি হস্তী রাণার সম্মুখে আনা হলো। এই দৃশ্যে রাজভক্ত সকলেরই মন পুলকে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ শুভজনক জানতে পেরে নববর্ষের ২রা তারিখ 'আলম গুমানের' পৃষ্ঠে উঠে টাকাপয়সা ছিটোতে ছিটোতে যাই।

মহবত খাঁকে খান আজম ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাকে আনার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ১৫ই তারিখ তাঁদের নিয়ে আসেন। ১৯শে তারিখ মহান সম্মেলন (সভা) বসে। এই দিন মহবত খাঁর উপঢৌকন আমার সামনে রাখা হয়। রূপসুন্দর নামে আমার ব্যক্তিগত হাতিটি পুত্র পরভেজের কাছে পাঠাই। পরদিন খান আজমকে আসফ খাঁয়ের হেপাজতে পাঠাতে আদেশ দিই, যাতে তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে রাখা যায়। দুর্গে যাতে তাঁকে বন্দীর মত না রাখা হয় এবং তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ও খাওয়াপরার কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখার আদেশ দিই।

১৮ই উর্দিবিহিস্ত, খসরুকে নিষেধ করে পাঠাই যেন সে আর আমাকে কুর্নিশ করতে না আসে। এর কারণ এই যে তার প্রতি পিতৃস্নেহবশত এবং তার মা-বোনদের প্রার্থনামতে আদেশ দিয়েছিলাম যে সে প্রত্যহ এসে আমাকে কুর্নিশ করতে পারবে। তার হাবভাবে কোনও সরলতার চিহ্ন না দেখে এবং সর্বদাই তার মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত লক্ষ্য করে আমাকে শ্রদ্ধা জানাতেনিষেধ করি।

মহামান্য পিতার আমলে কান্দাহার, জমিন্দাওয়ার ও নিকটবর্তী স্থানের শাসক ছিলেন—স্থলতান হোসেন মির্জার পুত্র এবং সা তমাস্প ফাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাফ্ফর হোসেন মির্জা ও রুস্তম মির্জা। তাঁরা বারংবার আমার পিতার কাছে এই আবেদন জানাচ্ছিলেন যে নিকটবর্তী খোরাসানে আবদুল্লা খাঁয়ের উপস্থিতির জন্য তাঁরা শাসনভার ছেড়ে আসতে পারছেন না। যাই তিনি (আকবর) কোনও একজনকে পাঠান, তা হলে ঐ দেশের শাসনভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেতে পারেন। তাঁরা উপর্যুপরি এই প্রার্থনা করায় তিনি সা বেগ খানকে—যিনি এখন 'খান দুরাণ' উপাধিতে ভূষিত—কান্দাহারে, জমিন্দাওয়ার এবং তৎসংলগ্ন স্থানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান এবং মির্জাদের অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁর দরবারে আসার ফর্মান প্রেরণ করেন। তাঁরা পৌছানোর পর প্রত্যেকের উপযুক্ততা বিবেচনা করে অনুগ্রহ দেখান এবং কান্দাহারের রাজস্বের দুই-তিনগুণ আদায়ী মহালের ভার প্রদান করেন। কিন্তু অবশেষে যে ভাবে কার্য পরিচালনা করা উচিত ছিল তা না করায় ক্রমে ক্রমে এ মহালগুলির অবস্থা খারাপ হয়। আমার পিতার জীবদ্দশাতেই মুজাফ্ফর হোসেন মারা যান। মির্জা রুস্তমকে খানখানানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর একটি ছোট জায়গীর ছিল। আমার সিংহাসন আরোহণের পর তাঁকে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য সীমান্তের কোনও প্রদেশে প্রেরণ করবো বলে ডেকে পাঠাই। যখন তিনি আসেন সেই সময় থাটা, কান্দাহার ও নিকটবর্তী অঞ্চলের শাসক মির্জা গাজি মারা যান। আমি তখন তাঁকে আটায় পাঠাব মনে করি, যেখানে তিনি সৎ স্বভাবের পরিচয় দিয়ে মনোমতভাবে ঐ প্রদেশ শাসন করতে পারবেন। তাঁকে পাঁচহাজারি মনসবদারি পদে উন্নীত করে, ব্যয়নির্বাহের জন্য দুই লক্ষ টাকা দিয়ে থাটা স্থবায় প্রেরণ করি। আমার বিশ্বাস ছিল যে তিনি ঐ সীমান্ত দেশে ভাল কাজ দেখাবেন। কিন্তু আমার আশা ব্যর্থ হলো। তিনি কোনও ভাল কাজই করলেন না। ওদিকে তিনি এমন অত্যাচার শুরু করলেন যে অনেকেই তাঁর দুষ্কার্য সম্বন্ধে নালিশ জানাতে লাগলো। এমন সব সংবাদ আসতে লাগলো যে তাঁকে ডেকে পাঠাতে হলো। তাঁকে আনার জন্য একজন দরবারের কর্মচারী যায়। ২৬শে উর্দিবিহিস্ত তাঁকে নিয়ে আসা হয়। তিনি আল্লার মানুষদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করায় ন্যায়বিচারের জন্য এই ব্যাপারে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করে তাঁকে অনিরাই সিং দলনের

হাতে তুলে দিই—যাতে তিনি এই ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করে দেখার পর দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি এমন শাস্তি বিধান করতে পারবেন যা অপরের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে পারে।

এই সময়ে আহদাদ আফগানের পরাজয় সংবাদও এসে পৌঁছয়। ঘটনাটি এই। মুতাকিদ খাঁ একদল সেনা নিয়ে পেশোয়ার জেলায় 'পুলাম গুজারে' এবং খান দুরাণ আর একদল সেনা নিয়ে আফগানিস্থান থেকে এসে সেই কালামুখ দুর্বৃত্তের পথ অবরোধ করে। এই সময় পিস্‌বুলাঘ থেকে মুতাকিদ খাঁয়ের কাছে সংবাদ আসে যে আহদাদ বড় রকমের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে জালালাবাদ থেকে আট ক্রোশ দূর কোট্‌টিরায় গিয়েছে এবং সেখানকার কয়েকজন রাজানুগত লোককে হত্যা করেছে, অনেককে বন্দী করে তিরায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে এবং জালালাবাদ ও পিস্‌বুলাঘ আক্রমণ করার মতলব করেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মুতাকিদ খাঁ তার সঙ্গের সেনাবাহিনী নিয়ে অতি দ্রুত রওনা হন। পিস্‌বুলাঘে উপস্থিত হয়ে শত্রু কোথায় আছে সন্ধান নেবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। ৬ই বুধবার সকালে তাঁর কাছে সংবাদ আসে যে আহদাদ ওখানেই আছে। আল্লার কৃপার ওপর নির্ভর করে—যে কৃপা আল্লার সিংহাসনের সেবক এই অধীনের ওপর আছে—তিনি রাজবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত করে শত্রুর দিকে এগিয়ে যান। শত্রু তখন চার-পাঁচ হাজার অভিজ্ঞ সেনানী সহ উদ্ধতভাবে অসতর্ক অবস্থায় সেখানে বসেছিল। সে সন্দেহ করতে পারেনি যে খান দুরাণের সৈন্য ছাড়াও নিকটেই আর একটি দল তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। রাজকীয় বাহিনী আসছে সংবাদ পেয়ে এবং সৈন্য চলাচলের লক্ষণ দেখতে পেয়ে এই হতভাগা হতবুদ্ধি হয়ে তার বাহিনীকে চারভাগে ভাগ করে নিজে বন্দুকের গুলির লক্ষ্যর বাইরে একটা নিরাপদ উঁচু জায়গায় বসে তার লোকদের যুদ্ধ করতে পাঠায়। বিজয়ী বন্দুকধারী সৈন্যরা বিদ্রোহীদের ওপর গুলি নিক্ষেপ করে তাদের অনেককে দোজকে (নরকে) পাঠায়। মুতাকিদ খাঁ তার কেন্দ্রের সেনাদের এগিয়ে এনে, শত্রুদের দুই-তিনবারের বেশী শর নিক্ষেপের সুযোগ না দিয়ে, তাদের পিছু হটিয়ে তিন-চার ক্রোশ অনুসরণ করে ও দেড় হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহীকে হত্যা করে। তরবারের আওতার বাইরে যারা ছিল তাদের প্রায় সকলেই আহত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে পালায়। বিজয়ী সেনা সে-রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রেই থাকে এবং সকালে ছয়শ কাটা

মুণ্ডু নিয়ে পেশোয়ারের দিকে যাত্রা করে। সেখানে ছিন্নমুণ্ডের স্তম্ভ বানায়। ৫০০ ঘোড়া, অগুন্তি পশু ও জিনিসপত্র এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে পড়ে। তিরার বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ পক্ষের কোনও খ্যাতনামা লোক মারা যায়নি।

১লা খুরদাদ বৃহস্পতিবার বাঘ শিকারের জন্য পুষ্কর যাই। শুক্রবার বন্দুক দিয়ে দুইটি বাঘ মারি। সেই দিনই নকিব খাঁর মৃত্যুসংবাদ জানতে পারি। উক্ত খাঁ সইফি সৈয়দ বংশের। আদি বাসভূমি কাজউইন। তাঁর পিতা মির আবদুল লতিফের সমাধিস্থল আজমীঢ়ে। তাঁর মৃত্যুর দুই মাস পূর্বে তাঁর স্ত্রী মাত্র ১২ দিন অসুখে ভুগে মারা যান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। আমি স্ত্রীর কবরের পাশে তাঁর কবর দেওয়ার আদেশ দিই। খাজার পুণ্য সমাধি প্রাঙ্গণে তাঁদের কবর দেওয়া হয়।

আহদাদের সঙ্গে যুদ্ধে মুতাকিদ খাঁ মনের মত কাজ দেখাতে তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ 'লস্কর খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করি। বাবা খুররামের কাজে নিযুক্ত করে এবং কয়েকটি উপদেশ দিয়ে দয়ানত খাঁকে উদয়পুরে পাঠানো হয়েছিল। ৭ই খুরদাদ তিনি ফিরে আসেন এবং বাবা খুররামের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক বিবরণ দেন। সিংহাসনারোহণের পূর্বে ফিদাই খাঁ আমার ভৃত্যের কাজ করতো। রাজ্যাভিষেকের পর তাকে সেনাবাহিনীর বক্সির পদে নিযুক্ত করি। সে আমার কাছ থেকে অনেক অনুগ্রহ পায়। এই মাসের ১২ই তারিখ সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

মির্জা রুস্তম তাঁর দুষ্কার্যের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করায় এবং আমার মহানুভবতা তাঁকে ক্ষমা করার দাবী জানালে তাঁকে এই মাসের শেষে হাজির করার আদেশ দিই। তাঁকে একটি সম্মানসূচক পোশাক দিয়ে আমাকে কুর্নিশ করার অনুমতি দিই।

তির মাসের ১১ই তারিখ রবিবার রাত্রে আমার ব্যক্তিগত হস্তীশালার একটি হস্তিনী আমার সম্মুখেই একটি বাচ্চা প্রসব করে। হস্তীর গর্ভকাল কতদিন জানার জন্য আমি বারংবার আদেশ দিয়েছিলাম। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো মেয়ে বাচ্চার গর্ভবাসকাল আঠারো মাস আর পুরুষ বাচ্চার ১৯ মাস। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সাধারণত তার মাথা আগে বেরোয়। আর হাতির বাচ্চা হওয়ার সময় আগে বেরোয় পা। বাচ্চা হওয়ার পরই তার মা পা দিয়ে বাচ্চার গায়ে ধুলো ছিটিয়ে দেয় এবং তাকে আদর করার ভাব দেখাতে

থাকে। বাচ্চাটা অল্পক্ষণের জন্য মাটিতে পড়ে থাকে। তারপর উঠে মায়ের স্তনের দিকে যায়।

১৪ই তারিখ গোলাপপাশি (গোলাপজল ছিটানো) উৎসব হয়। অনেক আগে থেকেই এই উৎসব 'আব-পাশি' (জল ছিটানো) নামে পরিচিত ছিল। আগেকার দিনের বহু প্রচলিত রীতির মত এটাও চলে আসছে।

৫ই আমুরদাদ (জুলাই মাসের মাঝামাঝি, ১৬১৪) রাজা মানসিংহের মৃত্যু সংবাদ আসে। উপরোক্ত রাজা আমার মাননীয় পিতার একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। আমার অনেক বিশিষ্ট কর্মচারীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছি। তাঁকেও সেখানকার কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর আইনসম্মত উত্তরাধিকারী মির্জা ভাও সিংকে ডেকে পাঠাই। আমি যুবরাজ থাকার সময় সে আমার অনেক কাজ করেছে। যদিও হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে রাজারপরলোকগত জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহের পুত্র মহাসিংয়ের ওপর এই পরিবারের কর্তৃত্ব ও প্রধানত্ব বর্তায়, তবু আমি তাঁর দাবী মেনে না নিয়ে ভাও সিংকে মির্জারাজা উপাধিতে সম্মানিত করে তাকে চারহাজারপদাতিক ও তিনহাজার অশ্বারোহীর মনসবে উন্নীত করি। তাকে তার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি অম্বর প্রদান করি। মহাসিংয়ের মনকেও শান্ত করে এবং সান্ত্বনা দিয়ে তার পূর্বের মনসব পাঁচশ বাড়িয়ে দিই এবং গরজা পরগণা তাকে ইনাম স্বরূপ দিই। একটি রত্নখচিত ছোরাবন্ধ, একটি অশ্ব এবং সম্মানসূচক পোশাকও তার কাছে পাঠাই।

আমুরদাদ মাসের ৮ই তারিখ আমার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করি। ক্রমে আমি জ্বর ও শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হই। রাজ্যের অনিষ্ট হতে পারে মনে করে আমার পরিচিত ও আত্মীয়দের কাছে এই কথা গোপন রাখি। চিকিৎসক ও হেকিমদের কাছেও কিছু প্রকাশ করি না। এই ভাবে কয়েকদিন গেলে আমার অসুখের কথা নূরজাহান বেগমকে বলি যার তুল্য ভালবাসার পাত্রী আমি আর কাউকেই মনে করি না। দুষ্পাচ্য খাদ্য থেকে বিরত থাকি। হালকা রকমের খাদ্য খেয়ে আমার নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত দেওয়ান-খানায় যাই যতদিন না আমার গায়ের ত্বকে দুর্বলতা (গুটি) দেখা যায়। হারেমের কয়েকজন প্রবীণা মহিলা আমার অবস্থা জানতে পেরে বিশ্বাসী কয়েকজন চিকিৎসককে, যেমন হেকিম মসিউজুমান, হেকিম আবুল কাশিম এবং হেকিম আবদুস্ সক্কুরকে সংবাদ দেন। জ্বর একই ভাবে চলছে। তার ওপর

তিন রাত্রি অভ্যাসমত সুরাপান করায় আমার দুর্বলতা আরও বেড়ে যায়। এই রকম অশান্ত অবস্থায় যখন শারীরিক দুর্বলতা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে তখন আমি মহামান্য খাজার সমাধিস্থলে যাই এবং সেই পবিত্র স্থানে সর্বশক্তিমান আল্লার দরবারে আরোগ্যের প্রার্থনা জানাই। সুস্থ হলে দরিদ্রদের ভিক্ষা ও অর্থদান করবো এই শফৎ করি। পরম শক্তিমান আল্লার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া আমার শরীরে স্বাস্থ্যের পোশাক পরিয়ে দিলে ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করি। মাথাব্যথা অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল। হেকিম আবদুস্ সকুরের ঔষধে ক্রমশঃ তা কমে আসে। ২২ দিনের মধ্যে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্বের মত হয়। প্রাসাদের ভৃত্যরা এবং সমস্ত জনসাধারণ আল্লার এই করুণার জন্য সিন্নি দেয়। আমি কারও কাছে দান স্বরূপ কিছু গ্রহণ করি না। আদেশ দিই যে প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে তাদের ইচ্ছামত ভিক্ষা যেন গরীবদের বিতরণ করে।

১০ই শারিওয়ার থাটার সুবেদার তাজ খাঁ আফগানের মৃত্যুসংবাদ আসে। তিনি সাম্রাজ্যের একজন বিশিষ্ট আমির ছিলেন।

অসুখের সময় আমার মনে হয় যে আমি যখন অন্তরে অন্তরে খাজা মুইন্‌উদ্দিনের কানফোঁড়া ক্রীতদাস এবং আমার জন্মের জন্য তাঁর কাছে ঋণী, তখন আমি প্রকাশ্যে কান বিদ্ধ করে তাঁর কানবেঁধা ক্রীতদাসদের একজন বলে নিজেকে চিহ্নিত করবো। ১২ই শাহরিয়ার (জাহাঙ্গীরের জন্মমাস) আমি আমার দুই কান বিদ্ধ করে প্রত্যেকটিতে উজ্জ্বল মুক্তা পরি। আমার প্রাসাদের ভৃত্যরা এবং অনুগত বন্ধুবান্ধবরা এই ব্যাপার দেখার পর সকলেই আগ্রহভরে কর্ণবিদ্ধ করে তাদের নিজস্ব অথবা আমার দেওয়া মুক্তা ও চুনী রূপ আন্তরিকতার উজ্জ্বল সৌন্দর্যে নিজেদের ভূষিত করেন। ক্রমে ক্রমে আহদিরা এবং আরও অনেকের মধ্যেও এই ব্যাপারের ছোঁয়াচ লাগে।

৬ই আবান করাউলদের (শিকারী) কাছ থেকে সংবাদ আসে যে ছয় ক্রোশ দূরে তিনটি বাঘ দেখা গিয়েছে। মধ্যাহ্নের পর রওনা হয়ে তিনটি বাঘই বন্দুক দিয়ে শিকার করি। এই মাসের ৮ই তারিখ দেওয়ালি উৎসব শুরু হয়। আমার প্রাসাদের পরিচারকদের দুই রাত আমার সামনে ক্রীড়া-কসরৎ দেখানোর আদেশ দিই। হার-জিতের খেলা চলে।

এই মাসের ৮ই তারিখ পুত্র খুররামের কর্মস্থল উদয়পুর থেকে সিকান্দার মুইন্ করাউলের (শিকারী) শবদেহ আজমীঢ়ে আনা হয়। সে আমার

পুরাতন ভৃত্য ছিল। আমি সম্রাটপুত্র থাকাকালে সে বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার কাজ করেছে। আমি করাউলদের ও তার আত্মীয়স্বজনকে তার শবদেহ রাণা শঙ্করের পুকুরপাড়ে কবর দেওয়ার আদেশ দিই।

১২ই আজর পূর্বদেশের সীমান্তস্থিত কুচবেহারের জমিদারের কাছ থেকে ইসলাম খাঁ যে দুইটি কন্যা গ্রহণ করেন তাদের এবং ৯৪টি হস্তী আমার সামনে আনা হয়। কয়েকটি হস্তীকে আমার ব্যক্তিগত হাতিশালে রাখার আদেশ দিই। এই দিনই ইসলাম খাঁর পুত্র হুসাং বাংলা থেকে আমার দরজা চুম্বনের সম্মানলাভ করে। সে দুইটি হস্তী, ১০০টি মোহর ও একশ টাকা উপঢৌকন দেয়। এই রাতে আমি পরলোকগত সম্রাটকে (আকবর) স্বপন দেখি। তিনি বলছেন—"আমার কথা ভেবে আজিজ খাঁর—যে হচ্ছে খান আজম—দোষ ক্ষমা করো" এই স্বপন দেখার পর আমি তাকে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে ডেকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করি।

আজমীঢ়ের কাছে একটি সুন্দর ছোট্ট নদী আছে। নদীর প্রান্তে একটা ছোট্ট প্রস্রবণ। তার জল এক দীর্ঘ ও প্রশস্ত পুকুরে জমা হয়। আজমীঢ়ে এই জলই সব চেয়ে ভাল। উপত্যকা ও প্রস্রবণই 'হাফিজ জামাল' নামে খ্যাত। আমি এখানে আসার পর জায়গাটি খুব সুন্দর দেখে এখানে একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণের আদেশ দিই। এক বছরের মধ্যে সেখানে এমন একটি গৃহ ও তৃণভূমি নির্মিত হয় যে পর্যটকরা পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানেই এমন দেখতে পাবেন না। ৪০ গজ × ৪০ গজ একটা তৈরী জলাধারে কৃত্রিম ঝরণার মধ্য দিয়ে প্রস্রবণের জল ঝরে পড়ছে। ঝরণার জল দশ-বারো গজ উপরে উঠছে। জলাধারের কিনারে একটি অট্টালিকা তৈরী করা হয়েছে। যেখানে পুকুর আর প্রস্রবণ আছে সেখানেও মনোমুগ্ধকর বিশ্রাম আবাস, চমৎকার কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সমস্ত অট্টালিকা দক্ষ কারিগর দিয়ে তৈরী করিয়ে দক্ষ চিত্রকর ও নিপুণ শিল্পীদের কারুকার্যে মণ্ডিত করা হয়েছে। জায়গাটি আমার নামের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও নাম দেওয়ার জন্য এর নাম দিই—'চশমা-ই-নুর' অর্থাৎ আলোর ঝরণা। একমাত্র ত্রুটি এই যে এটা কোনও বড় নগরে অথবা যেখানে লোকজন সদাসর্বদা যাতায়াত করে এমন জায়গায় হয়নি। নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকে আমি প্রায় প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার এখানে থাকি। কয়েকটি শব্দের মধ্যে এর সমাপ্তির তারিখ যাতে পাওয়া যায় তা চিন্তা করে বের করতে অনেককে বলি। স্বর্ণকারদের সর্দার

সৈদা গিলানি একটি সুন্দর পংক্তি আবিষ্কার করে—'মহল-ই-সা নুরুদিন জাহাঙ্গীর' (১০২৪)। এই কথাগুলি একটি প্রস্তর-ফলকে খোদাই করে অট্টালিকার প্রবেশদ্বারে লাগানোর জন্য আদেশ দিই।

দাই মাসের প্রথম দিকে পারস্যের বণিকরা ইয়াজদের বেদানা ও কারিজের ফুটি যা খোরাসানের ফুটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ে আসে। এই ফল তারা প্রচুর নিয়ে আসে। কিছু কিছু দরবারের সমস্ত কর্মচারী এবং সীমান্তের আমিরদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাঁরা এর জন্য পরম দাতা আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এমন সুস্বাদু ফুটি ও বেদানা আমি আগে খাইনি। প্রতি বৎসর বাদাক্সান থেকে ফুটি এবং কাবুল থেকে বেদানা আনাই। কিন্তু ইয়াজদের বেদানা ও কারিজের ফুটির সঙ্গে তার তুলনা চলে না। আমার মাননীয় পিতা (আল্লার আলোই এ কথার সাক্ষ্য হোক) খুব ফল ভালবাসতেন। আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হলো এই ভেবে যে তাঁর বিজয়দীপ্ত কালে পারস্য থেকে এইরকম ফল হিন্দুস্থানে আসেনি যা খেয়ে তিনি অশেষ তৃপ্তিলাভ করতে পারতেন। অনুরূপ অনুশোচনা হয় এই মনে করে যে আমার পিতার নাসিকা জাহাঙ্গীরি আতরের (গোলাপী আতর) সুগন্ধে তৃপ্ত হয়নি। নূর-জাহান বেগমের জননীর চেষ্টায় আমার রাজত্বকালে এই আতর আবিষ্কৃত হয়। যখন তিনি গোলাপজল তৈরী করেন তখন রেকাবির ওপর ফেনা ভাসতে থাকে। সেই ফেনার ওপর জলপাত্র থেকে গরম গোলাপজল ঢালা হয়। তিনি সেই ফেনা একটু একটু করে হাতে তুলে নেন। যখন প্রচুর গোলাপজল তৈরী হয় তখন বেশ খানিকটা ফেনা পাওয়া যায়। এই ফেনার এমন তীব্র সুগন্ধ যে হাতের তেলোতে এক ফোঁটা ঘষলে সারা সভা-গৃহ সুগন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন অসংখ্য গোলাপকুঁড়ি এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে। এর তুল্য সুগন্ধি-দ্রব্য আর নেই। এর গন্ধে যেন বদ্ধ হৃদ্স্পন্দন আবার চলতে থাকে। শুষ্ক প্রাণ মঞ্জুরিত হয়। এই আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ আমি আবিষ্কারিকাকে একটি মুক্তার মালা দিই। সলিমা সুলতান বেগম—আল্লার কৃপারশ্মি তাঁর সমাধির ওপর বর্ষিত হোক—তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনিই এর নাম দেন—'আতর-ই-জাহাঙ্গীরি। (মন্তব্য—সলিমা জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেকের সপ্তম বর্ষে মারা যান। সুতরাং এই আতরের আবিষ্কার জাহাঙ্গীরের লেখার অনেক আগেই হয়েছিল।)'

ভারতের আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। দাই মাসে লাহোরে—

যে স্থান পারস্য ও হিন্দুস্থানের মাঝখানে—তুঁতগাছে অজস্র ফল ধরেছে যা মিষ্টতায় ও সুগন্ধে যে ঋতুতে এই ফল ফলে তারই অনুরূপ। কিছুদিন এই ফল খেয়ে লোকে খুব আনন্দ পায়। ঐ দেশের সংবাদ-লেখকরা এই কথা লিখেছে।

এই সময় বক্তিয়ার খাঁ কালোয়াত দরবেশের পোশাকে হাজির হন। আদিল খাঁর সঙ্গে তাঁর নিকট সম্বন্ধ। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে বখ্তিয়ার খাঁর বিবাহ দেন। তাঁকে ধ্রুপদ সঙ্গীতের গুরু রূপে বরণ করেন। প্রথম আসরে আমি তাঁকে দশ হাজার টাকা, নানা ধরনের পঞ্চাশ খণ্ড বস্ত্র এবং মুক্তার মালা দিই। তাঁকে আসফ খাঁর অতিথিরূপে রেখে তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য আদেশ দিই। এটা ঠিক বোঝা গেল না যে তিনি আদিল খাঁর অনুমতি ছাড়াই এখানে এসেছেন না আদিল খাঁই তাঁকে ছদ্মবেশে এখানে পাঠিয়ে দরবারের হাবভাব এবং এখানকার সংবাদ সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছেন। আদিল খাঁর সঙ্গে তাঁর যেরূপ আত্মীয়তা তাতে খুব সম্ভবতঃ তাঁর অজ্ঞাতসারে তিনি এখানে আসেননি। এই সময়ে বিজাপুরে আমাদের দূত আছেন—মির জামালুদ্দিন হোসেন। তাঁর রিপোর্টে এই কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ তিনি লিখেছেন যে মহামান্য সম্রাট বখ্তিয়ার খাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় আদিল খাঁও তাঁর (জামালুদ্দিনের) প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করছেন। প্রতিদিনই তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন বেড়ে যাচ্ছে। রাত্রে তাঁকে কাছে বসিয়ে তিনি ধ্রুপদ সঙ্গীত শোনান, যে সঙ্গীত তিনি (আদিল খাঁ) নিজে রচনা করেছেন এবং যার নাম দিয়েছেন—'নেরিস' (তারুণ্য)। শেষে লিখেছেন—"যখন আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি পাব অবশিষ্ট কথা সেই সময় জানাব।"

এই সময় জিরবাদ (সুমাত্রা) থেকে একটা পাখী আনা হয় যার রং তোতার মত কিন্তু শরীরের আকৃতি ছোট। এই পাখীর একটা বিশেষত্ব এই যে পা দিয়ে গাছের ডাল বা দাঁড় যার ওপর ওকে রাখা হয়—আঁকড়ে ধরে। তারপর এক-একবার ডিগবাজি খায়। এইভাবে সারারাত কাটায় এবং নিজের মনেই ফিস্ ফিস্ করে। সকাল হলে পাখীটি ডালের মাথায় উঠে বসে। যদিও লোকে বলে যে জন্তুদেরও পূজা-অর্চনা করার ভাব আছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই অনুশীলনটি সংস্কারগত। পাখীটি কখনও জল খায় না। যদিও অন্য পাখীরা জল খেয়ে বাঁচে কিন্তু এর কাছে জল বিষতুল্য।

বাহমন মাসে একের পর এক শুভ সংবাদ আসে। প্রথম শুভ সংবাদ রাণা বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং দরবারের কাজে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমার মহা ভাগ্যবান পুত্র স্থলতান খুররাম এমন জায়গায় ঘাঁটি করে সৈন্যদের ছড়িয়ে রেখেছিল যে লোকে বলতো এই সব জায়গার খারাপ আবহাওয়া এবং বন্য প্রকৃতির জন্য লোক থাকতে পারে না। তা ছাড়া রাজকীয় সৈন্য নিয়ে গ্রীষ্মের তাপ ও বর্ষার অবিরাম বর্ষণ উপেক্ষা করে বারংবার রাণার অনুসরণ করে ঐদিকের অধিবাসীদের পরিবারবর্গকে বন্দী করে রাণার পক্ষে ব্যাপার এমন গুরুতর করে তুলেছিল যে রাণা একথা পরিষ্কার বুঝেছিল যে এইভাবে আর কিছুদিন চললে হয় তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে না হয় বন্দী হতে হবে। আর কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে সে বশ্যতা ও আনুগত্যের পথই বেছে নেয়। তার মাতুল শুভকরণের সঙ্গে হরিদাস ঝালা নামে তার একজন বিশ্বস্ত লোককে সঙ্গে দিয়ে আমার ভাগ্যবান পুত্রের কাছে প্রেরণ করে এই আবেদন জানায় যে যদি আমার পুত্র তার অপরাধ মার্জনা করে তার মন শান্ত করে এবং তার জন্য শুভ পাঞ্জা (জাহাঙ্গীর পাঞ্জা) আনার ব্যবস্থা করে তাহলে সে নিজে এসে আমার পুত্রকে কুর্নিশ করবে এবং তার উত্তরাধিকারী পুত্রকে দরবারে প্রেরণ করবে অথবা অন্য রাজাদের মত সে স্বয়ং দরবারের একজন ভৃত্য হিসাবে কাজ করবে। সে আরও প্রার্থনা জানায় যে বৃদ্ধবয়সের জন্য তাকে স্বয়ং দরবারে হাজির হওয়ার বিষয়ে যেন ক্ষমা করা হয়। আমার পুত্র তার নিজের দেওয়ান মোল্লা স্থকুরুল্লার সঙ্গে তাদের আমার কাছে পাঠায়। এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়ার পর আমি মোল্লা স্থকুরুল্লাকে 'আফজল খাঁ' উপাধি এবং তার সহকারী স্থন্দর দাসকে 'রায়-রায়ান' উপাধিতে ভূষিত করি। আমার উচ্চমন কোনও সময়ই যতদূর সম্ভব প্রাচীন বংশ ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করেনি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে অমর সিং ও তার পূর্বপুরুষরা তাদের পার্বত্য রাজ্য ও আবাসের দুরধিগম্যতার বন-গৌরবে হিন্দুস্থানের কোনও রাজার বশ্যতা স্বীকার করেনি। এইভাবে বশ্যতা স্বীকার আমার রাজত্বকালেই ঘটলো। পুত্রের অনুরোধে রাণার অপরাধ ক্ষমা করে সন্তোষজনক ফার্মান লিখে তাতে আমার শুভ পাঞ্জার (পাঞ্জামুবারক) ছাপ দিই। আমি আমার পুত্রকেও একটি সদয় ফার্মান পাঠিয়ে জানিয়ে দিই যে সে যদি এই ব্যাপারের শেষ নিষ্পত্তি করতে পারে তাহলে খুব খুশী হব। আমার পুত্রও ফার্মান সহ মোল্লা স্থকুরুল্লা ও স্থন্দর

দাসের সঙ্গে রাণার মাতুল ও হরিদাসকে রাণার কাছে পাঠিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সম্রাটের অনুগ্রহলাভের ভরসা জানায়। তারা রাণাকে আমার শুভ পাঞ্জাছাপ সহ ফার্মান দেয়। স্থির হয় যে বাহমন মাসের ২৬শে রবিবার রাণা এবং তার পুত্র আমার পুত্রকে সম্মান জানাতে আসবে।

দ্বিতীয় শুভ সংবাদ বাহাদুর খাঁর মৃত্যু। সে ছিল গুজরাটের শাসক সম্প্রদায়ের বংশোদ্ভূত এবং সেখানকার বিদ্রোহ ও অশান্তি সৃষ্টির পাণ্ডা। পরম শক্তিমান আল্লা তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাঁর দয়ার আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

তৃতীয় শুভ সংবাদ পর্তুগীজ ভাইসরয় ওয়ারজার পরাজয়। সে সুরাট দুর্গ ও বন্দর দখল করার বিশেষ চেষ্টা করেছিল। সুরাট বন্দরের প্রবেশপথে ইংরাজ—যারা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল এবং পর্তুগীজদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ইংরাজদের কামানের আগুনে অধিকাংশ জাহাজই ভস্মীভূত হয়। যুদ্ধ করার ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ায় উপায়ান্তর না দেখে পর্তুগীজ ভাইসরয় গুজরাট বন্দরসমূহের ভারপ্রাপ্ত শাসক মুকারব খাঁয়ের কাছে লোক পাঠিয়ে জানায় যে সে শান্তি চায়, যুদ্ধ চায় না। ইংরাজরাই এই যুদ্ধ শুরু করেছে।

আর একটি সংবাদ এই যে কয়েকজন রাজপুত অম্বরকে আক্রমণ ও হত্যার সঙ্কল্প করে। তারা গুপ্তভাবে সুযোগ বুঝে তার কাছে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে একজন তাকে সামান্য আঘাত করতে সমর্থ হয়। যে লোকগুলি অম্বরের কাছাকাছি ছিল তারা রাজপুতদের বধ করে এবং অম্বরকে তার আবাসে নিয়ে আসে। আর একটু বেশী আঘাত লাগলেই অম্বরের প্রাণ যেতো।

এই মাসের শেষে যখন আজমীঢ়ের সীমার মধ্যে শিকারে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময় আমার ভাগ্যবান পুত্র খুররামের পরিচারক মহম্মদ বেগ আমার পুত্রের কাছ থেকে এসে তার একখানি পত্র দেয় এবং বলে যে রাণা তার ছেলেদের সঙ্গে এসে সম্রাটপুত্রকে সেলাম দিয়েছে। বিবরণ পত্রেই লেখা আছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার মুখ আল্লার দৈবদরবারের দিকে তুলে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য নতজানু হই। মহম্মদ বেগকে একটি ঘোড়া, একটি হাতি ও একটি রত্নখচিত ছোরা দিয়ে জুলফিকার খাঁ উপাধিতে সম্মানিত করি। চিঠিতে জানা গেল—২৬শে বাহমন রবিবার রাণা শিষ্টতা সহ যে রীতিতে অধীনস্থ ভৃত্যরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেইভাবে আমার ভাগ্যবান পুত্রকে

সম্মান জানায় এবং তার নিজস্ব বড় আকারের চুনী, কতকগুলি চিত্রিত দ্রব্য, সাতটি হস্তী যেগুলি আমাদের হাতে আগে ধরা পড়েনি ও নয়টি ঘোড়া উপঢৌকন দেয়।

আমার পুত্রও তার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করে। রাণা যখন তার পা ধরে তার দোষের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সে তখন তার মাথা চেপে ধরে তাকে সান্ত্বনা দেয়। সে রাণাকে একটি জমকালো সম্মানসূচক পোশাক, রত্নখচিত তরবারি, রত্নখচিত জিন সহ একটি ঘোড়া, রুপার হাওদা সহ তার নিজস্ব হাতি উপহার দেয়। তার সঙ্গীদের মধ্যে একশোর বেশী শিরোপা পাওয়ার মত যোগ্য লোক না থাকায় তাদের একশোটি শিরোপা, পঞ্চাশটি হাতি এবং ১২টি রত্নখচিত খাপোয়া (ছোরা) দেয়। জমিদারদের মধ্যে প্রথা এই যে তারা যখন রাজা বা রাজপুত্রদের সঙ্গে দেখা করতে যায় তখন তারা তাদের উত্তরাধিকারী পুত্রকে সঙ্গে আনে না। রাণা এই নিয়ম মান্য করে টিকা-প্রাপ্ত করণকে সঙ্গে আনেনি। জ্যোতিষীরা আমার পুত্রের সেই স্থান থেকে যাত্রার সময় অপরাহ্নে ঠিক করে দেওয়ায় সে রাণাকে বিদায় দেয় যাতে তার পুত্র করণকে কুর্নিশ করার জন্য পাঠাতে পারে। তার চলে যাওয়ার পর করণ এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাকেও পুত্র একটি সম্মানসূচক পোশাক, একটি রত্নখচিত তরবারি, ছোরা, স্বর্ণখচিত জিন ও হাতি উপহার দিয়ে করণকে সঙ্গে নিয়ে মহান দরবারে ফেরার জন্য সেইদিনই রওনা হয়।

৩রা ইস্ফানদারমুজ শিকার থেকে আজমীঢ় ফিরে আসি। ১৭ই বাহমন থেকে ঐ দিন পর্যন্ত তিনটি শাবক সহ একটি ব্যাঘ্র ও ১৩টি নীলগাই মারা পড়ে। ভাগ্যবান সম্রাটপুত্র ঐ মাসের ১০ই তারিখ শনিবার আজমীঢ় নগরের নিকটবর্তী দেবরাণী গ্রামে শিবির ফেলে। সমস্ত আমিরকে নিজ নিজ পদমর্যাদানুযায়ী উপঢৌকন নিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আদেশ দেওয়া হয়। পরদিন ১১ই রবিবার সম্রাটপুত্র আমার দর্শনলাভের সৌভাগ্য লাভ করবে স্থির হয়। তার সঙ্গে কার্যে নিযুক্ত সমগ্র বিজয়ীবাহিনী সহ পরিপূর্ণ জাঁকজমকের সঙ্গে পুত্র দরবারপ্রাসাদে প্রবেশ করে। ঐদিন দুই প্রহর দুই ঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর আমার সঙ্গে দেখা করবার সময় নির্দিষ্ট হয়। সেই সময় সে আমাকে আভূমিনত হয়ে প্রথামত শ্রদ্ধা নিবেদন করার সৌভাগ্য লাভ করে। সে এক হাজার আসরফি ও এক হাজার টাকা আমাকে নজরানা এবং আরও এক হাজার মোহর ও এক হাজার টাকা খয়রাতির জন্য প্রদান

করে। আমি পুত্রকে এগিয়ে আসতে বলে তাকে আলিঙ্গন করি। তার মাথায় ও মুখে চুম্বন করে তাকে বিশেষ ধরনের অনুগ্রহ দেখাই। শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নজরানা ও খয়রাতি প্রদানের পর সে প্রার্থনা জানায় যে করণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সৌভাগ্য অর্জনের সম্মান দেওয়া হোক। আমি তাকে নিয়ে আসতে আদেশ দিই। বক্সিরা নিয়মানুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করে তাকে আমার সম্মুখে হাজির করে। আভূমিনত হয়ে যথারীতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও কুর্নিশ করার পর পুত্র খুররামের অনুরোধে বৃত্তের দক্ষিণ ভাগের সম্মুখ ভাগে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিই। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর খুররামকে তার মাদের সঙ্গে দেখা করতে আদেশ দিই।

করণকে সম্মানিত করি একটি জমকালো সম্মানসূচক পোশাক ও রত্নখচিত তরবারি দিয়ে। করণ বন্যভাবাপন্ন হওয়ায় এবং বরাবর পার্বত্য অঞ্চলে থাকায় এবং এরূপ দরবার কখনও পূর্বে না দেখায় তার হৃদয় জয় করার জন্য প্রতিদিন তাকে নব নব অনুগ্রহ দেখাই। তার উপস্থিতির দ্বিতীয় দিনে একটি রত্নখচিত ছোরা, পরদিন রত্নখচিত জিন সহ একটি ইরাকি অশ্ব তাকে দেওয়া হয়। যেদিন সে জেনানাকক্ষের দরবারে যায় তাকে সেদিন নূরজাহান বেগমের পক্ষ থেকে একটি মহার্ঘ্য সম্মানসূচক পোশাক, রত্নখচিত তরবারি, জিন সমেত একটি অশ্ব, একটি হস্তী দেওয়া হয়। এর পর আমি তাকে একটি মূল্যবান মুক্তার মালা উপহার দিই। পরদিন হাওদা সহ একটি বিশেষ হস্তী দেওয়া হয়। আমি প্রত্যেক রকমের জিনিস তাকে দেব ইচ্ছা করায় তাকে তিনটি বাজপাখী, তিনটি শিকারী শ্যেন, একটি বিশেষ ধরনের তরবারি ও বর্ম, একটি বিশেষ রকমের উরস্ত্রান, দুইটি অঙ্গুরি তার মধ্যে একটি চুনীর আর একটি পান্নার, উপহার দিই। মাসের শেষে একশোটি বড় রেকাবের ওপর নানা ধরনের জিনিস—যেমন নানা ধরনের বস্ত্র, গালিচা, তাকিয়া, সোনার শিশিতে নানা রকমের গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি সাজিয়ে তাকে উপহার দেওয়ার আদেশ দিই। আহদিরা সেইগুলি হাতে এবং কাঁধে বয়ে দরবারকক্ষে নিয়ে যায়। সেখানেই সেগুলো তাকে উপহার দেওয়া হয়।

স্বর্গসদৃশ দরবারে সবিত খাঁ (দয়ানৎ খাঁ) প্রায়ই অশালীন বক্তৃতা করতো এবং বক্তৃতায় সর্বদাই ইতিমাদুদদৌলা এবং তাঁর পুত্র আসফ খাঁ সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করতো। আমি তার বক্তৃতা যে পছন্দ করছি না দুই-একবার সে ভাব প্রকাশ করেও তাকে এরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত হতে বলেছি। কিন্তু

আমার মুখের কথাই তার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি। আমার প্রতি ইতিমাদুদদৌলার শুভেচ্ছাকে আমি বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকি। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার পরিবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সুতরাং এই আচরণটি আমার কাছে খুবই কষ্টকর মনে হয়। একদিন রাত্রে বিনা কারণে এবং বিনা উদ্দেশ্যে সে তাঁর সম্বন্ধে অসন্তোষজনক কথা বলতে আরম্ভ করে এবং কথাগুলো এমন ফলাও করে বলে যে ইতিমাদুদদৌলার মুখে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠে। পরদিন সকালে আমি দরবারের একজন ভৃত্যের সঙ্গে তাকে আসফ খাঁর কাছে পাঠাই। আসফ খাঁকে এই কথা জানাতে বলি যে আগের দিন সন্ধ্যায় সে (সবিত খাঁ) তার পিতাকে অসন্তোষজনক কথা বলায় তাকে তার হাতে তুলে দিলাম। সে তাকে সেখানেই আটকে রাখতে পারে অথবা ইচ্ছা হলে গোয়ালিয়র দুর্গেও পাঠাতে পারে। তার পিতার কাছে যে দোষ করেছে তার ক্ষতিপূরণ না করলে আমি তাকে ক্ষমা করবো না। এই আদেশ অনুসারে আসফ খাঁ তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠায়।

গত বছরের নিয়মানুসারে এ বছরও যে সব দরবেশ ও অভাবী লোক সুবিখ্যাত প্রাসাদে জমায়েত হয়েছে রাতের দুই প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের আমার সম্মুখে আনার আদেশ দিই। দরবেশদের আমার নিজের হাতে পঞ্চান্ন হাজার টাকা দান করি। তা ছাড়া ১৪টি পুরা গ্রাম সমেত এক লক্ষ নব্বই হাজার বিঘা জমি, ২৬টি লাঙ্গল, ও এগারো হাজার খারওয়ার (এক খারওয়ার = হিন্দুস্থানি ১০ মণ) খাদ্যশস্য দান করা হয়। যে সব কর্মচারী ও ভৃত্য আমার প্রতি আনুগত্যবশতঃ কান বিঁধিয়েছিল, তাদের ৭৩২টি মুক্তা উপহার দিই, যার মূল্য ছত্রিশ হাজার টাকা।

সংবাদ আসে এই মাসের ১১ই তারিখ রবিবার রাত চার প্রহর আট ঘড়ির পর পরম শক্তিমান আল্লার দয়ায় রাজকুমার মুরাদের কন্যার গর্ভে সুলতান পরভেজের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। আমি তার নাম রাখি—'সুলতান দুর আন্দিস'।

আমার শুভ রাজ্যাভিষেকের পর দশম নববর্ষ উৎসব

১লা ফারওয়ারদিন শনিবার, ১৮ই সফর, হিজরা ১০২৪ সন (মার্চ, ১৬১৫) দিনের ৫৫ সেকেণ্ড অতিবাহিত হওয়ার পর রবি মীন রাশি থেকে তাঁর উচ্চ গৃহ মেষ রাশিতে গমন করেন। রবিবার রাত্রি তিনঘড়ির পর আমি সিংহাসনে উপবেশন করি। নিয়মিত প্রণালীতে ভোজ এবং উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিখ্যাত রাজা, মহান খান, প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং সাম্রাজ্যের মন্ত্রীরা সম্বর্ধনা জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আমি দাক্ষিণাত্য যাওয়ার মনস্থ করায় আবদুল করিম মামুরিকে মাণ্ডুতে যেয়ে আমার বাসের জন্য একটি নতুন বাড়ী তৈরী করতে এবং পূর্বতন রাজাদের বাড়ী মেরামত করতে আদেশ দিই।

৮ই তারিখ করণ সিংকে পাঁচহাজারি মনসবদারি পদে নিযুক্ত করে মাঝে একটি চুনী-বসানো মুক্তা ও পান্নার ছোট্ট জপমালা উপহার দিই—যাকে হিন্দুদের ভাষায় বলে 'স্মরণ'।

৯ই রবিবার দিনের বারোঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর সূর্যগ্রহণ হয়। পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগ রাহু গ্রাস করে। গ্রহণ আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে গ্রহণ শেষ হয়ে সূর্য মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আট ঘড়ি সময় কেটে যায়। নানা ধরনের দ্রব্য যেমন ধাতু, পশু এবং সবজি ফকির ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

২৯শে সফর (৩০শে মার্চ, ১৬১৫), সোমবার রাত দুই প্রহরের পর ধনু রাশিতে আসফ খাঁর কন্যার গর্ভে বাবা খুররামের এক পুত্রসন্তান জন্মে। আমি তার নাম রাখি—দারা সুখা। আশা করি তার জন্ম সাম্রাজ্যের পক্ষে অনন্তকাল কল্যাণকর এবং তার পিতার পক্ষে শুভজনক হবে।

১৪ই ফারওয়ারদিন ইরাণের রাজদূত মুস্তাফা বেগ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গুর্জিস্থানের (জর্জিয়া) কাজের ফয়সালা করে আমার মহান ভ্রাতা বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় ভরপুর একটি চিঠি দূত মারফৎ পাঠিয়েছেন। দূতের সঙ্গে পাঠিয়েছেন কয়েকটি ঘোড়া, উট ও এলেপ্‌পোর আরও কিছু জিনিস যা আমার ভাগ্যবান ভাইয়ের জন্য রুমএর দিক থেকে এসেছিল।

আমার পূর্ব অনুরোধানুযায়ী নটি বড় ইউরোপীয় শিকারী কুকুরও তিনি পাঠিয়েছেন।

এইদিন কাংড়াদুর্গ জয়ের উদ্দেশ্য যাত্রা করার জন্য মূর্তজা খাঁ আমার অনুমতি লাভ করেন। এরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে এমন কি সারা পৃথিবীতে নেই। ইসলাম ধর্মের সিংহনাদ যখন প্রথম হিন্দুস্থানে শোনা যায় তখন থেকে এই শুভ সময় পর্যন্ত যখন শাসনভার এই দীন সেবকের ওপর ন্যস্ত—এর মধ্যে কোনও সময়েই কোনও শাসক বা রাজা এই দুর্গ দখল করতে পারেনি। একবার আমার পিতার শাসনকালে পাঞ্জাবের এক সেনাবাহিনীকে এই দুর্গ দখল করতে পাঠানো হয়। তারা এই দুর্গ অনেকদিন অবরোধ করে রাখে। অবশেষে তারা যখন সিদ্ধান্তে আসে যে এই দুর্গ জয় করা সম্ভব হবে না, তখন এই সেনাবাহিনীকে অন্য প্রয়োজনীয় কাজে পাঠানো হয়। বিদায়কালে মূর্তজা খাঁকে সরঞ্জাম সহ আমার একটি নিজস্ব হাতি উপহার দিই। রাজা বাসোর পুত্র রাজা সূরজমলকেও—থাঁর দেশ ঐ দুর্গের কাছাকাছি—সেখানে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত করে তাঁর মনসবে ৫০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী বাড়িয়ে দিই।

বৃহস্পতিবার দিনের দুই প্রহর সাড়ে চার ঘড়ি অতিবাহিত হওয়ার পর সরফ (রবিগ্রহের স্বতুঙ্গস্থানে অবস্থান) শুরু হয়। এই শুভদিনে পরম আনন্দে এবং মহাগৌরবে সিংহাসনে উপবেশন করি। জনসাধারণ আমাকে সম্বর্ধনা জানায় এবং কুর্নিশ করে। দিনের এক প্রহর থাকতে 'চশমা-ই-নুরে' যাই। কথামত এইখানে আমার সামনে মহবত খাঁর উপঢৌকন উপস্থিত করা হয়। সুন্দর সুন্দর মণিমুক্তা, জড়োয়ার অলঙ্কার, নানারকমের সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং আরও নানা ধরনের জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এই জিনিসগুলির মধ্যে একটি রত্নখচিত খাপোয়ার (ছোরা) মূল্য এক লক্ষ টাকা। এরকম মূল্যবান ছোরা আমার নিজস্ব কোষাগারেও নেই। এ ছাড়া মণিমুক্তা ও অন্যান্য জিনিসের মূল্য এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা। সত্যই এটা খুব জমকালো উপঢৌকন।

ইরাণের শাসক আমাকে যে বিশেষ জাতের ঘোড়া পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণের ঘোড়া মহবত খাঁকে উপহার দিই। বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে আমি বাবা খুররামের প্রাসাদে যাই। সেখানে রাতের এক প্রহর পর্যন্ত অবস্থান করি। তার দ্বিতীয়বারের শ্রদ্ধার্ঘ্য সেইদিন আমাকে দেওয়া

হয়। প্রথম দিন যখন সে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তখন সে রাণার একটি প্রসিদ্ধ চুনী আমাকে দিয়েছিল। জহুরীরা এই রত্নটির মূল্য যাট হাজার টাকা ধার্য করে। তবে যে প্রশংসা জহুরীরা এই রত্নের করেছে এটা ঠিক ততটা প্রশংসার যোগ্য বলে মনে হয় না। এর ওজন ৪ টাঁক (৪ মাসা এক টাঁক)। এটা প্রথমে ছিল রাঠোর জাতির সর্দার রায় মলদেওয়ের সম্পত্তি। তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে একজন প্রধান শাসক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আসে তাঁর পুত্র চন্দ্রসেনের হাতে। তার দুরবস্থার সময় এটিকে রাণা উদয় সিংয়ের কাছে বিক্রয় করে। তার কাছ থেকে আসে রাণা প্রতাপের কাছে। তারপর রাণা অমর সিং পায়। তাদের পরিবারে অন্য কোনও মহার্ঘ্য জিনিস না থাকায় সে যেদিন আমার ভাগ্যবান পুত্র খুররামকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে আসে সেই দিন উপঢৌকন স্বরূপ এই চুনী এবং তার হাতিশালের সব কয়টি হাতি অর্পণ করে। আমি আদেশ দিই যে এই চুনীর সঙ্গে এই কথা খোদাই করে রাখতে হবে যে এটা রাণা অমর সিং সুলতান খুররামকে শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ দিয়েছে। এই দিন বাবা খুররামের উপঢৌকনের মধ্যে আরও অনেক জিনিস গ্রহণ করি। তার মধ্যে একটি ইউরোপীর নিপুণ কারিগরের তৈরী স্ফটিকের বাক্স। কয়েকটি মরকতমণি। তিনটি অঙ্গুরী, চারটি ইরাকি অশ্ব এবং আরও অনেক জিনিস যার মূল্য আশি হাজার টাকা। যেদিন তার বাড়ীতে যাই সেদিন সে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস আমার সামনে উপস্থিত করেছিল—যার মূল্য চার-পাঁচ লাখ টাকার কম হবে না। আমি এক লাখ টাকা মূল্যের জিনিস গ্রহণ করে অবশিষ্ট তাকে ফেরত দিই।

কুনওয়ার করণের বিদায়ের সময় আসন্ন হওয়ায় আমি বন্দুক দিয়ে আমার শিকার-নৈপুণ্য দেখাতে ইচ্ছা করি। ঠিক এই সময়েই শিকারীরা একটি ব্যাঘ্রীর সংবাদ নিয়ে আসে। আমার নির্ধারিত নীতি এই যে বাঘই আমি শিকার করবো। কিন্তু তার চলে যাওয়ার সময় হওয়ায় এবং এই সময়ের মধ্যে পুরুষ বাঘ পাওয়া যাবে না বিবেচনা করে আমি বাঘিনী শিকার করতে যাই। করণকে আমার সঙ্গে নিই। তাকে বলি যে বাঘিনীর শরীরের যেখানে সে গুলিবিদ্ধ করতে বলবে আমি সেখানেই আঘাত করবো। এই ব্যবস্থা ঠিক করে যেখানে বাঘিনীর সন্তান পাওয়া গিয়েছে সেইখানে যাই। সেখানে তখন ঝড়ো হাওয়া বইছে। তা ছাড়া, আমি যে হস্তিনীর পিঠে ছিলাম সেও বাঘিনীর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। শিকারে এই দুই গুরুতর

বাধা সত্ত্বেও আমি ঠিক তার চোখ তাক করে গুলি ছুঁড়ি। পরম শক্তিমান আল্লা এই রাজপুত্রের কাছে আমাকে লজ্জিত হতে দেননি। তারই কথামত বাঘিনীর চোখ গুলিতে বিদ্ধ করি। সেই দিনই করণ একটি বিশেষ ধরনের বন্দুকের জন্য আবেদন করায় তাকে একটি তুর্কি বন্দুক দিই।

৮ই উরদিবিহিস্ত আমার চান্দ্র বৎসরের ওজন উৎসব হয়। রৌপ্য ও অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে আমাকে ওজন করার পর সেগুলি উপযুক্ত ব্যক্তি ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৯ই তারিখ খান আজমকে আমার সম্মুখে হাজির করা হয়। সে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে আগ্রায় এসেছিল। তাকে এখানে পাঠানোর জন্য নির্দেশ যায়। যদিও সে অনেক অপরাধে অপরাধী এবং তার প্রতি যে ব্যবহার করেছি তা ঠিকই হয়েছে তবু তাকে যখন আমার কাছে আনা হয় এবং যখন আমার দৃষ্টি তার ওপর পড়ে তখন আমিই যেন তার চেয়ে বেশী লজ্জিত হলাম। তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে আমার কোমরে জড়ানো শালটি তাকে দিলাম।

তাবিয়ুর খাঁ আমার কাজে চার মাস নিযুক্ত থাকার পর আজ (১২ই উরদি-বিহিস্ত) তাকে যাওয়ার আদেশ দিই। আদিল খাঁকে তার মারফৎ একটি বার্তা পাঠাই। এই বার্তায় তাকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার লাভক্ষতির কথা ভেবে দেখতে বলি। তাবিয়ুর খাঁকে আমি যা বললাম তা ঠিক ঠিক ভাবে যাতে সে আদিল খাঁর মনে ঢুকিয়ে দেয় বিশেষভাবে সেই নির্দেশ দিলাম। আদিল খাঁকে যাতে সে আনুগত্য ও বশ্যতার পথে ফিরিয়ে আনতে পারে সেই চেষ্টা করতে বলি। তাকে বিদায় দেওয়ার সময় কিছু উপহার দিই। অল্প সময়ের মধ্যে সে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছ থেকে এবং আদেশমত রাজা ও আমিরদের নিকট থেকে যে উপহার পায় তার মূল্য এক লক্ষ টাকা।

১৪ই তারিখ পুত্র খুররামের পদ এবং পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়। তার মনসব ছিল বারো হাজার পদাতিক ও ছয় হাজার অশ্বারোহীর ও তার ভাই পরভেজের ছিল পনেরো হাজার পদাতিক ও আট হাজার অশ্বারোহীর। অন্য পুরস্কার ছাড়াও তার মনসব পরভেজের সমান করার জন্য আদেশ দিই। 'পাঁচি গজ' নামে আমার একটি ব্যক্তিগত হাতি বারো হাজার টাকা মূল্যের সরঞ্জাম সহ তাকে দিই।

রণভামভর দুর্গে বন্দী খান আজমের পুত্র আবদুল্লাকে তার পিতার

অনুরোধে এখানে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। সে আমার দরবারে হাজির হলে তার পায়ের শেকল খুলে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিই।

গুজরাট প্রদেশের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিজিলবাস খাঁ সেখানকার সুবেদারের কাছ থেকে ছুটি না নিয়ে দরবারে হাজির হয়। আদেশ দিই যে একজন আহদি তাকে বন্দী করে গুজরাটের শাসকের কাছে ফেরত পাঠাবে, যাতে তার দৃষ্টান্ত দেখে অন্য কেউ এমন কাজ করতে সাহস না পায়।

এই সময় কাশ্মীরের সংবাদ-লেখকরা নিম্নলিখিত ঘটনার কথা লিখেছিল। গদাই নামে একজন ধর্মপ্রাণ দরবেশ কাশ্মীরের একটি মসজিদে চল্লিশ বছর বাস করতেন। তিনি সেই মসজিদের মালিকদের তাঁর দেহত্যাগের দুই বছর আগে বলেছিলেন যে তিনি মসজিদের প্রাঙ্গণের এক কোণে তাঁর সমাধির স্থান নির্বাচন করবেন। মালিকরা বলেছিলেন—তাই হবে। তিনি তারপর একটি স্থান নির্বাচন করেন। তাঁর দেহত্যাগের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং প্রিয়জনদের জানান যে ওপর থেকে আদেশ এসেছে যে তাঁর দেহত্যাগ করে শেষ জগতে (পরলোকে) যাওয়ার সময় হয়েছে। উপস্থিত সকলেই এই কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলে—নবিরা এমন কোনও কথা বলেননি। সুতরাং তাঁর কথা কেমন করে বিশ্বাস করা যায়। তিনি বলেন—"হ্যাঁ, এই আদেশই আমি পেয়েছি।" তিনি তাঁর একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি ঐ দেশের কাজির পুত্রকে বলেন—"আমাকে কবরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচ হিসাবে আমার ৭০০ অঙ্কমূল্যের কোরাণটি নিও।" বৃহস্পতিবার এই কথা হয় এবং সেইদিনই তাঁর ঘরের জিনিসপত্র তাঁর পরিচিতদের ও শিষ্যাদের বিতরণ করেন। তারপর দিনের শেষে স্নানাগারে স্নান করতে চলে যান। উপরিউক্ত কাজিজাদা পরদিন শুক্রবারের সকালের নামাজের আগেই আসেন এবং মোল্লার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ নেন। তাঁর কক্ষের সামনে এসে দেখতে পান যে দরজা বন্ধ আছে। সেখানে একজন ভৃত্য বসে আছে। তিনি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করেন—ব্যাপার কি হয়েছে? ভৃত্যটি বলে, "মোল্লা আমাকে বলেছেন যে কক্ষের দরজা আপনা থেকে না খুললে আমি ভেতরে যেতে পারবো না।" এই কথা বলার কিছু পরই কক্ষের দরজা খুলে গেল। কাজিজাদা সেই ভৃত্যকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন যে মোল্লা মুখ কিব্‌লার দিকে করে জানু পেতে বসে আছেন। তাঁর দেহে কোনও স্পন্দন নাই। তাঁর আত্মা আল্লাকে সমর্পণ করেছেন। সেই মুক্তপুরুষই সুখী যিনি এত সহজে সমস্ত বন্ধনজাল

ছিন্ন করে এই পৃথিবী থেকে উড়ে চলে যেতে পারেন।

১৫ই শুক্রবার রাত্রে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেদিন রাতে আমি পুষ্করে কাটাই। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই। রাজা সুরয সিংয়ের নিজের ভাই কিষণ, ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালদাস নামক যুবককে রাজার ভকিল গোবিন্দদাস খুন করায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। বিবাদের কারণ লিখতে গেলে বিবরণ দীর্ঘ হয়ে পড়বে। কিষণ সিং আশা করেছিল যে গোপালদাস রাজারও (সুরয সিং) ভ্রাতুষ্পুত্র বলে তিনিও খুনী গোবিন্দদাসকে হত্যা করবেন। কিন্তু গোবিন্দ-দাসের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার কথা বিবেচনা করে রাজা ভ্রাতুষ্পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। রাজার তরফে এই অবহেলা দেখে কিষণ নিজেই প্রতিশোধ লওয়ার সঙ্কল্প করে যাতে তাদের বংশের রক্তপাত বিফল না হয়। তার এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিও মনে অনেকদিন চেপে রাখে। তারপর এক রাতে তার ভাই, বন্ধু, ভৃত্য সকলকে একত্রিত করে বলে এই রাতেই সে গোবিন্দদাসের প্রাণ নেবে, তাতে তার ভাগ্যে যাই হোক আর তাতে রাজার যে ক্ষতিই হোক সে গ্রাহ্য করে না। কি ব্যাপার ঘটতে চলেছে রাজা কিছুই জানতে পারেন না। ভোর হয়-হয়, এমন সময় কিষণ তার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র করণ এবং অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে আসে। রাজার প্রাসাদের ফটকের কাছে এসে কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন গোবিন্দদাসের বাড়ীতে পাঠায়। কিষণ নিজে অশ্বপৃষ্ঠে ফটকের কাছেই অপেক্ষা করতে থাকে। কিষণের লোকেরা গোবিন্দদাসের বাড়ীতে প্রবেশ করে সেখানে যারা পাহারায় ছিল তাদের হত্যা করে। এই লড়াই চলার সময় গোবিন্দদাস ঘুম থেকে জেগে উঠে হতচকিত হয়ে তরবারি হাতে নিয়ে প্রহরীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে। এদিকে কিষণ সিংয়ের লোকরা কিছু লোক হত্যা করে গোবিন্দদাসের সন্ধানে আসে এবং তাকে দেখতে পেয়েই হত্যা করে। গোবিন্দদাসের হত্যার সংবাদ কিষণের কাছে পৌঁছানোর আগেই সে অধৈর্য হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়। তার লোকজন তাকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখে বিব্রত হয়ে তাকে পায়ে হেঁটে যেতে বাধা দেয় কিন্তু সে গ্রাহ্য করে না। সে সেখানেই আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে তারা শত্রু মারা পড়েছে এই সংবাদ পেতো এবং সে অক্ষতদেহে পালিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু ভাগ্যের কলম অন্য রকম লিখেছে। কিষণ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে যেই ভিতরে প্রবেশ করেছে সেই সময় লোক-

জনের হট্টগোল শুনে অন্দরমহলে রাজাও জেগে উঠে তাঁর প্রাসাদের ফটকে তরবারি হাতে দাঁড়ান। চারদিক থেকে সবাই তখন সজাগ হয়ে বেরিয়ে এসে কিষণ সিংয়ের লোকদের দেখতে পায়। কিষণসিংয়ের লোকরা সংখ্যায় মাত্র দশ জনের মত দেখে তারা তাদের ঘিরে ফেলে। কিষণ সিং এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র করণ রাজার বাড়ীতে পৌছালে তারা তাদের আক্রমণ করে মেরে ফেলে। কিষণ সিং সাতটি এবং করণ নয়টি আঘাত পায়। এই খণ্ডযুদ্ধে দুই পক্ষের ৬৬ জন হত হয়—রাজার পক্ষের ৩০ এবং কিষণের পক্ষে ৩৬। সূর্যের আলো ফুটে উঠে পৃথিবী আলোকিত করার পর রাজা দেখতে পান যে তাঁর ভাই ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যাদের তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করতেন তারা মারা গিয়েছে এবং আর সকলে তাদের নিজ নিজ জায়গায় সরে পড়েছে। এই সংবাদ আমার কাছে পুষ্করে পৌছায়। তাদের ধর্মানুযায়ী সমস্ত মৃতদেহ দাহ করার আদেশ দিই এবং সত্যই কি ব্যাপার ঘটেছে আমাকে জানাতে নির্দেশ দিই। শেষে এটা পরিষ্কার জানা গেল যেভাবে এখানে লিখলাম ব্যাপারটা ঐ রকমই ঘটেছে এবং এর জন্য আর অতিরিক্ত তদন্তের আবশ্যক নেই।

এই মাসের শেষে সংবাদ আসে যে ইরাণের রাজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সফি মির্জাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। এই সংবাদে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়ি। অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে গিলানের একটি প্রসিদ্ধ নগর ফরাসে তিনি বিহবুদ নামে তাঁর এক ক্রীতদাসকে সফি মির্জাকে হত্যা করার আদেশ দেন। ১০২৪ হিজরা সন, ৫ই মহরম (২৫শে জানুয়ারী, ১৬১৫) সকালে স্নান করে মির্জা যখন তার বাড়ীর দিকে রওনা হয় সেই সময় এই ক্রীতদাস সুযোগ পেয়ে তরবারির দুইটি আঘাতে তাকে হত্যা করে। দিনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সেখ বাহাউদ্দিন মহম্মদ—যিনি ঐ দেশের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত এবং যাঁর ওপর ইরাণের সা'র অগাধ বিশ্বাস—জল ও কাদার মধ্যে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে সা'র কাছে যান এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে মৃতদেহ তুলে আর্দা বিলে প্রেরণ করেন যেখানে এই বংশের পূর্বপুরুষদের কবর-খানা। ইরাণ থেকে আগত অনেক ভ্রমণকারীর কাছে অনেক অনুসন্ধান করেছি কিন্তু তারা এমন কিছু বলতে পারেনি যাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি। পুত্রহত্যার নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর কারণ আছে যা এই কলঙ্কস্খালন করতে পারে।

তির মাসের ১৩ই তারিখ 'আব-পাসা' (গোলাপজল বর্ষণ) উৎসব পালিত

হয়। (আব-পাসা পারস্য দেশের একটি উৎসব। ১৩ই 'তির' সেখানে বৃষ্টিপাত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের অবসান হয়। তারই স্মরণে এই উৎসব প্রতি বৎসর পালন করা হয়)। এই উৎসবে দরবারের কর্মচারীরা পরস্পরের প্রতি গোলাপজল ছিটিয়ে আনন্দ করে। ১৭ই তারিখ আমানত খাঁকে ক্যাম্বে বন্দরের ভার দিই। মুকারব খাঁ দরবারে আসার জন্য প্রস্তাব করায় এই বন্দরের কর্মচারী পরিবর্তন করা হয়।

১৮ই তারিখ খানখানানের উপঢৌকন আমার সম্মুখে ধরা হয়। তিনি এই উপলক্ষে নানা রকমের জড়োয়ার অলঙ্কার এবং অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করিয়েছিলেন। তিনটি চুনী ও ১০৩টি মুক্তার অলঙ্কার, ১০০টি ইয়াকুত দিয়ে তৈরী অলঙ্কার, দুইটি রত্নখচিত ছোরা, একটি রত্নখচিত জলের কলসী, একটি রত্নখচিত তরবারি, ভেলভেট মোড়া একটি তীর ও এক লক্ষ টাকা মূল্যের একটি হীরার আংটি তিনি দেন। রত্ন ও রত্নখচিত জিনিস ছাড়াও তিনি দিয়েছিলেন—দাক্ষিণাত্য ও কর্ণাটকের বস্ত্র, নানা রকমের গিল্টি করা সাদামাঠা জিনিস। আর ১৫টি হাতি ও একটি ঘোড়া যার কেশর মাটি স্পর্শ করে। তাঁর পুত্র শা'নওয়াজ খানের উপঢৌকন পাঁচটি হাতি, ৩০০ খণ্ড নানা রকমের বস্ত্রও আমার সামনে রাখা হয়।

১৮ই তারিখ হুসাংকে 'ইকরাম খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি। বেহার সুবার একজন রাজপুত্র রুজ আফজল তার যৌবনকাল থেকে দরবারের স্থায়ী কর্মচারীরূপে কাজ করে এসেছে এবং সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার গৌরব লাভ করেছে। তার পিতা রাজা সংগ্রামের রাজ্যে তাকে রাজা করা হয়। (সংগ্রাম --বেহারের খরক্পুরের রাজা। জাহাঙ্গীর কুলি খাঁয়ের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন)। সংগ্রাম সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করায় যুদ্ধে নিহত হলেও আমি তার পুত্রকে একটি হস্তী দান করে তার নিজের রাজ্যে যাওয়ার অনুমতি দিই। জাহাঙ্গীর কুলি খাঁকেও একটি হাতি দেওয়া হয়। ২৪শে তারিখ কুনওয়ার করণের বারো বৎসর বয়স্ক পুত্র জগৎ সিং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তার পিতামহ রাণা অমর সিং ও তার পিতার আবেদনপত্রগুলি আমার কাছে দাখিল করে। উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে যে তার জন্ম হয়েছে তার চিহ্ন তার মুখে ফুটে উঠেছে। তাকে একটি পোশাক ও নানা অনুগ্রহ দেখিয়ে আনন্দ দান করি।

১৩ই আমুরদাদ, রবিবার রাত্রে মহান খাজা মুইনউদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকী হওয়ায় আমি তাঁর মহান সমাধিস্থলে যাই। সেখানে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত থাকি।

সেখানকার পরিচারক সুফিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে দিব্যভাব দেখাতে থাকে। আমি ফকির ও পরিচারকদের নিজের হাতে অর্থদান করি। মোট নগদ ছয় হাজার টাকা, ১০০টি আলখাল্লা, ৭০টি মুক্তা, প্রবাল, স্ফটিক প্রভৃতির জপমালা বিতরণ করি।

৮ই শাহরিয়ার একটি নূরজাহানি মোহর যা ৬৪০০টাকার সমমূল্য, ইরাণের রাজদূত মুস্তাফা বেগকে দিই। বঙ্গদেশের শাসক কাশিম খাঁকে দিই ৫টি চিতা। ১২ই তারিখ মির্জা রুস্তমের জ্যেষ্ঠপুত্র মির্জা মুরাদকে 'ইলতিফাৎ খাঁ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করি।

১৬ই তারিখ রাতে সবেবরাত উৎসব। ঐ দিন 'আনাসাগর' ঘিরে যে পাহাড়গুলি আছে তাতে এবং ঐ পুকুরের তীরে প্রদীপ জ্বালানোর আদেশ দিই। আমি নিজে আলোকসজ্জা দেখতে যাই। প্রদীপের আলোর প্রতিবিম্ব জলে পড়ে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। রাতের অধিকাংশ সময়ই অন্দরমহলের বেগমদের নিয়ে সেই পুকুরের ধারে কাটাই।

১৭ই তারিখ মির্জা জালালুদ্দিন, যিনি বিজাপুরে দূত হিসাবে গিয়েছিলেন, ফিরে আসেন এবং আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আদিল খাঁ তাঁর পক্ষ থেকে সৈয়দ কবির খাঁকে উক্ত মির্জার সঙ্গে আমার কাছে পাঠান। তাঁর সঙ্গে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন সোনা ও রূপার সরঞ্জাম সহ হাতি, আরবি ঘোড়া, মণিমুক্তা, রত্নখচিত জিনিস এবং ঐ দেশে তৈরি নানা রকমের বস্ত্র। ২৪শে তারিখ আদিল খাঁর চিঠিসহ উপঢৌকন আমার কাছে উপস্থিত করা হয়। এই দিনই সৌর বৎসরের ওজন উৎসব সম্পন্ন হয়।

২৬শে তারিখ পারস্যের দূত মুস্তাফা বেগ বিদায়গ্রহণ করেন। এখানে উপস্থিতির সময় তাঁকে যা দেওয়া হয়েছে তা ছাড়াও এখন কুড়ি হাজার টাকা নগদ, একটি সম্মানসূচক পোশাক দিই এবং তিনি যে পত্র নিয়ে এসেছিলেন তার উত্তরে একটি বন্ধুত্বভাবপূর্ণ চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে পাঠাই।

৫ই মিহির খানজাহানের সহযোগে মহবৎ খাঁ দাক্ষিণাত্যের কাজে নিযুক্ত হয়ে যাত্রা করেন। এই সময় যারা দাক্ষিণাত্যের কাজে নিযুক্ত হয় তাদের সংখ্যা ৩৩০ জন মনসবদার, তিন হাজার আহদি, উইমাকের ৭০০ অশ্বারোহী এবং ৩০০০ দালাজাক আফগান। মোটের ওপর এই বাহিনীর জন্য ধার্য হয় ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ত্রিশ লক্ষ টাকা, একদল রণপটু সশস্ত্র গোলন্দাজ ও যুদ্ধহস্তী। তারা দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করে।

২৩শে তারিখ ৯০টি হাতি আমার সামনে আনা হয়। এই হাতিগুলি কাশিম খাঁ কুচবেহার, মঘদের রাজা এবং উড়িষ্যার জমিদারদের বশীভূত করে পেয়েছিলেন। হাতিগুলিকে আমি একটি বিশেষ পিলখানায় রাখার আদেশ দিই।

আদিল খাঁ দাক্ষিণাত্যের ‘দুনিয়া দারাণ’দের (শাসকদের) অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে এবং আমেদনগর দুর্গ ও অন্য যেসব স্থান সাম্রাজ্যের সর্দারদের হাত থেকে বিদ্রোহীরা ছিনিয়ে নিয়েছে সেগুলি প্রত্যর্পণের অঙ্গীকার জ্ঞাপন করতে সৈয়দ কবিরকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ২৬শে তারিখ ফিরে যাওয়ার আদেশ পান। একটি সম্মানসূচক পোশাক, একটি হাতি ও একটি ঘোড়া উপহার পেয়ে সেইদিনই যাত্রা করেন।

এই সময় জাহাঙ্গীর কুলি খাঁয়ের চিঠিতে হতভাগ্য চিন্ কিলিজের মৃত্যু সংবাদ পাই। সাম্রাজ্যের প্রবীণ কর্মচারী কিলিজ খাঁর মৃত্যুর পর আমি এই দুষ্টবুদ্ধি চিন্ কিলিজকে আমিরি পদ দিয়ে জৌনপুরের মত প্রসিদ্ধ স্থানে জায়গীর দান করি। তার অন্যান্য ভাই ও আত্মীয়দেরও সহকর্মীরূপে তার সঙ্গে পাঠাই। লাহোরি নামে তার এক খল-প্রকৃতির ভাই ছিল। আমার কাছে অভিযোগ আসে—সে আল্লার আশ্রিত মানুষদের ওপর অত্যাচার করছে। আমি তাকে জৌনপুর থেকে আনার জন্য একজন আহদিকে পাঠাই। আহদিকে আসতে দেখে চিন্ কিলিজ খাঁর মনে অকারণে সন্দেহ জেগে ওঠে। সে তার অদূরদর্শী ভাইকে নিয়ে পালাতে মনস্থ করে। তার মনসব, তার কর্মস্থল, গৃহ, জায়গীর, অর্থ, সম্পত্তি, সন্তান এবং প্রজাবর্গ ফেলে রেখে সামান্য অর্থ, কিছু সোনা, কিছু রত্ন ও সামান্য কয়েকজন লোক নিয়ে জমিদারদের মধ্যে ঘুরতে থাকে। কয়েকদিন পূর্বে এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হই। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে সে কোনও জমিদারের কাছে উপস্থিত হলে সেই জমিদার তার কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে তাকে জমিদারি থেকে তাড়িয়ে দেয়। শেষে খবর আসে যে সে জোহির হাটে (তিরপুট ?) গিয়েছে। এই সংবাদ জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ পেয়ে এই মূর্খকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তারা সেখানে পৌঁছিয়েই তাকে ধরে ফেলে। তাকে জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর কাছে আনার ব্যবস্থা করার সময়ই সে দোজকের (নরক) পথে রওনা হয়ে যায়। যে সব লোক তার সঙ্গে ছিল তারা বলে যে কয়েকদিন আগে থেকেই সে অসুখে ভুগছিল। সেই অসুখেই সে মারা গেছে। কিন্তু এ কথাও শোনা

গেল যে যাতে তাকে বন্দী অবস্থায় জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর কাছে না যেতে হয় সেজন্য সে আত্মহত্যা করেছে। সে যাই হোক তারা তার শবদেহ সহ তার পুত্র ও ভৃত্য যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের নিয়ে এলাহাবাদে আসে। তাদের কাছে যা কিছু অর্থ ছিল জমিদাররাই নিয়েছিল। হায়রে, কালামুখ শয়তানদের নেমকহারামির কোনও শাস্তি হলো না।

"মানুষের জন্য নির্ধারিত কর্তব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাজা ও উপকারীর প্রতি কর্তব্য।"

এই সময় দহবিদের খাজা হাসিম—যিনি ট্রান্স-অক্সেনিয়াতে দরবেশ হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন—তাঁর এক শিষ্যের হাতে আমার কাছে চিঠি পাঠিয়ে এই রাজপরিবারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও এই মহান বংশের সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষের সম্বন্ধ ও বন্ধুত্বের কথা জানিয়েছেন। এই চিঠির সঙ্গে তিনি একটি ফরজি (কোট), একটি ধনুক এবং খাজাগি নামে এই দরবেশের বংশের একজনের উদ্দেশ্যে রচিত একটি কবিতা পাঠিয়েছেন। কবিতার শেষ পদটি এই :—

"খাজাগির কাছে হয়ে আছি নত
আমরা ভৃত্য খাজাগির।"

আমি এই কবিতাটির রীতিতে তৎক্ষণাৎ নিজ কলমে একটি চতুষ্পদী কবিতা লিখে সেইটির সঙ্গে এক হাজার মোহর খাজার কাছে পাঠাই।

"ওগো দরবেশ,
যতই আমার ওপর তোমার দয়া বাড়ছে দিনে দিনে,
ততই তোমার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আমার মনে।
শুভ বার্তা যেমন আনন্দে অন্তর করে পূর্ণ,
তেমনি তোমার অসীম দয়া বিষাদ করে চূর্ণ।"

কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন যে কেউ আমার কবিতার মত কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতে পারে এই আদেশ দিলে হকিম মসিউজ্জমান এই কবিতাটি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করেন :

"রাজ্যের বোঝা যদিও আছে আমার মাথায়,
প্রতি মুহূর্ত তবু কার্যে দরবেশ-চিন্তায়।
যদি, করতে পারি দরবেশ-মনে আনন্দ প্রদান,
তখনই বাড়িবে মোর সাম্রাজ্যের সম্মান।"

এই কবিতা রচনা করার জন্য হকিমকে এক হাজার মোহর উপহার দিই। ৭ই দাই পুষ্কর থেকে আজমীঢ় ফেরার সময় পথে ৪২টি শূকর শিকার করি।

২৫শে তারিখ শুক্রবার পুত্র খুররামের ওজন নেওয়ার উৎসব হয়। এখন তার চব্বিশ বছর বয়স। সে বিবাহ করেছে এবং তার সন্তানও হয়েছে। কিন্তু সে এখনও সুরাপান করে নিজেকে কলুষিত করেনি। এই দিন যখন তার ওজন নেওয়ার উৎসব হচ্ছে, আমি তাকে বললাম—"বাবা, তুমি এখন ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছ। রাজা ও রাজার ছেলেরা সুরাপান করে থাকে। আজ তোমার ওজন নেওয়ার উৎসব। আমি তোমাকে আজ নিজের হাতে সুরা দেব। এরপর তুমি ভোজের দিন, নববর্ষে এবং অন্যান্য বড় বড় উৎসবে সুরাপান করতে পার এ অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু তুমি মিতাচারির পথ অনুসরণ করে চলবে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অতিমাত্রায় মদ্যপান করে বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট করাটা ঠিক বলে মনে করেন না। মদ্যপানে যেটুকু লাভ সেইটুকুই গ্রহণ করা দরকার। বু'আলি—যিনি হেকিম ও চিকিৎসকদের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন—

মারাত্মক শত্রু, আবার পরম বন্ধু—সুরা।
আধিক্যে সর্পবিষ, অল্প মাত্রায় সুধা।
মাত্রাধিক্যে পরিণাম ভীষণ।
অল্প অতিশয় সুফল।"

অনেক পীড়াপীড়ি করে তাকে সুরা দেওয়া হলো। আমি ১৫ বছরের আগে মদ খাইনি। আমার শৈশবকালে দুই-তিনবার স্তন্যদায়ী ধাত্রীরা ওষুধ হিসাবে খাইয়েছিলেন। তাঁরা আমার মাননীয় পিতার কাছে একটু মদ চেয়ে নেন। একতোলা পরিমাণ মদের সঙ্গে জল ও গোলাপজল মিশিয়ে সর্দির ওষুধ হিসাবে খাওয়ান। যে সময় আমার মহামান্য পিতা ইউসুফজাই আফগানদের দমনের জন্য সিন্ধুনদীর তীরে আটক দুর্গে শিবির ফেলেন সেই দিন আমি ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যাই। অনেকটা পথ যাওয়ার পর আমার দেহে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। সেই সময় আমার মাননীয় খুল্লতাত মির্জা মহম্মদ হাকিমের অধীনস্থ ওস্তাদ সা কুলি নামে একজন বন্দুক-চালনায় অভ্যস্ত কর্মচারী আমাকে বলে যে যদি আমি এক পেয়ালা সুরাপান করি তাহলে আমার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হবে। এ সময়টা আমার যৌবনকাল আর সুরা-পানের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে মনে জাগে। আমি তখন আব্‌দার (পানীয় জল

সরবরাহকারী) মামুদকে হাকিম আলির বাড়ীতে যেয়ে আমার জন্য উগ্র পানীয় আনার জন্য নির্দেশ দিই। সে দেড় পেয়ালার মত পীতবর্ণের সুরা একটি ছোট্ট বোতলে আনে। আমি সেটা পান করি। তার স্বাদ আমার খুব ভাল লাগে। তারপর থেকেই আমি সুরাপান করতে শুরু করি। দিন দিন পানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ক্রমে নয় বছরে সুরাপানের মাত্রা দিনে চোদ্দ পেয়ালা এবং রাত্রে ছয় পেয়ালা মোট কুড়ি পেয়ালা ওঠে। এই সুরা ওজনে হিন্দুস্থানির ছয় সের এবং ইরাণের আধ মণ। ঐ সময়ে আমার খাদ্য ছিল একটি মুরগী, রুটি ও সবজি। তখন আমাকে নিষেধ করার সাহস কারও ছিল না। শেষে এমন হলো যে আমার হাতের অত্যধিক কম্পনে আমি নিজে পেয়ালা তুলে মদ খেতে পারতাম না, আনা পেয়ালা মুখে তুলে ধরতো। শেষে মহামান্য পিতার বিশেষ অন্তরঙ্গ হেকিম আবুল ফত্তের ভাই হেকিম হুমামকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে আমার অবস্থার কথা বলি। তিনি অকপট দুঃখ প্রকাশ করে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—জগদাধিপ, যেভাবে আপনি সুরাপান করেন, আল্লা না করেন, এইভাবে ছয় মাস চললে আর কোনও প্রতিকারের উপায় থাকবে না। শুধু সদিচ্ছার বশেই তিনি এই কথা বলায় এবং জীবন আমার কাছে অত্যন্ত মধুর ও প্রিয় হওয়ায় তাঁর কথা আমার মনে দাগ কাটে। সেই দিন থেকে আমি সুরাপানের মাত্রা কমিয়ে দিই এবং ফিলুনিয়া খেতে শুরু করি। (মন্তব্য ঃ—ফিলুনিয়া প্রতিষেধক ঔষধ। আবিষ্কারক গ্রীস দেশের টার্‌সাস্‌বাসী ফিলন। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী তার কিছু পূর্বে জন্মেছিলেন।) যে পরিমাণে সুরার মাত্রা কমিয়েছি সেই পরিমাণে ফিলুনিয়ার মাত্রা বাড়িয়েছি।

আমি আরও আদেশ দিই যে দুই ভাগ আঙ্গুরের সুরার সঙ্গে এক ভাগ আরক মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন সুরার পরিমাণ কমাতে কমাতে দৈনিক ছয় পেয়ালায় নামিয়ে আনি। প্রত্যেক পেয়ালার সুরার ওজন—সওয়া আঠারো মিশকাল। পনেরো বছর আমি এই পরিমাণ সুরাপান করে যাচ্ছি। একটু বেশীও না, কমও না। আমার সুরাপানের সময় রাত্রি—শুধু আমার শুভ রাজ্যাভিষেকের দিন বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ছাড়া। কারণ একটি আমার শুভ অভিষেকের এবং অন্যটি সপ্তাহের পবিত্র দিন। এই দুই দিন ছাড়া প্রত্যেক দিন দিনের শেষে (রাত্রে) সুরাপান করি কারণ বৃহস্পতিবার রাত্রি অবহেলা করে কাটানোর সময় নয় এবং শুক্রবারও মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা জানানোর

দিন। বৃহস্পতিবার ও রবিবার আমি মাংস খাই না। বৃহস্পতিবার নয়—কারণ এটি আমার শুভ অভিষেকের দিন, আর রবিবার নয়—কারণ এই দিন পিতার জন্মদিন এবং এই দিনটি তাঁর সম্মানিত প্রিয় দিন ছিল। কিছুকাল পর ফিলুনিয়ার পরিবর্তে আফিং খাওয়া ধরি। এখন আমার সৌর বৎসর হিসাবে বয়স ৪৬ বছর ৪ মাস হওয়ায় দিনের পাঁচ ঘড়ির সময় ৮ রতি এবং রাতের পাঁচ ঘড়ির সময় ৬ রতি আফিং খাই।

যখন বণিক আবদুল করিম ইরাণ থেকে হিন্দুস্থানে আসেন সেই সময় আমার মহামান্য ভ্রাতা সা' আব্বাস তার হাতে আমার জন্য একটি ইয়েমেনের নানা মূল্যবান মণির জপমালা ও ভেনিসীয় কারুকার্যমণ্ডিত অতি সুন্দর দুষ্প্রাপ্য পেয়ালা পাঠান। ৯ই বাহমন এইগুলি আমার কাছে উপস্থিত করা হয়।

এই বছরের শেষে সাম্রাজ্যের নানা দিক থেকে জয় ও সমৃদ্ধিলাভের সংবাদ আসে। প্রথম সংবাদ—আবদাদ আফগানির ব্যাপার। সে অনেকদিন পূর্ব থেকেই কাবুলের পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে তার সঙ্গে বহু আফগানি সমবেত করে। তাদের বিরুদ্ধে আমার মহামান্য পিতার সময় থেকে আমার সিংহাসনারোহণের দশ বছর পর্যন্ত বরাবরই সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছে। সে ক্রমে ক্রমে পরাজিত হতে থাকে। অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে তার দলের একাংশ বিতাড়িত এবং একাংশ হত হয়। কিছুকালের জন্য সে তার পরম নির্ভরস্থল চর্‌খে (দুর্গে) আশ্রয় নেয়। খান দুরাণ সন্ধান পেয়ে জায়গাটি ঘিরে রাখে। যাওয়া-আসার পথও বন্ধ করে দেয়। পশুদের ঘাস ও দুর্গবাসী মানুষদের আহার্যের অভাব হলে সে নিজে রাত্রে তার পশুগুলি পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে পাহাড়ের প্রান্তদেশে ঘাস খাওয়াতো। সে নিজে এই কাজ করতো এই জন্য তার লোকরাও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। শেষে এই সংবাদ খান দুরাণের কাছে পৌছায়। তিনি তাঁর একদল সর্দার ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্ধারিত রাত্রে গোপনে চর্‌খের কাছে গুপ্তভাবে থাকার জন্য নিযুক্ত করেন। এই দল নির্ধারিত রাত্রে গুপ্তভাবে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে অবস্থান করতে থাকে। খান দুরাণ ঘোড়ায় চড়ে সেই দিকে আসেন। সেই হতভাগ্য লোকগুলি তাদের পশু নিয়ে এসে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়। দুর্দশাগ্রস্ত আবদাদ নিজে তার দলবল নিয়ে লুকানো জায়গার ধার দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার সম্মুখে ধুলো উড়তে দেখতে পায়। সন্ধান করে বুঝতে পারে যে খান দুরাণ আসছেন। হতবুদ্ধি হয়ে সে ফিরে যেতে চেষ্টা করে। খানের দলের লোক

খানকে বলে—ঐ আবদাদ! খান তখন ঘোড়ার লাগাম আলগা করে আবদাদের দিকে ধাওয়া করেন। তাঁর যে সব লোক গুপ্তস্থানে ছিল তারাও রাস্তা অবরোধ করে তাকে আক্রমণ করে। অসমতল উঁচু-নীচু মাটি এবং ঘন জঙ্গলের জন্য লড়াই মাঝরাত পর্যন্ত চলে। অবশেষে আফগানরা পরাজিত হয়ে পাহাড়ের দিকে পালাতে থাকে। তাদের তিনশ' জন যোদ্ধা মারা যায় এবং একশ'জনকে বন্দী করা হয়। আবদাদ তার দুর্গ পুনরায় দখল করতে সক্ষম হয় না। সে কান্দাহারের দিকে মুখ ফিরায়। বিজয়ী সৈন্যরা চর্‌খে প্রবেশ করে এই হতভাগ্য লোকদের বাড়ী-ঘর নষ্ট করে তাদের সমূলে ধ্বংস করে।

আর একটি শুভ সংবাদ কুচক্রী অম্বরের পরাজয় এবং তার হতভাগ্য সেনা-বাহিনীর ধ্বংস। সংক্ষেপে বিবরণ এই যে—একদল প্রভাবশালী নেতা এবং একদল বর্গী (মারহাট্টি) যারা অত্যন্ত শক্ত মানুষ এবং এদেশে প্রতিরোধ সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ—তারা অম্বরের প্রতি বিরূপ হয়ে আনুগত্যের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সা'নওয়াজ খানের আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি এই সময় রাজকীয় সৈন্য সহ বালাপুরে অবস্থান করছিলেন। উক্ত খানের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে আদম খান, ইয়াকুত খান, অন্যান্য সর্দাররা, বর্গী সাদো রায় এবং বাপু কান্তিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সা'নওয়াজ খান তাদের প্রত্যেককে একটি করে ঘোড়া, হাতি, টাকা এবং সম্মানসূচক পোশাক পদমর্যাদানুযায়ী দান করে তাদের আনুগত্য ও কর্তব্যের পথে উত্তপ্ত করে তুলে তাদের সঙ্গে নিয়ে অম্বরের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। পথেই দক্ষিণীদের একদল সৈন্যের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের নেতা ছিল মহালদার আতস, দিলওয়ার, বিজ্‌লি, ফিরোজ ও আরও অনেকে। তারা যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়।

সেই দুর্বৃত্তের শিবিরের কাছাকাছি বিজয়ী সৈন্যরা পৌছালে সে অত্যধিক অহঙ্কারবশে যুদ্ধ করাই স্থির করে। তার সঙ্গে বিদ্রোহীদের এবং আদিল খাঁ ও কুতুব-উল-মুলকের সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করে এবং তাদের কামানবন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করে, সে যখন যাত্রা করে, তখন রাজকীয় সৈন্য মাত্র পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে ছিল। ২৫শে বাহমন, রবিবার, আলো ও অন্ধকারের সৈন্যরা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রবর্তী সেনানীর সেনাপতি দরাব খাঁ, অন্যান্য সর্দার এবং আগ্রহী লোকদের—যেমন রাজা বীরসিংহ দেও, রায়চাঁদ, আলি খাঁ তাতার, জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ তুর্কমান ও আরও অনেক সাহস-

অরণ্যের সিংহরা তরবারি কোষমুক্ত করে শত্রুর অগ্রবর্তী সৈন্যদের আক্রমণ করেন। অসমসাহসিক এবং পুরুষোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা শত্রু-সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। সেখানেই ক্ষান্ত না হয়ে শত্রুসৈন্যের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করেন। সেখানে এমন হাতাহাতি যুদ্ধ হয় যে এই দৃশ্য যারা দেখেছে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। প্রায় দুই ঘড়ি লড়াই চলে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের স্তূপ জমে ওঠে। সেই দুর্মতি অম্বর আর যুদ্ধ চালানো অসম্ভব দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পালাতে থাকে। এইসব কালোমুখ দুর্ভাগাদের ক্রন্দনরোলে আকাশে অন্ধকার ও মেঘালো ভাব ঘনিয়ে না এলে তাদের একজনেরও নিরাপদে উপত্যকায় ফিরে যাওয়ার পথ পেত না। যুদ্ধনদীর কুম্ভীররা পলাতকদের পিছনে দুই-তিন ক্রোশ ধাওয়া করে। তারপর নিজেদের জায়গায় ফিরে আসে। শত্রুপক্ষের অনেক নেতা বিজয়ী সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে। পরদিন বিজয়ী সৈন্য যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্র থেকে অগ্রসর হয়ে প্যাঁচামুখো বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল করকির দিকে আসে। কাউকে দেখতে না পেয়ে সেখানেই তারা শিবির ফেলে। তারা সংবাদ পায় যে আগের রাতে এবং পরদিন সকালে তারা দুরবস্থার মধ্যে নানাস্থানে সরে পড়েছে। বিজয়ী সৈন্যরা কয়েকদিন করকিতে থেকে যায় এবং শত্রুদের বাড়ী-ঘর কালোমাটির ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে সেই ঘনবসতি স্থানটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। আর যে সব ঘটনা ঘটে তার বর্ণনা দিতে হলে অনেক বড় হয়ে পড়বে। অবশেষে বিজয়ী সৈন্যরা সে জায়গা থেকে ফিরে রোহন গিরিপথ দিয়ে নেমে আসে। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ যারা দক্ষতা ও বীরত্ব দেখিয়েছে তাদের মনসব বৃদ্ধির জন্য আদেশ দিই।

তৃতীয় শুভ সংবাদ—খোখারা প্রদেশ জয় ও হীরার খনি দখল। ইব্রাহিম খাঁয়ের অদম্য চেষ্টায় এই স্থান দখল সম্ভব হয়েছে। এই স্থানটি বেহার—পাটনা সুবার একটি আশ্রিত রাজ্য। এখানে একটি নদী আছে যার মধ্য থেকে লোকে হীরা সংগ্রহ করে। যখন নদীতে অল্প জল থাকে সেই সময় নদীর বুকে ছোট ছোট জলধারা ও গর্ত দেখা যায়। যারা হীরক সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে পারে কোথায় হীরক পাওয়া যায়। তারা জানে যে সব গর্তের মাথায় ফড়িংএর মত উড়ন্ত পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে থাকে যাকে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলে ঝিঙ্গা (ঝিঁঝিঁ) সেইখানে হীরা পাওয়া যায়। যতদূর সম্ভব নদীর তলদেশে দৃষ্টি রেখে গর্তের চারধারে তারা নদীগর্ভের পাথর কুড়িয়ে জড়ো করে। তারপর এক কি দেড় গজ পরিমাণ জায়গায়

জল চেঁছে, কোদাল ও শাবল দিয়ে গর্ত করে। সেখানে বালি ও পাথরের মধ্য থেকে ছোট-বড় হীরা সংগ্রহ করে। মাঝে মাঝে লক্ষ টাকা মূল্যের হীরাও সেখানে পাওয়া যায় এমন ঘটনাও ঘটে। এই দেশ ও নদীটি দুর্জন সাল নামে একজন হিন্দু জমিদারের অধীন ছিল। সুবার সুবাদাররা প্রায়ই তার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতো, নিজেরাও যেতো। কিন্তু পথের দুর্গমতা ও অরণ্যের গভীরতার জন্য তারা বেশীদূর অগ্রসর না হয়ে দুই-তিনটি হীরা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে জমিদারকে পূর্ব অবস্থায় রেখেই ফিরে আসতো। জাফর খাঁর স্থলে ইব্রাহিম খাঁ এই সুবার সুবাদারপদে নিযুক্ত হলে আমি তাকে এই অজ্ঞাত এবং নগণ্য লোকের হাত থেকে ঐ দেশের দখল নিতে আদেশ করি। তিনি বেহার সুবায় পৌঁছানোর পর সৈন্যদল ঠিক করে সেই জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযানে রওনা হন। আগেকার রীতি অনুসারে সেই জমিদার কয়েকটি হীরা ও কয়েকটি হাতি পাঠায়। কিন্তু খাঁ তা নিতে সম্মত না হয়ে ক্রোধভরে সেই দেশে প্রবেশ করেন। সেই জমিদার তার লোক সংগ্রহ করার আগেই খাঁ পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে সেই দেশ আক্রমণ করেন। জমিদার এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার আবাসভূমি আক্রান্ত হয়। ইব্রাহিম খাঁ তার সন্ধানে লোক পাঠান। তাকে একটি পাহাড়ের ওপর কয়েকজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন তার মা আর অন্যরাও তার বাবার স্ত্রী। তাদের তল্লাসি করে তাদের কাছে যে হীরা ছিল তা নিয়ে নেওয়া হয়। ত্রিশটি হাতিও ইব্রাহিমের হাতে পড়ে। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ ইব্রাহিম খাঁকে চার হাজার মনসবদারিতে উন্নীত করে তাকে ফথ জং উপাধিতে ভূষিত করি। এই দেশটি এখন সাম্রাজ্যের ভৃত্যদের দখলে আছে। তারা নদীর বুক থেকে হীরা সংগ্রহ করার কাজ করে। হীরা পাওয়া গেলে দরবারে নিয়ে আসে। সম্প্রতি একটি বড় হীরা—যার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার্য হয়েছে—আমার কাছে আনা হয়েছে। একটু যদি কষ্ট করা যায়, তাহলে খুব সম্ভব ভাল ভাল হীরা পাওয়া যাবে যেগুলো রত্নঘরে স্থান পাবে।

শুভ রাজ্যাভিষেকের পর একাদশ নববর্ষ উৎসব

ইস্‌ফানদারমুজ মাসের শেষ দিন রবিবার। ১লা রবিউল আওয়াল (১৯শে মার্চ, ১৬১৬) দিনের পনেরো ঘড়ি অতীত হলে রবি মীন রাশির সৌধ থেকে সরে এসে মেষ রাশির প্রাসাদে সৌভাগ্যের রশ্মি বর্ষণ করেন। এই শুভ সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লার দরবারের এই দীন সেবক প্রার্থনা জানানোর পর আমি প্রকাশ্য দরবারকক্ষে সিংহাসনে উপবেশন করি। দরবারক্ষেত্রের চারপাশে তাঁবু ও ইউরোপীয় পরদায় সজ্জিত। রাজপুত্র, আমির, দরবারের সভাসদ, রাজ্যের মন্ত্রী এবং দরবারের সমস্ত কর্মচারীরা অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। গায়ক হাফিজ নাদ আলি আমার একজন পুরাতন ভৃত্য। আমি আদেশ দিই যে সোমবারে আমাকে যে উপঢৌকন দেওয়া হবে—নগদ মুদ্রায় বা জিনিসে—সমস্তই তাকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে।

১১ই তারিখ শনিবার ইতিমাদ্‌দৌলার সম্মানবৃদ্ধির জন্য তাঁর বাড়ীতে যাই। তিনি তখন আমাকে তাঁর উপঢৌকন দেন। জিনিসগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখি। রত্নের মধ্যে ছিল ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের দুইটি মুক্তা, একটি কুতুবি চুনী যা তিনি বাইশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন এবং আরও কয়েকটি মুক্তা ও চুনী। সমস্ত রত্নগুলির মূল্য এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। জিনিসগুলি আমার গ্রহণ করার সম্মান লাভ করে। এগুলি ছাড়াও পনেরো হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র ইত্যাদিও গ্রহণ করি। উপঢৌকনের জিনিসগুলি দেখে অতি আনন্দে ও আরামে রাতের এক প্রহর পর্যন্ত এখানে কাটাই। আমির ও কর্মচারীদের সুরার পেয়ালা পরিবেশন করতে আদেশ দিই। হারেমের মহিলারাও আমার সঙ্গে ছিলেন। খুব উপভোগ্য সম্মেলন সেদিন হয়েছিল। মিলন উৎসব শেষ হলে আমি ইতিমাদুদ্‌দৌলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দরবারকক্ষে আসি। এই দিনই নূরমহান বেগমকে নূরজাহান বেগম নামে ডাকার আদেশ দিই।

১৯শে ফারওয়ারদিন ছিল রবিগ্রহের তুঙ্গতম স্থানে গমনের শুভ দিন রুজ-ই-সরফ। দিনের আড়াই ঘড়ি অতিবাহিত হতেই শুভমুহূর্তে আমি সিংহাসনে উপবেশন করি। এই শুভ সময়ে বাবা খুররাম আমাকে জলের মত স্বচ্ছ একটি

চুনী অর্ঘ্য দেয়—যার মূল্য জানা গেল আশি হাজার টাকা। সে ছিল পনেরো হাজার পদাতিক ও আট হাজার অশ্বারোহীর মনসবদার। তার মনসব এখন ঠিক হলো—কুড়ি হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহীর। এইদিনই আমার চান্দ্রবৎসরের ওজন-উৎসব সম্পন্ন হয়।

২১শে তারিখ সর্বশক্তিমান আল্লার অনুগ্রহে মিতর ফজিল রিকাবদারের পুত্র মুকিবের কন্যার গর্ভে খসরুর একটি পুত্রসন্তান জন্মে।

৩রা উরদিবিহিস্ত সংবাদ আসে যে কদম নামে একজন আফ্রিদি আফগান যে এতদিন অনুগত ও বাধ্য ছিল এবং যার ওপর খাইবার গিরিপথের পথকর আদায় করার ভার ছিল সে সামান্য একটু সন্দেহের বশে তার পা আনুগত্যের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে রাজদ্রোহীরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি থানায় তার বাহিনী পাঠিয়েছে। যেখানেই সে বা তার লোকরা গিয়েছে সেখানেই থানাদারদের অসতর্কতায় লুঠতরাজ করে অনেককে হত্যা করেছে। এই অজ্ঞান আফগানের লজ্জাজনক আচরণে কাবুলের পার্বত্য অঞ্চলে আবার গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছে। এই সংবাদ পৌছানো মাত্র আমি আদেশ দিই যে কদমের ভাই হারুণ ও তার পুত্র জালালকে যারা এ সময় দরবারে ছিল—জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের আসফ খাঁর হাতে তুলে দিয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখতে হবে।

পরমেশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের চিহ্ন ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যা বিস্ময়কর আখ্যা পেতে পারে। রাণাকে পরাজিত করার পর আমার পুত্র আজমীঢ়ে আমাকে একটি অতি সুন্দর স্বচ্ছ চুনী দেয়—যার মূল্য ষাট হাজার টাকা ধার্য হয়। আমার মনে হলো যে এই চুনীটি হাতে বেঁধে রাখা উচিত। একই রকরের দুইটি দুষ্প্রাপ্য জলের মত স্বচ্ছ মুক্তা যা এইরকম চুনীর সঙ্গে মানাবে—লাভ করার ইচ্ছা হলো। মুকারব খাঁ নববর্ষের উপহার স্বরূপ একটি কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের চমৎকার মুক্তা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। মনে হলো এরই জুড়ি যদি একটি সংগ্রহ করা যায় তাহলে এই কয়টি দিয়ে একটি সুন্দর তাগা হতে পারে। খুররাম তার শিশুকাল থেকে দিনরাত আমার মহামান্য পিতার কাছে কাছে থাকতো। সে আমাকে জানায় যে এইরকম আকৃতির ও ওজনের একটি মুক্তা পুরানো শিরবন্দে দেখেছিল। আমার কাছে একটা শিরপ্যাচে (শিরবন্দের ওপরে লাগানোর জন্য) একই ধরনের ওজনের ও আকৃতির—যার ওজন এক রতির

কম বা বেশী নয়—দেখা গেল। জহুরিরা পর্যন্ত এই দুইটি মুক্তার অদ্ভুত মিল দেখে বিস্মিত হয়। মূল্যে, আকৃতিতে, ঔজ্জ্বল্যে ও দীপ্তিতে দুইটিরই বিস্ময়কর মিল দেখে মনে হয় যেন একই ছাঁচে ঢেলে দুইটিকে তৈরী করা হয়েছে। চুনীর দুই পাশে দুটো মুক্তা গেঁথে আমি রাহুতে বাঁধি। আমার মাথা দীনভাবে মাটিতে লুটিয়ে আমার প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে থাকি যিনি তাঁর এই ক্রীতদাসের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন।

মুকারব খাঁ অ্যাবিসিনিয়া থেকে সমুদ্রপথে জাহাজে করে আনা একটি ছোট হাতি উপঢৌকন দেন। হিন্দুস্থানের হাতির সঙ্গে তুলনা করলে এর কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এখানকার হাতির কানের চেয়ে এর কান বড়। শুঁড় আর লেজও বেশী লম্বা। আমার মহামান্য পিতার সময় গুজরাটের ইতিমাদ খাঁ একটি হস্তীশাবক উপহার দিয়েছিলেন। [মন্তব্য—এই হাতি জাহাঙ্গীরের জন্মের আগেই এসেছিল। হাতিটা ছিল আফ্রিকার।—আকবর-নামা]। ক্রমে ক্রমে হাতিটা বড় হলে অত্যন্ত উগ্র ও বদমেজাজি হয়ে ওঠে।

সংবাদ আসে যে একদল আফগান খান আলমের ভাই আবদুস্ শোভানকে আক্রমণ করে। তার ওপর একটা থানার ভার দেওয়া হয়েছিল। সেই থানাটি আফগানরা অবরোধ করে। আবদুস শোভান, কয়েকজন মনসবদার ও ভৃত্য বীরের মত আচরণ দেখায়। পোকার যখন পাখা গজায় তখন হাতিকেও কামড়ায় এই প্রবাদ অনুসারে ঐ কুকুরগুলো তাদের পরাভূত করে এবং আবদুস শোভান ও আরও কয়েকজনকে শহিদের সম্মানে তুলে দেয়। এই শোকবার্তা জানানোর জন্য একটি ফর্মান ও সম্মানসূচক পোশাক খান আলমের কাছে পাঠাই। তিনি দূত হিসাবে এখনও ইরাণেই আছেন।

৩রা খুরদাদ মূর্তজা খাঁর মৃত্যুসংবাদ আসে। তিনি রাজ্যের একজন পুরাতন কর্মচারী। আমার মহান পিতা তাঁকে পালন করেছিলেন এবং তাঁকে একটি বিশিষ্ট দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আমার রাজত্বকালেও তিনি খসরুর বিরোধিতা দমনের ন্যায় কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁকে ছয় হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারিতে উন্নীত করা হয়েছিল। এই সময় তিনি পাঞ্জাবের সুবেদারের পদে থাকায় তিনি কাংগ্রা দুর্গ অধিকারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই দুর্গের দুর্ভেদ্যতার সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে কেন পৃথিবীর কোনও স্থানের কোনও দুর্গেরই তুলনা চলে না। তাঁর মৃত্যুসংবাদে আমি মনে অত্যন্ত ব্যথা পাই। এই রকম অনুগত কর্মীর

মৃত্যুতে দুঃখ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাঁর জীবনের দিনগুলি রাজানুগত্য ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করেই কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম যে তাঁর যদি কোনও দোষত্রুটি থেকে থাকে তা যেন ক্ষমা করেন।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যা লিখতে ইচ্ছা থাকলেও আমার হাত ও মাথা কাঁপতে থাকে। যতবারই আমি কলম হাতে তুলি আমি কেমন হতবুদ্ধি হয়ে যাই। নিরুপায় হয়ে আমি ইতিমাদুদ্‌দৌলাকে লিখতে আদেশ দিই।

"একজন প্রাচীন অনুগত ক্রীতদাস—ইতিমাদুদ্‌দৌলা আদেশ অনুসারে এই শুভ খাতায় লিখছে। ১১ই খুরদাদ মহাভাগ্যবান সা' খুরামের কন্যার পবিত্র দেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মহামান্য সম্রাট আনন্দময় শুভ উদ্যানের এই প্রথম দিকের ফলটি অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তিন দিন পর গায়ে ফুস্কুরি দেখা দেয়। ২৯শে জমাদান আওয়াল, বুধবার, হিজরা ১০২৫ (১৫ই জুন, ১৬১৬) তার আত্মাপাখী দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে বেহেস্তের উদ্যানে গিয়েছে। এইদিনই আদেশজারি হয় যে চারসম্বা (বুধবার)-কে এখন থেকে বলতে হবে কামসম্বা। এই হৃদয়বিদারী দুঃখবর্ধনকারী ঘটনা আল্লার প্রতীক (ছায়া) সেই পবিত্র পুরুষের (জাহাঙ্গীর) কি অবস্থা ঘটেছে সে সম্বন্ধে আর কি লিখবো। পৃথিবীর আত্মার (জাহাঙ্গীর) যখন এই অবস্থা তখন আল্লার অন্য সেবকদের (খুররাম ও তাঁর পত্নী)—যাঁদের জীবন এই পবিত্র প্রাণের সঙ্গে আবদ্ধ—তাঁদের মনের অবস্থা কি হতে পারে? দুই দিন ভৃত্যদের কাছে আহ্বান করা হয়নি। সেই স্বর্গের পাখী যে গৃহে থাকতো তার সম্মুখে দেওয়াল গাঁথার আদেশ হয় যাতে সেটা দৃষ্টিগোচর না হয়। এ ছাড়াও তিনি দরবারকক্ষ উজ্জ্বল করতেও যাননি। তৃতীয় দিনে তিনি শোকাকুল অবস্থায় খ্যাতিমান পুত্রের প্রাসাদে যান। সেখানে ভৃত্যরা তাঁকে কুর্নিশ করার সৌভাগ্যলাভ করে নবজীবন পায়। পথে হজরত (সম্রাট) নিজেকে সম্বরণ করার চেষ্টা করলেও তাঁর পবিত্র চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। অনেকক্ষণ তাঁর এমন অবস্থা হয় যে কিছু একটা বলতে গেলেই তাঁর কণ্ঠস্বর বেদনায় রুদ্ধ হয়ে আসে এবং হজরতের কেমন হতবুদ্ধির মত ভাব হয়। তিনি কয়েকদিন রাজপুত্রের প্রাসাদে কাটিয়ে পবিত্র তিরমাসে (৬ই তারিখ) সোমবার আসফ খাঁর বাড়ী যান। সেখান থেকে ফিরে চশমা-ই-নুরে গিয়ে দুই-তিনদিন সেখানে থাকেন। কিন্তু যতদিন তিনি আজমীঢ়ে ছিলেন নিজের

মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেননি। বন্ধুত্ব কথাটি তাঁর কানে গেলেই তিনি নিজেকে সম্বরণ করতে পারেন না। অঝোরে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তাই দেখে তাঁর বিশ্বাসী অনুগতদের হৃদয় ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এই সৌভাগ্যের প্রতীক (সম্রাট) দাক্ষিণাত্য সুবায় যাওয়ার পর কিছুটা শান্তি পান।" [মন্তব্য—খুব সম্ভব সাজাহানের এই কন্যার নামই চমানি বেগম। এর কবর মহাত্মা খাজা মুইনুদ্দিন চিস্তির সমাধির নিকট আছে।]

১১ই তারিখ শনিবার আমি চশমা-ই-নুর থেকে আজমীঢ় প্রাসাদে যাই। ১২ই তারিখ রবিবার রাতের ৩৭ সেকেণ্ড অতিবাহিত হওয়ার পর হিন্দু জ্যোতিষীদের গণনামতে ধনু রাশি যখন ২৭ ডিগ্রিতে এবং গ্রীক জ্যোতিষীদের গণনামতে বৃশ্চিক রাশি যখন ১৫ ডিগ্রিতে সেই সময় আসফ খাঁর কন্যার গর্ভে খুররামের একটি মূল্যবান রত্ন জন্মগ্রহণ করে। আল্লার এই আশীর্বাদে আনন্দের অভিব্যক্তিতে ডঙ্কা সজোরে বাজতে থাকে। সকল লোকের মুখের ওপর আনন্দ ও ভোগের দরজা খুলে যায়। জন্মের পরই কোনও রকম চিন্তার অবসর না দিয়েই আমার জিহ্বা 'সা সাজতে' এই নামটি উচ্চারণ করে। আশা করি যে তার জন্ম আমার এবং তার পিতার পক্ষে শুভ ও আনন্দদায়ক হবে।

আমার কয়েকটি অভিলাষ পূরণের জন্য মহামান্য খাজার জ্যোতির্ময় সমাধিতে একটি সোনার রেলিং স্থাপন করবো এই শফৎ গ্রহণ করি। ২৭শে তারিখ রেলিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ হলে আমি সেটাকে সমাধিস্থলে লাগানোর জন্য আদেশ দিই। এটি তৈরী করতে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

দাক্ষিণাত্যের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব ও পরিচালনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হতে পেরে পরভেজকে ফিরিয়ে এনে তার স্থলে বিজয়ী অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীর অধিনায়করূপে খুররামকে—যার কর্তব্যের প্রতি অনুরাগ বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে—আগে পাঠিয়ে আমি নিজে সেখানে যাত্রা করবো স্থির করি যাতে ওদিকের বিশেষ কাজটি এই অভিযানেই সফল হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে পরভেজের নামে ফার্মান পাঠিয়ে তাকে আমার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এলাহাবাদে আসার জন্য আদেশ দিই। যখন আমি এদিকে অভিযানে নিযুক্ত থাকবো তখন সে ঐদিকের শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে।

এই বৎসর অর্থাৎ আমার অভিষেকের দশ বছর পরে হিন্দুস্থানের নানা জায়গায় ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি প্লেগ আরম্ভ হয়। এই ব্যাধি প্রথমে শুরু হয় পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে। তারপর লাহোর নগরেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

বহু লোক—মুসলমান ও হিন্দু এই ব্যাধিতে মারা যায়। এই সময় ব্যাধির প্রকোপ অনেকটা কমেছে। প্রাচীন লোকের মুখে এবং অতীতের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এই রকমের ব্যাধি এই দেশে আর কখনও হয়নি। চিকিৎসক ও বিজ্ঞ লোকদের জিজ্ঞাসা করা হলো—এই ব্যাধির কারণ কি? কেউ কেউ বললেন—উপর্যুপরি দুই বছর বৃষ্টি না হওয়াই এর কারণ। অন্যরা বললেন—বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য বায়ু কলুষিত হওয়ার দরুণ এই ব্যাধি। আবার কেউ কেউ অন্য কারণ দেখালেন। আল্লাই জানেন এর হেতু কি। আমরা তাঁরই বিচার মাথা পেতে নেব।

"তাঁর হুকুমের কাছে মাথা কর নত,
ক্রীতদাসের এ ছাড়া আর উপায় নাই।"

ম্যাণ্ডোলিন-বাদক সার্তকি এ-যুগের একজন বিস্ময়কর মানুষ। তিনি হিন্দী ও ফারসী সঙ্গীত এমন ভাবে গান যে তা শুনলে শ্রোতাদের মন থেকে সমস্ত ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি 'আনন্দ খান' পদবী দিয়ে তাঁকে আনন্দিত করি। হিন্দী ভাষায় 'আনন্দ' মানে সুখ ও আরাম।

তির মাসের (জুন-জুলাই) পর এদেশে কোনও ঋতুতে আম ফলে না। কিন্তু মুকারব খাঁ কৈরাণা পরগণায় (সাহারাণপুর সরকার, বর্তমান মুজাফ্ফর নগর জেলায়) যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি—কয়েকটি আমবাগান তৈরি করে—এমন দৃষ্টি রাখেন যাতে আরও দুই মাস আম ফলার সময় বেড়ে যায়। সেখান থেকে প্রতিদিন টাটকা আম আমার ফলের গুদামে আসে। এটি একটি বিশেষ ব্যাপার জন্য এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

ত্বরিৎকর্মা পথের খোদাইকার (ভাস্কর)-দের মার্বেল পাথরে রাণা ও তাঁর পুত্র করণের পূর্ণমূর্তি তৈরি করার জন্য আদেশ দিই। তারা মূর্তি দুইটি তৈরি করে আমার কাছে আনে। এই দুইটি মূর্তি আগ্রায় পাঠিয়ে উদ্যানে ঝরোকার নীচে স্থাপন করার আদেশ দিই।

২৬শে শাহরিয়ার আমার সৌর বৎসরের ওজন উৎসব সম্পন্ন হয়। নানা জিনিস দিয়ে বারো বার ওজন নেওয়া হয়। সোনা দিয়ে প্রথমবারের ওজনে হয়—৬৫১৪ তোলা। দ্বিতীয়বার ওজন হয় পারায়। তৃতীয়বার রেশমে। চতুর্থবার নানা সুগন্ধিদ্রব্যে—যেমন মৃগনাভি, চন্দনকাঠ ইত্যাদি। এই ভাবে বারো বার ওজন চলার পর এই ব্যাপার শেষ হয়। জন্তুদের মধ্যে আমার বর্তমান বয়স অনুসারে প্রতি বৎসরের জন্য—১টি ভেড়া, ১টি ছাগল এবং ১টি

মুরগী ফকির ও দরবেশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। (এই সময় জাহাঙ্গীরের বয়স ছিল—৪৮। সুতরাং ৩×৪৮=১৪৪টি পশু বিতরণ করা হয়েছিল।) এই নিয়ম আমার মাননীয় পিতার আমল থেকে এ পর্যন্ত পালন করা হচ্ছে। ওজন করা সমস্ত জিনিস যার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ফকির এবং অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

আমি বিজাপুরের আদিল খাঁর দূতদের বিদায় দেওয়ার সময় ঐ দেশের প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা ও তরবারির খেলোয়াড় আনতে অনুরোধ করেছিলাম। কিছুদিন পর দূতরা ফিরে এলে তাদের সঙ্গে আদিল খাঁ পাঠান সের আলি নামে একজন মোগলকে। তার জন্ম বিজাপুর। মল্লযুদ্ধই তার ব্যবসা ও এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ। কয়েকজন তরবারি খেলোয়াড়ও আসে। তাদের খেলা মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়। কিন্তু সের আলি আমার কার্যে নিযুক্ত মল্লযোদ্ধা ও ক্রীড়াবিদদের কুস্তি করলে দেখা গেল যে তারা কেউ শের আলির কাছে লাগে না। তাকে এক হাজার টাকা, একটি সম্মানসূচক পোশাক বকশিশ দিই। তার দেহ অত্যন্ত সুগঠিত ও মজবুত। তাকে আমার চাকুরিতে বহাল করে তাকে 'রাজধানীর মল্লবীর' এই আখ্যা দিই। একটি জায়গীর ও মনসব দিয়ে তাকে আরো অনুগ্রহ দেখাই।

আদিল খাঁর দূতদের পৌঁছানোর আগে মনে করেছিলাম যে বাবা খুররামকে অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়ে আমি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়ে ওদিককার ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালা করবো। কিন্তু সেটা কোনও কারণে স্থগিত রাখতে হয়। এইজন্য আদেশ দিই যে এর পর থেকে বাবা খুররাম ভিন্ন আর কেউ দাক্ষিণাত্যের শাসকদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে না।

৭ই আবান (১৭ই সাওয়াল, ২৮শে অক্টোবর, ১৬১৬) মহম্মদ রিজা বেগ নামে এক ব্যক্তি—যাঁকে পারস্যের রাজা তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিল—আমাকে শ্রদ্ধা জানান। কুর্নিশ, সিজদা ও তশলিম জানানোর পর তিনি যে চিঠি এনেছেন তা আমার সামনে রাখেন। তাঁর সঙ্গে যে অশ্ব ও অন্যান্য উপহার এসেছিল সেগুলি আমার কাছে আনার কথা বলি। লিখিত ও মৌখিক বার্তা বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতার ভাবে পূর্ণ ছিল। এইদিনই আমি দূতকে টায়রা ও সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিই।

৮ই আবান, রবিবার দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার জন্য বাবা খুররামের শিবিরের সাজসরঞ্জাম আজমীঢ় থেকে চলে যায়। স্থির হয় আমার পুত্র অগ্রবর্তী সৈন্য

সহ রওনা হওয়ার পর গৌরবময় পতাকা (জাহাঙ্গীর) যাত্রা করবে। পরদিন ৯ই আবান, সোমবার দিনের তিন ঘড়ি অতীত হওয়ার পর ঐ একই ভাবে একই পথে রাজকীয় শিবির-প্রাসাদ রওনা হয়ে যায়।

১৯শে আবান আমার সাধারণ নিয়মানুসারে গোসলখানায় ছিলাম। কয়েকজন আমির ও পরিচারক এবং আকস্মিকভাবে পারস্যের রাজদূত মহম্মদ রিজা বেগও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছয় ঘড়ি অতীত হওয়ার পর প্রাসাদ সংলগ্ন উঁচু অলিন্দের ছাদের ওপর প্যাঁচা উড়ে বসলো। কিন্তু তাকে ঠিক দেখা যাচ্ছিল না জন্য অনেকেই বুঝতে পারলো না ওটা কি। আমি একটা বন্দুক আনতে পাঠাই। কোথায় ওটা বসেছে তাঁরা সেদিকে নির্দেশ করলে সেই দিক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। বন্দুকের গুলি আল্লার রায়ের (ডিক্রি) মত ঐ অমঙ্গুলে পাখীকে বিদ্ধ করে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা চীৎকার করে ওঠেন। আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁদের ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়।

সেই রাত্রেই আমার ভ্রাতা সা' আব্বাসের দূতের সঙ্গে কথা বলি। কথায় কথায় সা'র জ্যেষ্ঠপুত্র সফি মির্জার হত্যার কথা ওঠে। একথা জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে আমার মনে এ সম্বন্ধে দুঃখের ভাব বর্তমান ছিল। তিনি নিবেদন করেন—এই সময় যদি খুনের ব্যাপার না ঘটতো তাহলে সে নিশ্চয়ই সা'র জীবননাশের চেষ্টা করতো। তার ব্যবহারে এই মতলব প্রকাশ পেতেই সা' আগেই সতর্ক হন এবং তাকে হত্যা করার আদেশ দেন।

বাবা খুররামের বিদায়ের দিন ধার্য হয় ২০শে আবান, শুক্রবার। সে খুব আগ্রহ নিয়ে যাত্রা করে। সর্বশক্তিমান আল্লার ওপর বিশ্বাস রেখে বলছি যে সে যেন কাজে সফল হয়ে মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।

কিছুদিন আগে একদল চোর কোতোয়ালি চবুতরা (পুলিস থানা) থেকে রাজকীয় অর্থ চুরি করে। কয়েকদিন পর এই দলের সাতজন চোর নওয়াল নামে তাদের সর্দার সহ ধরা পড়ে। অপহৃত অর্থের কিছু অংশও পাওয়া যায়। তাদের এই দুঃসাহসিক অপরাধের কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত মনে করি। প্রত্যেককে উচিত শাস্তি দেওয়া হয়। সর্দার নওয়ালকে হাতির পায়ে নিক্ষেপ করার জন্য আদেশ দিই। সে আবেদন করে—যদি সে হুকুম পায় তাহলে সে সেই হাতির সঙ্গে লড়বে। আমি আদেশ দিই, তাই হোক। একটি অতি ভীষণ রাগী হাতি আনা হয়। আমি তার হাতে একটা ছোরা দিয়ে হাতির সামনে আনতে বলি। হাতিটি কয়েকবার তাকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়

কিন্তু প্রত্যেকবারই এই উগ্র নির্ভীক লোকটি—যদিও সে তার সঙ্গীদের শাস্তি নিজের চোখে দেখেছে—বার বার মাটি থেকে উঠে সাহসভরে দৃঢ়তার সঙ্গে হাতির শুঁড়ে ছোরা দিয়ে আঘাত করেছে। শেষে হাতিটা তাকে আক্রমণ করা বন্ধ করে। আমি এই লোকটির কৌশল ও পৌরুষ নিজের চোখে দেখে তার জীবনের ইতিহাস জানার জন্য তদন্ত করতে আদেশ দিই। কিছুদিন পরই সে তার দুষ্টবুদ্ধি ও নীচমনের পরিচয় দিয়ে তার নিজের জায়গায় পালিয়ে যায়। আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঐদিকের জায়গীরদারদের তাকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে আদেশ দিই। ভাগ্যক্রমে সে দ্বিতীয়বার ধরা পড়ে। এবার এই অকৃতজ্ঞ ও অবুঝ লোকটিকে ফাঁসি দেওয়ার হুকুম দিই। এই প্রার্থনার সঙ্গে সেখ মুসনিউদ্দিনের কথার বেশ মিল আছে :—

"নেকড়ের বাচ্চা মানুষের সাথে করো মানুষ,
কিন্তু সে শেষে নেকড়েই হবে—হবে না মানুষ।"

১লা জিল্কদ অর্থাৎ ২১শে আবান, শনিবার (১০ই নভেম্বর, ১৬১৬) দিনের দুই প্রহর পাঁচ ঘড়ি অতীত হলে সুস্থ দেহ ও মনে মহৎ উদ্দেশ্য পালন করার জন্য চার ঘোড়ার ইউরোপীয় গাড়িতে উঠে আজমীঢ় ত্যাগ করি। অন্যান্য গাড়িতে কয়েকজন আমিরকে আমার সঙ্গে আসার জন্য আদেশ দিই। সন্ধ্যার সময় দেড় ক্রোশ দূরে দেওরাণী গ্রামে আমার বিশ্রাম শিবিরে পৌঁছাই। ভারতবাসীদের ধারণা এই যে যদি রাজা অথবা অন্য কোনও বিশেষ ব্যক্তি কোনও রাজ্য জয় করতে যান তাহলে সে দেশটি যদি পূর্ব দিকে হয় তাহলে দাঁতালো হাতিতে, পশ্চিম দিকে হলে একরঙ্গা ঘোড়ায়, উত্তর দিকে হলে পালকিতে অথবা সিংহাসনে আর দক্ষিণ দিকে হলে কোনও গাড়িতে চড়ে যেতে হবে।

আমি আজমীঢ়ে পাঁচদিন কম তিন বছর ছিলাম। আজমীঢ় নগরে মহান খাজা মুইনুদ্দিনের পবিত্র সমাধি থাকায় এই স্থানটিকে দ্বিতীয় স্বর্গ রূপে গণ্য করা হয়। রাজধানী আগ্রা এর পূব দিকে, উত্তরে দিল্লী শহর, দক্ষিণে গুজরাট সুবা, এবং মুলতান ও দেয়ালপুর পশ্চিম দিকে। এদেশের জমি বালুকাময়। কৃষকেরা চাষের জন্য নীচু ভেজা জমি ও বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। শীত ঋতু বেশ সহনীয়। গ্রীষ্ম ঋতুর উগ্রতা আগ্রার চেয়ে কম। যুদ্ধকালে এই সুবা থেকে ছিয়াশি হাজার অশ্বারোহী এবং তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার রাজপুত পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ হয়। এই নগরে দুইটি বড় পুকুর আছে। একটির নাম বিশাল, আর একটির নাম আনা সাগর। বিশাল পুকুরটি

ধ্বংসের মুখে, পরে ভেঙ্গে গিয়েছে। পুকুরটির সংস্কারের জন্য আদেশ দিয়েছি। রাজপতাকা এখানে ওড়ার সময় আনা সাগর জলে ভরতি ছিল। তাতে ঢেউ খেলতো। এই পুকুরের চারপাশের মাপ দেড় ক্রোশের ওপর। আজমীঢ় থাকার সময় মহাত্মা খাজার সমাধিক্ষেত্রে যাই নয়বার, পনরো বার যাই পুষ্কর হ্রদ দেখতে, চশমা-ই-নুরে যাই ছত্রিশবার। বাঘ ইত্যাদি শিকার করতে যাই পঞ্চাশবার। দেবরাণীতে সাতবার শিবির পড়ে। এইবার ৫টি নীলগাই ও কয়েকটি জলচর পাখী শিকার করি।

দেওরাণী থেকে ২৯শে তারিখ রওনা হয়ে পৌনে তিন ক্রোশ দূরে দাসাওয়ালি গ্রামে বিশ্রাম শিবির পড়ে। ৩রা আজর এখান থেকে যাত্রা করে সওয়া দুই ক্রোশ দূর বাধন গ্রামে শিবির ফেলা হয়। ৪ঠা তারিখ দেড় ক্রোশ এগিয়ে নূরজাহান বেগমের সম্পত্তি রামসর নামে স্থানটি সম্মান ও গৌরবের অধিকারীর বিশ্রামস্থল নির্দিষ্ট হয়। এই জায়গায় আট দিন অবস্থান করি। রামসর নূরজাহানের জায়গীরমধ্যে হওয়ায় বৃহস্পতিবার এখানে ভোজ উৎসব হয়। রাতে হ্রদের চারদিকে এবং মধ্যস্থলে আলোকসজ্জা হয়। বেশ চিত্তাকর্ষক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৩ই আজর রামসর থেকে যাত্রা করে শিকার করতে করতে চার ক্রোশ পথ চলে বলোদা গ্রামে আসি। ১৮ই তারিখ আড়াই ক্রোশ এগিয়ে জলসা গ্রামে মহান ও ঐশ্বর্যশালী শিবির পড়ে। ২০শে তারিখ দেওয়া গাঁর বিশ্রামস্থলের দিকে যাত্রা করি। দুই দিন এখানে থাকি।

এই জায়গায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। রাজকীয় পতাকা এই বিশ্রাম শিবিরে পৌঁছানোর আগে একজন খোজা গ্রামের একটা বড় পুকুরের ধারে দুইটি বাচ্চা সারস ধরে। রাত্রে আমরা এই বিশ্রাম শিবিরে আসার পর দুইটি বড় সারস ভীষণ চীৎকার করতে করতে আমার গোসলখানার কাছে আসে। তাদের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল যেন তাদের ওপর খুব অত্যাচার করা হচ্ছে। গোসালখানাটি ঐ পুকুরের ধারে করা হয়েছিল। কিছুমাত্র শঙ্কিত না হয়ে তারা এগিয়ে আসতে থাকে। আমার মনে হলো এদের ওপর নিশ্চয়ই কোনও অত্যাচার হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ এদের বাচ্চা কেউ ধরেছে। অনুসন্ধানের পর সেই খোজা যে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে এসেছিল—আমার কাছে আনে। সারসরা বাচ্চাদের কান্না শুনতে পেয়ে কোনও বাধা না মেনে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের ক্ষিদে পেয়েছে সন্দেহ করে দুইটি সারসের

প্রত্যেকেই বাচ্চাদের মুখে খাদ্য তুলে দেয়, আর চীৎকার করে শোকপ্রকাশ করতে থাকে। তাদের দুইজনের মধ্যে বাচ্চা দুটি নিয়ে পাখা বিস্তার করে আদর করতে করতে তাদের বাসায় নিয়ে যায়।

২৩শে তারিখ পৌনে চার ক্রোশ এগিয়ে ভাসু গ্রামে আসি। এখানে দুই দিন থাকি। ২৬শে তারিখ রাজকীয় শিবির আবার চলতে শুরু করে কাকাল গ্রামের প্রান্তে এসে থামে। ২৯শে তারিখ পৌনে তিন ক্রোশ পথ চলে বোদা পরগণার লাসা গ্রামে পৌছাই। এই দিন (১৯শে ডিসেম্বর, ১৬১৬) কুরবান পর্বের দিন। দিনের উৎসবের রীতিগুলি পালন করার আদেশ দিই। আমার আজমীঢ় ত্যাগ করার সময় থেকে ৩০শে আজর পর্যন্ত ৬৭টি নীলগাই, হরিণ ইত্যাদি এবং ৩৭টি জলচর পাখী শিকার করি। ২রা দাই লাসা থেকে রওনা হয়ে তিন ক্রোশ পথ শিকার করতে করতে কান্‌রা গ্রামের কাছে আসি। ৪ঠা তারিখ সোয়া তিন ক্রোশ পথ চলে সুরথ গ্রামে পৌছাই। সাড়ে চার ক্রোশ পথ চলে ৬ই তারিখ বরোরা গ্রামে আসি। ৭ই তারিখ এখানেই থাকি। ৫০টি জলচর পাখী ও ১৪টি কুট্ শিকার করি। পরের দিনও এখানেই বিশ্রাম করি। ২৭টি জলচর পাখী মারি। ৯ই তারিখ সাড়ে চার ক্রোশ এগিয়ে পরবর্তী বিশ্রাম শিবির খুসতালে পৌছাই। এখানে দুই দিন থেকে ১২ই তারিখ রওনা হয়ে চার ক্রোশ পথ চলে কোয়েলা গ্রামে আসি। এই জায়গায় একটি পুষ্করিণীর ধারে অতি মনোরম দৌলতখানা তৈরি করা হয়েছে। জায়গাটি অতি সুন্দর হওয়ায় এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করি। ১৭ই তারিখ সাড়ে চার ক্রোশ এগিয়ে লিয়াসা গ্রামে পৌছাই। ১৯শে তারিখ সওয়া দুই ক্রোশ পথ চলার পর চম্বল নদীর তীরে কুরকো গ্রামের কাছে শিবির ফেলি। জায়গাটির সৌন্দর্য এবং জলবায়ু মনোরম দেখে এখানে তিন দিন কাটাই। ২২শে তারিখ পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করে সাড়ে চার ক্রোশ পথ চলে বিজয়ী শিবির পড়ে সুলতানপুর ও চিনামালা গ্রাম দুটির কাছে। ২৫শে তারিখ সাড়ে তিন ক্রোশ পথ চলে বাস্থর গ্রামে পৌছাই। ২৭শে তারিখ সাড়ে চার ক্রোশ পথ চলে আসি চারদুহা গ্রামে। এখানে দুই দিন থাকি। দাই মাসে ৪১৬টি জন্তু মারি।

১লা বাহমন (১২ই মহরম, ১০২৬; ২০শে জানুয়ারি, ১৬১৭) বেগমদের সঙ্গে নিয়ে নৌকায় খানিকটা পথ এগিয়ে যাই। দিনের এক ঘড়ি অবশিষ্ট থাকতে চার ক্রোশ দূরে ধার্য বিশ্রামস্থল রূপাহেরা পৌছাই। বিশ্রামস্থলটি

খুবই সুন্দর ও সবুজ। ৩রা তারিখ আবার নৌকায় শিবিরের নির্দিষ্ট জায়গা কাথাবাসে আসি। আমার শিকারের সময় একটা তুরাজ পাখী উড়তে উড়তে ঝোপের মধ্যে পড়ে যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর পাখীটা কোথায় পড়েছে জানতে পেরে বনপেটাইকারিদের ঝোপটি ঘিরে ফেলে ওটাকে ধরতে বলি। নিজেও ঐদিকে যাই। ইতিমধ্যে আর একটি তুরাজ উড়তে দেখা যায়। একটা শিকারী বাজ সেটাকে ধরে। কিছুক্ষণ পরই বনপেটাইকাররা ঝোপ থেকে পাখীটাকে (যেটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিল) আমার কাছে আনে। এই পাখীটিকে শিকারী বাজকে খাওয়ার জন্য দিতে বলি। আর যে পাখীটা আমরা বাজকে দিয়ে ধরেছি সেটা বাচ্চা বলে রাখতে বলি। কিন্তু আমার আদেশ সর্দার-শিকারী শোনার আগেই সে দ্বিতীয় পাখীটাকে (অর্থাৎ যেটা বাজ ধরেছিল) বাজকে খাওয়ায়। কিছুক্ষণ পর শিকারী নিবেদন করে যে যদি এই পাখীটাকে জবাই না করা হয় তাহলে ওটা আপনিই মরে যাবে (অর্থাৎ তখন আর আহারের যোগ্য মাংস থাকবে না)। ব্যাপার এমনি দাঁড়াতে পারে ভেবে পাখীটাকে জবাই করতে আদেশ দিই। সে যেই পাখীর গলায় তরবারি ছোঁয়াতে যাবে পাখীটা সামান্য একটু ঝটপট করেই নিজেকে মুক্ত করে উড়ে যায়। আমি যখন নৌকা থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়েছি সেই সময় একটা চড়ুই পাখী জোর বাতাসের ধাক্কায় আমার সঙ্গের একজন শিকারীর হাতের তীরের মাথায় ধাক্কা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে মরে যায়। আমি ভাগ্যের খেলা দেখে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যাই। একদিকে ভাগ্য তুরাজ পাখীকে অল্প সময়ের মধ্যে তিনবার রক্ষা করলো কারণ তার মৃত্যুর সময় হয়নি আর অন্যদিকে ভাগ্যের তীর চড়ুই পাখীটিকে সহসা মৃত্যুর ফাঁদে বন্দী করলো—কারণ তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল।

"জগৎ-তরবারি মাথার উপর ঘুরতে পারে।
আল্লার মরজি ছাড়া একটি শিরাও কাটবে নারে।"

৬ই তারিখ আবার যাত্রা শুরু করে 'ঘাটচান্দা' নামে গিরিপথে চার ক্রোশ চলার পর রাজকীয় শিবির 'অমজার গ্রামে' ফেলা হয়। উপত্যকাটি খুব সবুজ ও সুন্দর। এই স্থান পর্যন্ত যা আজমীঢ় সুবার শেষ সীমা—৮৪ ক্রোশ পথ এসেছি। এই গ্রামের পর থেকে মালব সুবা আরম্ভ হয়েছে। মালব বেশ বড় প্রদেশ। এখানে জল যথেষ্ট, আবহাওয়া চমৎকার। এখানে ছোট ছোট নদী, খাল এবং প্রস্রবণ ছাড়া পাঁচটি নদী আছে—গোদাবরী, ভীমা, কালিসিন্ধ,

নীরা ও নর্মদা। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এই প্রদেশের বেশীর ভাগ জমিই নীচু, কিছু কিছু উঁচু। ধার জেলা মালবের একটি প্রধান স্থান। এখানে আঙ্গুর জন্মে বছরে দুবার—মীন রাশি ও সিংহ রাশিতে যখন রবিগ্রহ আসেন। মীন রাশির আঙ্গুরই বেশী মিষ্ট। এখানে কৃষক ও কারিগরদেরও অস্ত্র আছে। এই প্রদেশের রাজস্ব ২৪, ৭০০, ০০০ দাম (১২, ৩৫০, ০০০ টাকা)। প্রয়োজনের সময় এখান থেকে পাওয়া যায় ২৯, ৬৬৮ জন অশ্বারোহী, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার তিনশ পদাতিক ও ১০০টি হাতি।

৮ই তারিখ খয়রাবাদে, ১০ই তারিখ সিধারায় এবং ১২ই তারিখ বাছাইয়ারি গ্রামে শিবিরে পড়ে। রাণা অমর সিং কয়েক বাক্স ডুমুর জাতীয় ফল পাঠান। এই ফল খুবই ভাল। আমি এমন সুমিষ্ট ডুমুর ভারতের অন্য জায়গায় দেখিনি। কিন্তু এ ফল বেশী খেলে ক্ষতি করে।

১৪ই তারিখ যাত্রা শুরু করে বলকলি গ্রামে শিবির পড়ে। এখানে, হীরাটের নিকটবর্তী কারিজে জন্মানো অনেক ফুটি আমার কাছে আনা হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসরে কোনও বারই এত বেশী ফুটি আনা হয়নি। একটা ট্রের ওপর অনেক রকম ফল সাজিয়ে আমাকে দেওয়া হলো—কারিজের ফুটি, কাবুল ও বাদাকসানের ফুটি, সমরকন্দ ও বাদাকসানের আঙ্গুর, সমরকন্দ, কাশ্মীর, কাবুল ও কাবুলের অঙ্গরাজ্য জালানাবাদের আপেল ও ইউরোপীয় বন্দর থেকে আমদানি আনারস যার গাছ আগ্রায় কেনা হয়েছে। প্রত্যেক বছর কয়েক হাজার কমলা খালিসা-ই-সরিফা (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) থেকে তোলা হয়। সেগুলি কমলালেবুর মত দেখতে হলেও আকারে ছোট কিন্তু স্বাদে অনেক ভাল। কমলালেবু সুবা বাংলায় খুব ফলে। ফলের প্রাচুর্যের এই অনুগ্রহের ভাষায় আর কতটুকু জানাব? আমার মহামান্য পিতা ফল অত্যন্ত ভালবাসতেন—বিশেষ করে ফুটি, ডালিম ও আঙ্গুর। তাঁর সময়ে কারিজের ফুটি যা ফুটির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট,ইয়েজদের ডালিম—যার খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী ও সমরকন্দের আঙ্গুর হিন্দুস্থানে আসেনি। এই ফলগুলি দেখে আমার খুবই কষ্ট হয়। যদি সেই সময় ফলগুলি এদেশে আসতো তা হলে তিনি কতই না সুখী হতেন।

১৬ই তারিখ আবার যাত্রা শুরু হয়। সাড়ে চার ক্রোশ এগিয়ে স্বর্গীয় মহিমার শিবির গিরিগ্রামে ফেলা হয়। পথেই শিকারসন্ধানীরা খবর নিয়ে আসে যে এই অঞ্চলে একটা সিংহ আছে। আমি সিংহ শিকার করতে যাই। এক গুলিতেই তাকে শেষ করি। সিংহের বীরত্বের কথা সুবিদিত। আমি এর

পেট কেটে পাকস্থলী দেখতে চাই। পাকস্থলী বের করা হলে দেখা গেল যে অন্য জন্তুর পিত্তগুলি যেমন যকৃতের বাইরে থাকে কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল সিংহের ক্ষেত্রে। এর পিত্তথলি ছিল যকৃতের ভেতরে। মনে হলো সিংহের বীরত্ব বোধ হয় এই কারণেই ঘটেছে।

১৮ই তারিখ পৌনে তিন ক্রোশ পথ চলে অমরিয়া গ্রামে শিবির ফেলা হয়। ১৯শে বিশ্রামের দিন। দুই ক্রোশ দূরে একটি সুন্দর ছবির মত গ্রাম চোখে পড়লো। সেখানকার একটা বাগানে ১০০টি আমগাছ দেখা গেল। আমি এত বড় সবুজ পত্রবহুল সুন্দর আমগাছ আগে দেখিনি। এই বাগানেই খুব বড় একটা বটগাছ ছিল। আমি গাছটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে দেখতে আদেশ করি। নীচ থেকে সব চেয়ে উঁচু শাখা পর্যন্ত হলো ৭৪ হাত, গুঁড়ির মাপ হলো সাড়ে চুয়াল্লিশ হাত এবং যে পর্যন্ত এই গাছের বিস্তৃতি অর্থাৎ ছায়া পড়ে তার মাপ হলো একশ সাড়ে পঁচাত্তর গজ। এই রকম আকৃতির গাছ সাধারণত দেখা যায় না জন্যই লিপিবদ্ধ করলাম।

২০শে আবার যাত্রা শুরু। ২১শে বিশ্রাম। দিনের শেষে শিকার থেকে ফিরে এসে ইতিমাদুদ্দৌলার শিবিরআবাসে যাই। সেখানে খাজা খিজিরের উৎসব হচ্ছিল—যাকে এরা বলে 'খিজরি'। রাত এক প্রহর পর্যন্ত এখানে থাকি। তারপর ক্ষুধার উদ্রেক হলে রাজশিবিরে ফিরে আসি। এই দিন আমি ইতিমাদুদ্দৌলাকে পরিবারের বন্ধু বলে সম্মানিত করে হারেমের মহিলারা যেন তাঁর কাছে মুখ ঘোমটায় ঢেকে না আসেন এই নির্দেশ দিই। এই ব্যবস্থায় তাঁকে চিরস্থায়ী সম্মান দেওয়া হলো।

২২শে তারিখ বুলঘরি গ্রামে, ২৪শে কাশিমখেরা, ২৬শে তারিখ উজ্জয়িনীর দি'কাজিয়ান গ্রামে শিবির পড়ে। এই জায়গায় আমগাছে অনেক মুকুল ধরেছে। একটা হ্রদের ধারে শিবির। জায়গাটি মনোহারি রূপ ধারণ করেছে। এখানে খাজনিন্ খাঁয়ের পুত্র পহারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই হতভাগার পিতার মৃত্যুর পর তাকে অনেক অনুগ্রহ দেখিয়ে আজি-জালুর দেশ ও দুর্গ তাকে দিই। জায়গাটি তারই পূর্বপুরুষদের ছিল। তার বয়স অল্প থাকায় তার মা তাকে কতকগুলি বদঅভ্যাস ত্যাগ করার জন্য বলতো। সেই কালোমুখ শয়তানটি কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে এক রাতে বাড়িতে এসে নিজ হাতে তার মাকে হত্যা করে। এই সংবাদ আমার কাছে পৌছালে তাকে ধরে আনতে আদেশ দিই। তার অপরাধ প্রমাণিত

হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করি।

এই বিশ্রামস্থলে একটা তেঁতুল গাছ দেখলাম যার আকার ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধরনের। মূল গাছটির একটি গুঁড়ি। ছয় গজ ওপরে দুটি ডাল গজিয়েছে—একটি ১০ গজ, আর একটি সাড়ে নয় গজ। দুইটি শাখার দূরত্ব সাড়ে চার গজ। শাখা দুটি এবং পাতা যেখানে শেষ হয়েছে—মাটি থেকে দূরত্ব বড় শাখার ১৬ গজ এবং ছোট শাখার সাড়ে পনেরো গজ। যেখান থেকে শাখা ও পাতা বেরিয়েছে সেখান থেকে গাছের মাথা পর্যন্ত দূরত্ব আড়াই গজ। এই গাছটি ঘিরে তিন গজ উঁচু চবুতরা নির্মাণ করতে আদেশ দিই। গাছের গুঁড়ি খুব সোজা ও সুন্দর দেখে আমার চিত্রকরদের জাহাঙ্গীরনামার জন্য এই গাছের একটা ছবি আঁকতে বলি।

২৭শে তারিখ যাত্রা শুরু করে হিন্দুয়াল গ্রামে এবং ২৮শে তারিখ কালিয়াদহ গ্রামে শিবির পড়ে। কালিয়াদহ নামে অট্টালিকাটি মালবের রাজা সুলতান মামুদ খাল্‌জির পুত্র গিয়াসউদ্দিনের পুত্র নাসিরুদ্দিন নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনকালে মালব সুবার একটি প্রসিদ্ধ নগর উজ্জয়িনীর কাছে এই অট্টালিকা নির্মিত হয়। জনশ্রুতি এই যে এখানে অত্যধিক গরমে তিনি কাবু হয়ে পড়েন এবং জলের মধ্যেই সময় কাটাতেন। নদীর মধ্যে তিনি এই বাড়িটি করেন। নদীর জলধারা খাল কেটে ছড়িয়ে দিয়ে, অট্টালিকার সব দিকে, বাইরে ও ভিতরে জল আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। জায়গাটি খুবই সুন্দর ও উপভোগ্য। হিন্দুস্থানের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে থাকার সিদ্ধান্ত করে পূর্বেই কারিগরদের জায়গাটি পরিষ্কার করার জন্য আদেশ দিয়েছিলাম। জায়গাটির সৌন্দর্যের জন্য এখানে তিন দিন অবস্থান করি।

উজ্জয়িনী একটি পুরাতন নগর। হিন্দুদের সাতটি পবিত্রস্থানের মধ্যে এটি একটি। রাজা বিক্রমজিৎ—যিনি হিন্দুস্থানে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ-বিদ্যা প্রবর্তন করেন এই নগরীতে বাস করতেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ১০২৬ হিজরা সন (১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং আমার রাজত্বের একাদশ বর্ষ পর্যন্ত ১৬৭৫ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। হিন্দুস্থানের জ্যোতিষীদের গণনা তাঁরই পর্যবেক্ষণের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। এই নগরটি শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। হিন্দুদের বিশ্বাস কোনও কোনও বছরে কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে এই নদীর জল দুধে পরিণত হয়। আমার মহান পিতার রাজত্বকালে যখন তিনি আমার ভাই সা'মুরাদের ব্যাপার মীমাংসার

জন্য আবুল ফজলকে এখানে পাঠান, তখন তিনি এই নগর থেকে নিবেদন করেন যে এখানকার হিন্দু ও মুসলমান বহু লোক একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছে যে কয়েকদিন আগে রাত্রে নদীর জল দুধ হয়ে গিয়েছিল। যে সব লোক এখান থেকে সে-রাত্রে জল নিয়েছে তারা সকালে দেখে তাদের পাত্র দুধে পূর্ণ। এই গল্পটি এখানে খুব চালু থাকায় এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। আমার বুদ্ধি কিন্তু এই গল্পের সত্যতায় সায় দেয় না। প্রকৃত ব্যাপার কি এক আল্লাই তা জানেন।

২রা ইস্‌ফানদারমুজ কালিয়াদহ থেকে নৌকায় উঠে পরবর্তী বিশ্রাম শিবিরে যাই। আমি প্রায়ই শুনি যে যাদরূপ নামে একজন কঠোর ব্রতাবলম্বী বহু বৎসর পূর্বে উজ্জয়িনী থেকে মরুভূমির এক পাশে চলে আসেন এবং ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত হন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আমার খুব ইচ্ছা হয়। রাজধানী আগ্রায় যখন ছিলাম তখনই তাঁকে দেখার জন্য ডেকে পাঠাতে ইচ্ছা করি। শেষে তাঁর কষ্ট হতে পারে মনে করে আমি তাঁকে আহ্বান করিনি। আমি এই নগরীর কাছে পৌছালে নৌকা থেকে নেমে আধ ক্রোশ পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাঁর বাসের জন্য তিনি যে স্থানটি নির্দিষ্ট করেছেন সেটা একটা পাহাড়ের গায়ে খোঁড়া একটি গর্ত। তাতে দরজা লাগানো। একজন শীর্ণ লোক শতবার কসরৎ করে সেখানে ঢুকতে পারে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে গর্তটা এমনি। এই ছোট্ট অন্ধকার গর্তে তিনি নির্জনে কাটান। শীত ঋতুর ঠাণ্ডা দিনেও তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন থাকেন—শুধু একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া সামনে ও পিছনে ঢাকা থাকে। তিনি আগুন জ্বালান না। রুমের মোল্লা দরবেশ এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন :—

"সূর্য্য-রশ্মি আমাদের পরিধান, দিনে।
রাতে শয্যা পাতি মোরা চন্দ্রের কিরণে।"

দিনে তাঁর আবাসের কাছে যে জল আছে তাতে দুইবার স্নান করেন। দিনে একবার তিনি উজ্জয়িনী নগরে যান। সাতঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনি তিনটি পরিবারের কাছ থেকে—যাদের স্ত্রী-পুত্র আছে এবং যাদের উপর তাঁর এই বিশ্বাস আছে যে তারা ধার্মিক ও মানসিক শান্তির অধিকারী—ভিক্ষা স্বরূপ তাদের নিজেদের জন্য রাঁধা খাদ্য থেকে পাঁচ গ্রাম মাত্র গ্রহণ করেন। সেই খাদ্য তিনি না চিবিয়ে গিলে খান যাতে খাদ্যের স্বাদ-গন্ধ তিনি ভোগ করতে না পারেন। তিনি সর্বদাই এই নিয়মরক্ষা করে চলেন যে এই তিন

পরিবারের কোনওটিতে যদি মৃত্যু, জন্ম কিংবা কোনও নারী ঋতুমতী হয় তাহলে সেই সময় সেখান থেকে কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন না। যেমন ভাবে এখানে লেখা হলো সেই ভাবে তিনি জীবনযাপন করেন। তিনি লোকজনের সম্পর্কে আসতে চান না কিন্তু তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করায় লোকে তাঁকে দেখতে যায়। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। বেদান্ত-বিজ্ঞান তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বেদান্তই সুফি ধর্মের ভিত্তি। আমি ছয় ঘড়ি সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি সুন্দর বলেছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে দাগ কেটেছে। আমার সঙ্গ তাঁরও ভাল লেগেছে। আমার মহামান্য পিতা খান্দেশ প্রদেশ অন্তর্গত আসির দুর্গ জয় করে যখন আগ্রা ফিরছিলেন সেই সময় এই জায়গাতেই তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। তিনি সব সময়েই তাঁর কথা মনে রেখেছিলেন।

ভারতবর্ষের পণ্ডিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ জাতির জন্য চারটি নীতি প্রবর্তন করেন। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণই বর্ণশ্রেষ্ঠ। তাঁদের জীবন চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চারভাগকে বলা হয় চার আশ্রম। যে শিশু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত সে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হয় না। কিন্তু আট বছরে পড়লেই তারা ব্রাহ্মণদের সমবেত করে একটি উৎসব পালন করে। মুঞ্জু ঘাসের সওয়া দুই গজ সুতা তৈরী করে—যাকে তারা বলে মুঞ্জি—তার ওপর প্রার্থনা ও মন্ত্র পড়ে সেই সুতাকে তিন ভাগে ভাঁজ করে যার ওপর তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে তাকে দিয়ে বালকের কোমরে পরিয়ে দেয়। আলগা সুতো পাকিয়ে সেটা তার ডান কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি এক গজ লম্বা দণ্ড, একটি তামার জলপাত্র তার হাতে দিয়ে তাকে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই ব্রাহ্মণের কাছে বারো বৎসর থেকে সে বিদ্যাপাঠ করবে—যে বেদকে হিন্দুরা ভগবানের গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে। এই দিন থেকে তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। এই সময় থেকে তাকে সমস্ত সুখ বিসর্জন করতে হবে। দুপুর অতিক্রান্ত হলে সে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অন্য ব্রাহ্মণদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যা পায় তা নিয়ে এসে তার গুরুকে দেয়। গুরুর আদেশ পেলে সেই খাদ্য ভক্ষণ করে। পরিধানে একটি তুলার কটিবস্ত্র যাতে তার দেহের গুহ্য অংশ ঢাকা যায় আর দুই-তিন গজের একটি তুলার চাদর তার কাঁধে রাখার জন্য—এই ভিন্ন আর কোনও বস্ত্র থাকে না। এই অবস্থাকে বলে ব্রহ্মচর্য—যার অর্থ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ।

এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গুরু ও শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে সে বিবাহ করে। বিবাহের পর তার সন্তান জন্মালে সেই সন্তানের বয়স ষোলো বছর না হওয়া পর্যন্ত সে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমস্ত সুখভোগ করতে পারে। যদি তার পুত্রসন্তান না হয় তাহলে সে তার ৪৮ বৎসর পর্যন্ত সামাজিক জীবন যাপন করে। এই সময় তাকে বলা হয় গৃহস্থ। এই সময়ের পর আত্মীয়সজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত অপরিচিত সকলের সংশ্রব ত্যাগ করে, সমস্ত ভোগ্যবস্তু ও আমোদপ্রমোদ বিসর্জন দিয়ে, সংসারের সমস্ত রকমের আকর্ষণ থেকে দূরে নির্জন স্থানে চলে যায় এবং অরণ্যে জীবনযাপন করে। এই অবস্থাকে তারা বলে বাণপ্রস্থ যার অর্থ অরণ্যবাস। হিন্দুদের নীতি এই যে তাদের কোনও সাংসারিক সৎ-কার্যেই স্ত্রীর উপস্থিতি ও সাহচর্য ভিন্ন সুসম্পন্ন হয় না। স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। সংসার ত্যাগ করলেও পূজা-পার্বণাদির কাজ তখনও করতে হয়। সেই জন্য বনে যাওয়ার সময় স্ত্রীকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়। যদি স্ত্রী তখন গর্ভবতী থাকে তাহলে তার বনে গমন পাঁচ বছর পিছিয়ে যায়। তার পর তার শিশুসন্তানকে জ্যেষ্ঠপুত্র কিংবা কোনও আত্মীয়ের কাছে রেখে তার ইচ্ছা পূরণ করে। একই ভাবে স্ত্রী যদি তখন ঋতুমতী হয় তাহলে সে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এর পর সে আর স্ত্রীর সঙ্গে কোনও যৌন সম্পর্ক রাখে না। রাত্রে তারা পৃথক পৃথক শয়ন করে। দ্বাদশ বর্ষকাল তারা এইভাবে অতিবাহিত করে। বনে যে সব সবজি আপনি জন্মায় তাই খায়। সে তখনও উপবীত রাখে এবং অগ্নিপূজা করে। সে তার হাতপায়ের নখ অথবা মাথার চুলের দিকে কোনও যত্ন নেয় না কিংবা গোঁফদাড়ি ছাঁটে না। উল্লিখিতভাবে দ্বাদশ বৎসর কাটিয়ে সে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসে এবংস্ত্রীকে নিজের ছেলে, ভাই এবং জামাতাদের জিম্মায় রেখে তার গুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যায়। তাঁর সম্মুখে আগুন জ্বালিয়ে তার নিজের যা কিছু আছে—যেমন উপবীত, মাথার চুল ইত্যাদি সেই আগুনে নিক্ষেপ করে তাঁকে বলে—"আমার যত কিছু আকর্ষণ—এমন কি আমার সংযম, পূজার্চনা, স্বকীয় ইচ্ছা—সমস্তই আমার থেকে উৎপাটন করলাম। তারপর তার হৃদয় ও মনের তাপ রুদ্ধ করে সর্বক্ষণ নিজেকে ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন রাখে এবং আদি কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই জানে না। যদি সে বিজ্ঞানের কথা বলে তা হবে বেদান্তের বিজ্ঞান। এই অবস্থাকে তারা বলে সর্বত্যাগ (বৈরাগ্য) এবং সেই লোককে বলে সর্বত্যাগী (বৈরাগী)।

যদরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর আমি হাতিতে চড়ে উজ্জয়িনী শহরের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে পথের দুই দিকে সাড়ে তিন হাজার টাকার ছোট ছোট মুদ্রা ছড়াই। পৌনে দুই ক্রোশ চলার পর দাউদখেরাতে আসি। এখানেই রাজকীয় শিবির পড়েছিল। তৃতীয় দিনও বিশ্রামের দিন। যদরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় মধ্যাহ্নের পর তাঁর কাছে যাই। ছয় ঘড়ি তাঁর সঙ্গে মনের আনন্দে কাটাই। এই দিনেও তিনি অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় শিবিরপ্রাসাদে ফিরে আসি।

চতুর্থ দিনে সাড়ে তিন ক্রোশ পথ আসি জরাও গ্রামের পারানিয়া উদ্যানে এবং ৬ই তারিখ পৌনে পাঁচ ক্রোশ পথ চলে আসি দেবালপুর ভেরিইয়া হ্রদের তীরে। জায়গাটির মনোহারিত্ব এবং হ্রদটির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এখানে চারদিন থাকি। ১১ই তারিখ আসি দৌলতাবাগ পরগণায়। ১২ই তারিখ ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে যাই। এই পরগণায় শেখুপুর গ্রামে খুব বড় এবং মোটা বটগাছ দেখি। এর গুঁড়ি সাড়ে আঠার গজ, মূল থেকে শাখার আগা পর্যন্ত একশ সওয়া আটাশ হাত। গাছের শাখায় মাটিতে যে ছায়া ছড়ায় তার মাপ —দুশো সাড়ে তিন হাত। গাছের একটি শাখা হাতির দাঁতের মত, ৪০ গজ দীর্ঘ। মাননীয় পিতা এই গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মাটি থেকে পৌনে চার গজ উপরে তাঁর হাতের ছাপ মেরেছিলেন। আমি অন্য একটি শাখায় আট গজ ওপরে আমার হাতের ছাপ লাগাতে আদেশ দিই। এই দুইটি হাতের ছাপ যাতে সময়ে মুছে না যায় সেজন্য ছাপ দুটি মার্বেল পাথরে খোদাই করে গাছের গুঁড়িতে আটকিয়ে রাখতে এবং গাছটিকে ঘিরে একটা চবুতরা তৈরীর আদেশ দিই।

১২ই তারিখ আবার যাত্রা শুরু করে বেগমদের এবং অন্তরঙ্গ ও ভৃত্যদের সঙ্গে নিয়ে পৃথকভাবে শিবির ত্যাগ করি। পরবর্তী শিবির নাল্‌চা গ্রামের কাছে পড়লেও আমি সাংগোর গ্রামে আসি। এই গ্রামের সৌন্দর্যের কথা আর কি লিখব। এখানে অনেক আমের গাছ। জমিও বেশ সবুজ ও প্রীতিপ্রদ। জায়গাটির সবুজ শোভা ও মনোহারিত্বের জন্য এইখানে তিন দিন থাকি। কেশোদাম মারুর পরিবর্তে এই জায়গাটি শিকারী কমাল খাঁকে দান করি। আদেশ দেওয়া হয়—এই গ্রামের নাম হবে কমালপুর। এই বিশ্রামস্থলেই শিবরাত্রি উৎসবের রাত আসে। অনেক যোগী সমবেত হয়। রাতের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যোগীদের মধ্যে জ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-

আলোচনার জন্য মিলিত হই।

এইখানে রাজা মানের হত্যার সংবাদ আমার কাছে পৌঁছায়। কাংগ্রা দুর্গ জয়ের জন্য যে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছে তার অধিনায়ক করে তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি লাহোরে পৌঁছালে শুনতে পান পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের সংগ্রাম ক্রমে একজন জমিদার আক্রমণ করে তাঁর প্রদেশের কিছু অংশ দখল করেছে। তাকে বিতাড়নই প্রথম কর্তব্য মনে করে তিনি এদিকে যান। সংগ্রামের তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নাই দেখে যে জায়গা সে দখল করেছিল তা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলের অনধিগম্যস্থানে আশ্রয় নেয়। রাজা মান তাকে অনুসরণ করে সেখানে যান। অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং ফেরার উপায় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে সংগ্রামের মুখোমুখি হন। সংগ্রাম যখন দেখলো যে তার পলায়নের আর কোনও পথ খোলা নাই তখন এই কবিতার রীতি অনুসারে—

"আপদকালে, পালাবার পথ, যদি না পাওয়া যায়,
শাণিত তরবারি তখন হাতে, জোরে ধরতে হয়।"

—যুদ্ধ চলে। ভাগ্যচক্রে একটি গুলি রাজা মানের দেহবিদ্ধ হয় এবং তাঁর আত্মা সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যায়। তাঁর সেনারা পরাজিত হয়। অনেকে আহত হয়। অবশিষ্টরা আহত হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব ফেলে রেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পালিয়ে আসে।

১৭ই থেকে সাংগোর থেকে রওনা হয়ে হাসিলপুর আসি। গ্রামটি সুবা মালবের একটি প্রধান স্থান। এখানে অনেক আঙুরের ক্ষেত ও অসংখ্য আম গাছ আছে। গ্রামটির চারধার দিয়েই নদী বয়ে যাচ্ছে। যে সময় এখানে পৌঁছাই সে সময় ওয়ালিয়াতে (পারস্য ও আফগানিস্থান) আঙ্গুরের সময় না হলেও এখানে ফলেছে। আঙ্গুর এখানে এত প্রচুর ও সস্তা যে অতি দরিদ্র লোকেও ইচ্ছামত খেতে পারে। এমন সুন্দর গ্রাম অল্পই দেখা যায়। আরও তিনদিন এখানে কাটাই। ২১শে তারিখ বড় শিবির নালচায় পুনরায় আসি। ২২শে রবিবার নালচা থেকে যাত্রা করে মাণ্ডু দুর্গের তলায় হ্রদের ধারে শিবির ফেলা হয়। শিকারীরা সংবাদ আনে—তিন ক্রোশের মধ্যে একটি বাঘ তাদের চোখে পড়েছে। যদিও দিনটা ছিল রবিবার এবং দুইদিন রবি ও বৃহস্পতিবার আমি শিকার করি না, কিন্তু আমার মনে হলো যে বাঘ অত্যন্ত হিংস্র জন্তু জন্য তাকে মেরে ফেলাই উচিত। আমি বাঘকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসি।

দেখতে পাই যে একটি গাছের ছায়ায় বাঘটি বসে আছে। হাতির পিঠ থেকে দেখলাম যে তার মুখটি আধখোলা। মুখের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। ভাগ্যক্রমে গুলিটা মুখে ঢুকে গলার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত করে। একটি গুলিতেই বাঘের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। আমার সঙ্গীরা বাঘের দেহে কোথায় গুলি লেগেছে দেখার চেষ্টা করে কিন্তু কোনও ক্ষতস্থান তাদের চোখে পড়ে না। কারণ গুলির আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে নাই। শেষে বাঘের মুখ দেখতে আদেশ দিই। দেখা গেল যে গুলি মুখে ঢুকে যাওয়ায় বাঘটা মারা পড়েছে। মির্জা রুস্তম একটা নেকড়ে বাঘ মেরে নিয়ে আসে। আমি দেখতে চাই যে এর পিত্তথলি বাঘের মত যকৃতের ভেতর অথবা অন্যান্য পশুর মত বাইরে। পরীক্ষা করে দেখা গেল এর পিত্তথলি যকৃতের ভেতর।

২৩শে তারিখ সোমবার একপ্রহর অতিবাহিত হলে শুভসময়ে হাতিতে চড়ে মাণ্ডু দুর্গের দিকে যাই। দিনের এক প্রহর তিন ঘড়ি অতিবাহিত হলে যে বাড়ী সম্রাটের জন্য তৈরী হয়েছে সেখানে আসি। পথে ১৫০০৲ টাকা ছড়াই। আজমীঢ় থেকে মাণ্ডুর দূরত্ব ১৫৯ ক্রোশ। ৪ মাস ২দিনে ৪৬ বার পথ চলে, ৭৮ দিন বিশ্রামশিবিরে কাটিয়ে এই পথ অতিক্রম করি। ৪৬বার পথ চলার পর আমাদের বিশ্রামশিবির পড়ে পুকুর, হ্রদ বা নদীর তীরে মনোরম স্থানে যেখানে অসংখ্য গাছ। পুষ্পিত কপির ক্ষেত। এমন দিন যায়নি যেদিন পথেই হোক অথবা বিরামকালেই হোক শিকার করিনি। অশ্ব কিংবা হস্তীপৃষ্ঠে পথ চলেছি—চারদিকের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে অথবা শিকার করে। ভ্রমণের কষ্ট একটুও অনুভব করিনি। বরং বলা যেতে পারে যে এক উদ্যান থেকে আর এক উদ্যানে এসেছি। আমার শিকারকালে সব সময়ের সঙ্গী ছিলেন—আসফ খাঁ, মির্জা রুস্তম, মির মিরাণ, অনিরুদ্ধ হিদায়াতুল্লা, রাজা সারংদেও, সৈয়দ কান্ত ও খাবাস খাঁ। এই দেশে রাজপতাকা পৌঁছানোর পূর্বে আমি স্থপতিবিদ আবদুল করিমকে মাণ্ডুর প্রাচীন শাসকদের বাড়ীগুলি মেরামত করতে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার আজমীঢ় থাকার সময়ই মেরামত-যোগ্য বাড়ীগুলি মেরামত করেছে এবং কোনও কোনও স্থানে নতুন অট্টালিকাও নির্মাণ করেছে। সে এখানে এমন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছে যার তুল্য সুন্দর সুদৃশ্য আবাস অন্য কোনও জায়গায় তৈরী হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই প্রাসাদ নির্মাণে। সম্রাটের বাসের যোগ্য এইরকম জমকালো প্রাসাদ প্রত্যেক প্রধান নগরে নির্মিত হওয়া

উচিত। দুর্গটি একটি পাহাড়ের চূড়ায়—যার ব্যাস দশ ক্রোশ। বর্ষাকালে এই দুর্গস্থানের মত সুন্দর আবহাওয়া আর কোনও জায়গায় মেলে না। রাত্রে এমন ঠাণ্ডা যে গায়ে একটা আবরণ না দিলে চলে না আর দিলেও পাখা নাড়তে হয় না। লোকে বলে রাজা বিক্রমজিতের পূর্বে রাজা জয়সিংদেও নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সময় একজন ঘাসুড়ে মাঠে ঘাস কাটতে যায়। ঘাস কাটতে কাটতে সে দেখতে পায় যে তার হাতের কাস্তে সোনা হয়ে গিয়েছে। কাস্তের রং অন্য রকম হয়েছে দেখে সে মদন নামে এক কর্মকারের কাছে কাস্তেটি মেরামত করার জন্য নিয়ে যায়। কর্মকার দেখেই বুঝলো যে কাস্তেটি সোনা হয়ে গিয়েছে। এদিকে একথা আগেই প্রচার ছিল যে এই দেশে একটি পরশ-পাথর আছে যাতে লোহা ও তামা ছোঁয়ালেই সোনা হয়ে যায়। ঘাসুড়েকে সঙ্গে নিয়ে সে সেই জায়গায় যায় এবং পাথরটি সংগ্রহ করে। তার পর সেই সময়কার রাজার কাছে এই অমূল্য পাথরটি নিয়ে আসে। রাজা এই পাথর দিয়ে সোনা করেন। তার কিছু অংশ খরচ করে এই দুর্গের অট্টালিকাগুলির নির্মাণ বারো বছরের মধ্যে শেষ করেন। সেই কর্মকারের অনুরোধে কামারের নেহাইয়ের আকারে বেশীর ভাগ পাথর কাটিয়েই দুর্গের দেওয়াল প্রস্তুত করেন। তাঁর জীবনাবসান হওয়ার কয়েকদিন আগে যখন তাঁর পার্থিব জীবনের ওপর সব মোহ কেটে গিয়েছে তখন তিনি হিন্দুদের পবিত্র পূজার স্থান নর্মদা তীরে একটি ব্রাহ্মণ-সভা আহ্বান করেন এবং প্রত্যেককে নগদ অর্থ ও রত্নদান করেন। একজন ব্রাহ্মণের পালা আসে যাঁর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের সম্পর্ক। তাঁর হাতে রাজা এই পাথরটি তুলে দেন। ব্রাহ্মণটি পাথরের মর্ম না বুঝে ক্রুদ্ধ হয়ে এই অমূল্য রত্নটি জলে ছুঁড়ে ফেলেন। শেষে প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি চির মনদুঃখের বন্দী হন। রত্নের জন্য যত খোঁজা-খুঁজিই করুন না কেন তার কোনও চিহ্নও আর মেলে না। এসব কথা কোনও বইয়ে লেখা নাই—জনশ্রুতি মাত্র। কিন্তু আমার বাস্তব-বুদ্ধি এ গল্প মেনে নিতে পারে না। আমার কাছে এসব ধাপ্পার ব্যাপার। মালব সুবায় মাণ্ডু একটি প্রসিদ্ধ সরকার। এর রাজস্ব ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার দাম। এই দেশের রাজাদের রাজধানী ছিল এটি। এখানে অনেক অট্টালিকা ও পূর্বতন রাজাদের চিহ্ন পাওয়া যায় যা এখনও পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি।

২৪শে তারিখ অশ্বপৃষ্ঠে চারদিক ঘুরে দেখার জন্য এবং পূর্বতন রাজাদের অট্টালিকা দেখতে বের হই। প্রথমে যাই জামি মসজিদ দেখতে। এই মসজিদ

সুলতান হুয়াং ঘোরির তৈরী। খুব উঁচু অট্টালিকা—কাটা পাথরে তৈরি। যদিও আজ থেকে ১৮০ বছর আগে তৈরি হয়েছে—কিন্তু দেখে মনে হয় যে কারিগররা এইমাত্র কাজ শেষ করে গিয়েছে। এর পর আমি যে সৌধে খায়েজি শাসকদের সমাধি আছে সেইখানে যাই। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পুত্র নাসিরুদ্দিনের—যার মুখ চিরকালের জন্য কালো হয়ে আছে—কবরও এইখানে। একথা সকলের জানা যে এই শয়তানের নাম তার নিজের আশি বৎসর বয়স্ক পিতা গিয়াসউদ্দিনকে হত্যার পাপে চিরকালের মত কলঙ্কিত হয়ে আছে। দুইবার সে পিতাকে বিষ দেয়। দুইবারই তিনি 'জহর মুহুরা' (বিষের প্রতিষেধক দিয়ে সেই বিষের ক্রিয়া প্রতিরোধ করেন। তৃতীয়বার সে এক পেয়ালা শরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে নিজের হাতে তার পিতাকে দিয়ে বলে এ শরবত পান করতেই হবে। তার পিতা বুঝতে পারলেন কি অসম্ভব চেষ্টাই তার প্রাণনাশের জন্য পুত্র করছে। তিনি তাঁর বাহু থেকে 'জহর মুহুরা' খুলে নিয়ে পুত্রের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে অতি বিনীতভাবে মুখ আল্লার সিংহাসনের দিকে ফিরিয়ে প্রার্থনা জানালেন—'হে আল্লা, আমার বয়স আশি হয়েছে। আমার জীবন তেমনি সমৃদ্ধি ও সুখের মধ্যে কেটেছে যেমন একজন রাজা কাটাতে পারে। এখন আমার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। আমি প্রার্থনা করি আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি নাসিরের কোনও অপরাধ নিও না। আমার মৃত্যু তোমারই অভিপ্রেত এই মনে করে যেন তাঁকে কোনও শাস্তি দিও না।' এই প্রার্থনা জানানোর পরই তিনি সেই বিষমিশ্রিত শরবত এক ঢোকে পান করেন এবং তাঁর আত্মা আল্লার কাছে সঁপে দেন। তাঁর উক্তির নির্গলিতার্থ এই যে তাঁর রাজত্বকাল এমন ভোগসুখে কাটিয়েছেন যা অন্য কোনও রাজার ভাগ্যে ঘটেনি। ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু ও আত্মীয়দের বলেন—"আমার মাননীয় পিতার সময় ৩০ বছর যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে কাটিয়েছি। সৈনিকের কাজ আমি একদিনও অবহেলা করিনি। এখন রাজত্ব করার পালা আমার ওপর পড়েছে। দেশ জয় করার আমার কোনও ইচ্ছা নাই। অবশিষ্ট জীবন আমি আরামে ও ভোগসুখে কাটাব। শোনা যায় তাঁর হারেমে পনেরো হাজার স্ত্রীলোক রেখেছিলেন। তাঁর রাজধানীতে সব রকম জাতি ও বর্ণের লোক ছিল। কারিগর, কাজি, কোতোয়াল অর্থাৎ নগর-শাসন পরিচালনার জন্য যত রকমের লোকের প্রয়োজন হয় সবই সেখানে ছিল। কোনও সুন্দরী কুমারী

মেয়ের কথা শুনলেই যতদিন তাকে লাভ করতে না পারেন ততদিন তিনি ক্ষান্ত হতেন না। স্ত্রীলোকদের তিনি সব রকম শিল্প ও চারুকলা শিক্ষা দিতেন। শিকার তাঁর প্রিয় ব্যসন ছিল। তিনি একটি পশুশালা করেছিলেন—তাতে সব রকমের জন্তু ছিল। তাঁর বেগমদের নিয়ে তিনি শিকারে যেতেন। সংক্ষেপে এই কথাই বলা যায় যে তাঁর ৩২ বছরের রাজত্বে তাঁর মনের ইচ্ছানুযায়ী কোনও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেননি। এই সময় তিনি আরামে, ভোগবিলাসে কাটিয়েছেন।—কোনও শত্রুও তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেনি।

শোনা যায় শের খাঁ আফগান তাঁর রাজত্বকালে নাসিরুদ্দিনের ঘৃণিত আচরণের জন্য এবং তার পাশবিক কাজের প্রতি ঘৃণাবশে কবরের মাথা লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। আমিও এই সমাধি দেখতে গেলে সমাধিতে কয়েকবার লাথি মারি এবং যে সব কর্মচারী আমার সঙ্গে ছিল তাদেরও লাথি মারতে বলি। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আমি কবর ভেঙ্গে ফেলে সেই অপবিত্র দেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দিই। তখনই আমার মনে হলো যে যখন আগুনই আল্লার জ্যোতি তখন আল্লার আলোতে এই অপবিত্র দেহ দগ্ধ করলে আল্লার আলোকেই কলুষিত করা হবে। তাছাড়া পাছে তার দেহাবশেষ পুড়িয়ে দিলে তার পাপের শাস্তি অন্যলোকে হ্রাস হয়ে যায় সেইজন্য তার দেহের ধ্বংসাবশেষ নর্মদার জলে নিক্ষেপ করার জন্য আদেশ দিই। জীবিতকালে তার মেজাজের ওপর ক্রোধের তাপ প্রভুত্ব করায় তাকে সব সময়েই জলের মধ্যে থাকতে হতো। একথা সবারই জানা আছে যে সুরাপানমত্ততার অবস্থায় সে কালিয়াদহে একটি গভীর জলপাত্রে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। হারেমে তার কয়েকজন পরিচারক তাকে জল থেকে তোলার জন্য চেষ্টা করে ও তার চুল ধরে জল থেকে তুলে আনে। তার জ্ঞান ফিরে এলে তার কি হয়েছে সবাই জানায়। তাকে মাথার চুল ধরে টেনে তুলেছে শুনে সে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে সেই পরিচারকদের হাত কেটে ফেলার আদেশ দেয়। আর একবার এমনি ব্যাপার ঘটলে তাকে জল থেকে তোলার আর কারও সাহস হলো না। সে জলে ডুবে যায়। ভাগ্যক্রমে তার মৃত্যুর সময় থেকে ১১০ বছর কেটে গেলেও তার ক্ষয়প্রাপ্ত দেহাবশেষ আবার জলেই মিশে গেল।

যেদিন রাজকীয় পতাকা মাণ্ডু দুর্গে প্রবেশ করে সেইদিনই আমার মহা-সৌভাগ্যবান পুত্র সুলতান খুররাম তার বিজয়ী সেনাবাহিনীসহ খান্দেশ

প্রদেশের রাজধানী বুরহানপুর প্রবেশ করেছে।

আজমীঢ় থেকে যাত্রার সময় থেকে উপরোক্ত মাসের ২৩শে (ইস্‌ফানদার মুজ—যেদিন জাহাঙ্গীর মাণ্ডু পৌঁছান) পর্যন্ত ৪ মাস ২টি বাঘ, ২৭টি নীলগাই, ৬টি চিতল (এক জাতীয় গায়ে ফুটকি-ফুটকি দাগবিশিষ্ট হরিণ), ৬০টি হরিণ, ২৩টি খরগোশ ও শেয়াল, ১২০০ জলচর পাখী এবং অন্যান্য জন্তু শিকার করি। আমার মনে হলো যে আমার জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার শুরু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমার শিকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারলে ভাল হয়। সংবাদ-লেখক, শিকার-স্থমারনবিশ, শিকারীদের এবং আরও শিকারের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের আদেশ দিলাম তারা যেন অনুসন্ধান করে জানায় যে শিকারে আমি কতগুলি জন্তু মেরেছি। আমাকে দেখানো হয় যে আমার বারো বৎসর অর্থাৎ ৯৮০ হিজরা সন (১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে এই বছরের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ আমার রাজ্যাভিষেকের ১১ বছর পর্যন্ত ২৮৫৩২টি শিকার আমার সম্মুখে হয়েছে। এর মধ্যে ১৭,১৬৭টি জন্তু আমি নিজে মেরেছি। বন্দুক বা অন্য কিছু দিয়ে চতুষ্পদ প্রাণী ৩২০৩টি এবং পাখী ১০,৩৪৮টি।

শুভ রাজ্যাভিষেকের পর দ্বাদশ নওরোজ উৎসব

৩০শে ইস্‌ফানদারমুজ (১২ই রবিউল আওয়াল, ১০২৬, ২০শে মার্চ, ১৬১৭), সোমবার দিনের একঘড়ি অবশিষ্ট থাকতে সূর্য মীন রাশি থেকে তাঁর আনন্দময় উচ্চ গৌরবস্থান মেষ রাশিতে আগমন করেন। সেই শুভ মুহূর্তে আমি সিংহাসনে বসি। প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রকাশ্য দরবারহল সূক্ষ্মবস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করার আদেশ দিই। বেশীর ভাগ আমির ও প্রধান ব্যক্তিরা আমার পুত্র খুররামের সঙ্গে থাকলেও যে সম্মেলন হয় তা পূর্ব পূর্ব বৎসরের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না।

১লা ফারওয়ার দিন (২১শে অথবা ২২শে মার্চ, ১৬১৭) সা' খুররামের কাছ থেকে এই মর্মে নিবেদন আসে যে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতই নওরোজ উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে এখন পথ চলা ও কাজ করার সময় বিবেচনা করে কর্মচারীদের উপঢৌকন দান থেকে রেহাই দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। পুত্রের এই কাজ আমি বিশেষভাবে সমর্থন করি। প্রার্থনার সময় আমার প্রিয় পুত্রের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করে আল্লার সিংহাসনের কাছে পুত্রের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাই। এই নববর্ষ উৎসবে কেউ উপঢৌকন দেবেন না এই আদেশ করি।

অধিকাংশের মেজাজ এবং দেহ তামাক খেলে ভাল থাকে না জন্য আদেশ দিই যে কেউ তামাক খাবে না। আমার ভ্রাতা সা'আব্বাসও তামাকের আগুনের কথা জানতেন। তিনি আদেশ দেন যে ইরানের কেউ যেন তামাক খাওয়ার সাহস না দেখায়। খান আলমের (পারস্যে প্রেরিত দূত) অনবরত ধূমপান করার অভ্যাস থাকায় তিনি প্রায়ই ধূমপান করতেন। ইরাণের রাজদূত ইয়াদগার আলি সুলতান ইরাণের রাজা সা' আব্বাসকে জানায় যে আলম এক মুহূর্তও ধূমপান থেকে বিরত থাকেন না। সা'আব্বাস তার উত্তরে এই কবিতাটি লেখেন :—

"বন্ধুর রাজ্যের দূত
যখন তাম্রকূটের ভক্ত,
বন্ধুত্বের দীপে তাই,
তামাক-বাজার রাখি দীপ্ত।"

খান আলম এর উত্তরে এই কবিতাটি লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন :—

"হতভাগ্য আমি, হতাশ হই,
তামাকবন্ধের হুকুম দেখে।
সা'র দয়ায় তামাক বাজার,
আবার চললো অবশেষে।"

৩রা তারিখ সুরাপান উৎসবের আয়োজন করা হয়। যে সব কর্মচারী আমার সঙ্গে আছেন তাদের অধিকাংশেরই হাতে সুরাপাত্র তুলে দিয়ে তাদের আনুগত্যের নেশা বাড়িয়ে তুলি।

৪ঠা তারিখ শিকারীরা সংবাদ পাঠায় যে তারা সক্‌কর (সাগন-সাগর) পুকুরের কাছে একটা সিংহ দেখেছে। জায়গাটা দুর্গের ভেতরে। আমি তৎক্ষণাৎ হাতিতে চড়ে শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হই। সিংহের দেখা পেতেই সে আহদি ও দলের অন্যান্যদের মধ্যে দশ-বারোজনকে আহত করে। শেষে বন্দুকের তিনটি গুলিতে তাকে শেষ করে আল্লার ভৃত্যদের দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করি।

১০ই ফারওয়ারদিন (২১শে রবিউল আওয়াল, ১০২৬) আমার চান্দ্র বৎসরের ওজন-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই দিন আমার ব্যক্তিগত অশ্বশালা থেকে দুইটি ইরাকি অশ্ব এবং সম্মানসূচক পোশাক বহরাম বেগের হেপাজতে খুররামকে পাঠাই।

১৯শে তারিখ শনিবার দিনের তিনঘড়ি অবশিষ্ট থাকার সময় রবিগ্রহের সরফ (তুঙ্গীস্থানে আরোহণ) আরম্ভ হয়। সেই সময় আমি পুনরায় সিংহাসনে বসি। বিদ্রোহী অম্বরের সঙ্গে সা'নওয়াজ খানের যুদ্ধে বিজয়ী সাম্রাজ্যবাহিনী যে বত্রিশজন শত্রুপক্ষের সৈন্য বন্দী করেছিল তার একজনকে ইতিকাদ খাঁয়ের হাতে দিয়েছিলাম। যে সব প্রহরীর রক্ষণাধীনে তাকে রাখা হয় তাদের অসতর্কতায় সে পলায়নের সুযোগ পায়। এইজন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ইতিকাদ খাঁকে তিন মাস আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার জন্য আদেশ জারি করি। বন্দীটির নাম ও অবস্থা জানা না থাকায় তাকে পুনরায় ধরার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে চেষ্টা সফল হয়নি। অবশেষে যে রক্ষীদল বন্দীকে ঠিকভাবে রাখতে অসাবধানতা দেখিয়েছে তাদের সর্দারকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিই। ইতিমাদুদ্দৌলার অনুরোধে ইতিকাদ খাঁ এইদিন আমাকে কুর্নিশ করার সৌভাগ্যলাভ করে।

২১শে তারিখ ইরাণের রাজদূত মহম্মদ রিজাকে ৬০ হাজার দরাব (ত্রিশ হাজার টাকা) ও একটি সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিয়ে বিদায় দিই। ভাই সা' আব্বাস যে 'ইয়াদ-বুদি' (স্মারক দ্রব্য) আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমি তারই প্রতিদানে উক্ত দূতের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শাসকরা যে সব রত্নখচিত দ্রব্য পাঠিয়েছিলেন তার কিছু কিছু এবং বস্ত্র ও নানা উপহারযোগ্য দুর্লভ বস্তু যার মূল্য এক লক্ষ টাকা তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করি। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে ইরাক থেকে চেলেবি প্রেরিত একটা স্ফটিকের পেয়ালাও ছিল। এ পেয়ালাটি তিনি দেখেছিলেন এবং দূতকে বলেছিলেন যে যদি তার ভাই (জাহাঙ্গীর) এই পেয়ালায় সুরাপান করে তাঁকে পাঠান তাহলে তাঁর প্রতি বহুত ভালবাসা দেখানো হবে। দূত আমাকে এই কথা জানালে এই পেয়ালায় তাঁর সামনে কয়েকবার সুরাপান করে পেয়ালাটির একটি ঢাকনি ও পিরিচ নির্মাণের আদেশ দিই এবং এগুলিকে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে পাঠাই। ঢাকনিটি মিনা করা ছিল। মুন্সীদের সা'র চিঠির নিয়মমাফিক জবাব লিখে দূতের হাতে পাঠানোর আদেশ দিই।

২২শে তারিখ শিকার-সন্ধানীরা একটা বাঘের খবর আনে। তৎক্ষণাৎ হাতির পিঠে উঠে বাঘের সন্ধানে যাই। তিনটি গুলির আঘাতে হিংস্রতার কবল থেকে জনগণকে এবং তার নীচপ্রকৃতির খলতা থেকেও নিজেকে রক্ষা করি। মাসিহুজুমান আমার কাছে একটি বেড়াল আনে। সে জানায়—বেড়ালটি উভলিঙ্গ। তার বাড়ীতে এর বাচ্চা আছে। আবার সে যখন অন্য কোনও বেড়ালের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে তখন আবার শেষোক্ত বেড়ালটির বাচ্চা হয়।

যে হীরাটি মুকারব খাঁ পত্রবাহকদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন ১লা উর্দিবিহিস্ত বৃহস্পতিবার সেটি আমার সামনে আনা হয়। এর ওজন হয় ২৩ সারখ (রতি)। জহুরিরা এর মূল্য ধার্য করে ত্রিশ হাজার টাকা। এটি একটি প্রথম শ্রেণীর হীরক। আমার খুব পছন্দ হয়। এই হীরা দিয়ে একটি অঙ্গুরী তৈরী করতে আদেশ দিই।

৭ই তারিখ চারটি বাঘ শিকারীদের নজরে আসায় দুই প্রহর তিন ঘড়ি অতিবাহিত হলে আমি বেগমদের নিয়ে শিকারে বের হই। বাঘগুলিকে দেখা গেলে নূরজাহান বেগম অনুরোধ জানান যে আমি আদেশ দিলে তিনি তাঁর বন্দুক দিয়ে এই বাঘগুলি শিকার করবেন।

আমি বল্লাম—তাই হোক।

তিনি দুইটি বাঘ একটি-একটি গুলিতে, আর দুইটি বাঘ চারটি গুলিতে ঘায়েল করলেন। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে চারটি বাঘের জীবনলীলা শেষ করে দিলেন। এ পর্যন্ত এমন শিকার আর কখনও দেখা যায়নি যে হাতির পিঠে হাওদার ভেতর থেকে ছয়টি গুলির একটিও ব্যর্থ হয়নি। চারটি প্রাণী একটুও নড়বার বা লাফ দেওয়ার সুযোগও পেল না।

[সৈয়দ আমেদের মন্তব্য :—অনেকে বলে যে একজন কবি এই দ্বিপদী কবিতাটা লিখেছিলেন—"আকারে যদিও নূরজাহান নারী,

(কিন্তু) পুরুষ শ্রেণীর তিনি ব্যাঘ্রশিকারী।"

এই কবিতাটির নির্গলিতার্থ হয়তো এই যে জাহাঙ্গীরের হারেমে প্রবেশ করার পূর্বে তিনি ব্যাঘ্রহন্তা সের আফগানের স্ত্রী ছিলেন]।

অব্যর্থ গুলিচালনার জন্য আমি তাঁকে একজোড়া হীরার পাহন্চি (ব্রেসলেট) উপহার দিই, যার মূল্য এক লক্ষ টাকা এবং তাঁর গায়ে এক হাজার আসরফি ছড়িয়ে দিই।

কয়েকদিন পূর্বে খুররাম বংশীবাদন বিদ্যায় অতুলনীয় ওস্তাদ মহম্মদ নায়িকে আমার আদেশানুসারে পাঠায়। আমি তার কয়েকটি 'মজলিশ-গান' শুনেছি। আমার নামে একটি গজল লিখে সেই গানের সুর বাঁশীতে বাজায়। ১২ই তারিখ আমি তাকে টাকায় ওজন করতে আদেশ দিই। ওজন ৬৩০০ টাকা হয়। এই টাকা ছাড়াও তাকে হাওদা সহ একটি হাতি দিয়ে এবং ঐ টাকার থলির সঙ্গে তাকে হাতিতে চড়িয়ে তার দেশে যেতে আদেশ করি। মির্জা গাজির একজন কর্মচারী গল্পকথক মোল্লা আসাদ এইদিনই থাটা থেকে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর আবৃত্তি ও কথকতা অত্যন্ত মনোহারী ও পরিচ্ছন্ন হওয়ায় আমি তাঁর সঙ্গ খুবই পছন্দ করি। তাঁকে 'মহজুজ খাঁ' উপাধি, এক হাজার টাকা, সম্মানসূচক পোশাক, একটি ঘোড়া, একটি হাতি ও একটি পালকি দিয়ে সুখী করি। কিছুদিন পর তাঁকে টাকা দিয়ে ওজন করার আদেশ দিই। ওজনে ৪৪০০ টাকা হয়। আমি তাকে সমস্ত গল্পের আসরে উপস্থিত থাকতে আদেশ দিই।

এই দিনে আমার ব্যক্তিগত আম্বাখানায় দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুর, গুজরাট ও মালবের পরগণাগুলি থেকে আম আসে। এই প্রদেশের আম মিষ্টত্ব, আঁশশূন্যতা ও বৃহদাকারের জন্য সুপরিচিত এবং বিখ্যাত। এমন আম অল্পই আছে যার সঙ্গে ঐখানকার আমের তুলনা হতে পারে। এইজন্য আমি

প্রায়ই ওখানকার আম এলে আমার সামনে ওজন করতে বলি। ওজনে এক সের, সওয়া সের, এমন কি তার চেয়ে বেশীও হয়। কিন্তু মিষ্ট রস, সুগন্ধ ও সহজপাচ্য হিসাবে আগ্রা প্রদেশের চাপরামৌয়ের আম এই প্রদেশ কেন ভারতের অন্য কোনও স্থানের আমের সঙ্গে তুলনা হয় না।

২৮শে খুরদাদ বাবা খুররামকে একটি বিশেষ ধরনের সোনালি বর্ডার দেওয়া 'নাদিরি' পাঠাই। এর মত সূক্ষ্ম জিনিস এর পূর্বে আমার কারখানায় তৈরী হয়নি। আমি বাহককে এই কথা পুত্রকে বলতে নির্দেশ দিই যে এই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটির বিশেষত্ব এই যে যেদিন দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য আমি আজমীঢ় থেকে যাত্রা করি সেদিন এইটি পরি। এইজন্যই এটা তাকে পাঠালাম। এই দিনই আমার মাথার পাগড়ি খুলে ইতিমাদুদদৌলার মাথায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্মান দেখাই।

আল্লার অনুগ্রহ ও দয়ায় এই দিনে বিরামহীন বৃষ্টিপাত হয়। মাণ্ডুতে জলের খুবই অভাব। এজন্য এখানে সকলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। অধিকাংশ কর্মচারীকে নর্মদার তীরে যাওয়ার জন্য আদেশ দিই। এই ঋতুতে বর্ষণের কোনও আশা ছিল না। লোকদের আতঙ্কিত হতে দেখে আমি আল্লার দরবারের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করি। তিনিও তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপায় এমন বৃষ্টি এনে দেন যে একটি দিন ও রাতে পুকুর ডোবা ও নদী পূর্ণ হয়ে উঠলো। আর লোকদের মন আতঙ্কের পরিবর্তে আনন্দে ভরে উঠলো। আল্লার এই অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ আমি কোন্ ভাষায় বর্ণনা করবো!

৩রা তির আবদুল লতিফের বন্দী হওয়ার সংবাদ দ্রুত সংবাদবাহী নিয়ে আসে। আবদুল গুজরাটের শাসকদের বংশধর। সে এই সুবায় গণ্ডগোল ও বিদ্রোহ সৃষ্টির মূল। তাকে বন্দী করতে পারায় এখানকার সকলেরই স্বস্তির কারণ ঘটে। এজন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। মুকারব খাঁকে আদেশ জানানো হয় যে কোনও মনসবদারের সঙ্গে যেন তাকে এখানে পাঠান। মাণ্ডুর নিকটস্থ অনেক জমিদার আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপঢৌকন দেন। ১৩ই তারিখ 'গুলাব পাসান' (গোলাপজল ছিটানো) উৎসব হয়। এই উৎসবে করণীয় যা কিছু সবই করা হয়।

১৫ই তারিখ বেহারের শাসক ইব্রাহিম খাঁ ফৎজং ঐদিকের জমিদারদের কাছ থেকে এবং খনি থেকে সংগৃহীত নয়টি হীরক যা মহম্মদ বেগের হাতে

পাঠিয়েছেন—আমার কাছে আনা হয়। এর মধ্যে একটি সাড়ে চোদ্দ টাঁক এবং মূল্য এক লক্ষ টাকা।

২৯শে তারিখ বৃহস্পতিবারের শুভদিনে আমার ভাগ্যবান পুত্র বাবা খুররামের দূত সৈয়দ আবদুল্লা বরহা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুত্রের একটি চিঠি দেন। তাতে দাক্ষিণাত্যে একটি জয়ের সংবাদ ছিল। সেখানকার সর্দাররা বশ্যতার ফাঁসে কর্তব্যের মাথা গলিয়ে দীনভাবে বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং তার কাছে দুর্গ ও অন্যান্য সুরক্ষিত স্থান বিশেষ করে আমেদনগর দুর্গের চাবি সমর্পণ করেছে। এই পরম অনুগ্রহ ও উদার দানের জন্য আমার মাথা নত করে দিলাম আল্লার সিংহাসনের উদ্দেশে—যিনি কোনও প্রতিদানই চান না, আর আমার ঠোঁট তাঁরই মহিমা উচ্চারণ করতে লাগলো। আমি বিনম্রচিত্তে আনন্দসূচক ডঙ্কাধ্বনি করতে আদেশ দিই। আল্লাকে ধন্যবাদ যে দেশ আমার অধিকারচ্যুত হয়েছিল তা আবার বিজয়ী সাম্রাজ্যের অধীনে এসে গেছে আর রাজদ্রোহী যারা এতদিন বিদ্রোহের বিষাক্ত বায়ুতে নিশ্বাস নিয়ে অহঙ্কারের দাপট দেখিয়েছিল তারা হৃতসম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে। এই সংবাদ নূরজাহান বেগমের মুখ থেকে প্রথম পাই জন্য তাকে আমি 'টোডা' পরগণা দান করি, যার রাজস্ব দুই লক্ষ টাকা। আল্লার দয়া হলে যখন বিজয়ী সৈন্য দাক্ষিণাত্যে দুর্গগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং আমার শ্রেষ্ঠ পুত্র খুররামের মন অধিকারের আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে সে তখন দাক্ষিণাত্যের দূতদের সঙ্গে এমন উপঢৌকন আনবে যা একালের কোনও রাজাই সেরকম পায়নি।

অপরাহ্ণে বেগমদের সঙ্গে নিয়ে সাততলা মিনার দেখতে যাই। সন্ধ্যায় প্রাসাদে ফিরে আসি। এই বাড়ী মালবের পূর্বতন শাসক সুলতান মহম্মদ খালজি নির্মাণ করেছিলেন। সাততলা অট্টালিকার প্রতি তলায় চারটি কক্ষ, প্রতি কক্ষে চারটি জানালা। মিনারটি উচ্চতা সাড়ে চুয়ান্ন হাত এবং ব্যাস পঞ্চাশ গজ। মাটি থেকে সাততলা পর্যন্ত ১৭১টি সিঁড়ি। উঠতে নামতে চোদ্দশ টাকা ছড়াই।

৩১শে তারিখ সৈয়দ আবদুল্লাকে 'সইফ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মান-সূচক পোশাক, একটি ঘোড়া, একটি হাতি ও একটি রত্নখচিত ছোরা উপহার দিয়ে আমার ভাগ্যবান পুত্রের অধীনে কাজ করার জন্য বিদায় দিই। তাঁর সঙ্গে আমার পুত্রের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যেরও বেশী দামের একটি চুনী

পাঠাই। এর মূল্যের কথা ধরি না কিন্তু আমার হাতে অনেকদিন বেঁধে রেখেছিলাম জন্য এটি সৌভাগ্যপ্রদ হবে মনে করেই পাঠাই।

৫ই আমুরদাদ বৃহস্পতিবার শেষ বেলায় বেগমদের সঙ্গে নীলকুণ্ড (বর্তমানে এখানকার লোকে বলে নীলকণ্ঠ) দেখতে যাই। মাণ্ডুগড়ে এটি একটি সুন্দর জায়গা। আমার মহামান্য পিতার সময়ের একজন অতি বিশিষ্ট আমির সা' বূদাগ খাঁ—যখন তিনি এই প্রদেশ জায়গীর হিসাবে ভোগ করছিলেন সেই সময়—এই স্থানে অতি মনোহর ও উপভোগ্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন।

এবারের মত বর্ষাকালে এমন প্রচুর বর্ষণ বয়স্ক লোকেরা আর কখনও দেখেনি। ৪০ দিন ধরে কেবল মেঘ আর বৃষ্টি। সূর্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। এমন ঝড়ো হাওয়া বইছে যে নতুন ও পুরনো অনেক বাড়ী পড়ে গেছে। প্রথম রাত্রে এমন বৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুতের ঝলক হয় যে এরকম আর কখনও হয়েছে বলে শোনা যায়নি। প্রায় কুড়িজন স্ত্রী-পুরুষ মারা যায়। এমন কি পাথরের কয়েকটি বাড়ীর ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। কোনও শব্দই এর মত ভীতি-জনক নয়। এই মাসের মধ্য পর্যন্ত বাতাস ও বৃষ্টি বাড়তেই থাকে। এর পর থেকে জোর কমে আসে। এমন সবুজ তৃণক্ষেত্র আর আপনি গজানো সুগন্ধি ফুলের চারার কথা আর কি লিখবো। তারা উপত্যকায়, সমতল ক্ষেত্র, পাহাড়, মরুভূমি সব ছেয়ে ফেললো। জানি না জনঅধ্যুষিত পৃথিবীতে—স্থানীয় সৌন্দর্যে, আবহাওয়ার মধুরতায় বিশেষতঃ বর্ষার ঋতুতে—মাণ্ডুর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন দেশ আর আছে কিনা। যত কিছু লিখি না কেন এই জায়গার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি এই দেশে এমন দুটি জিনিস দেখেছি যা আর কোনও স্থানে দেখিনি। প্রথম বুনো কলা গাছ যা গড়ের অধিকাংশ অকর্ষিত জমিতে প্রচুর জন্মায়। অপরটি ল্যাজ ঝোলার বাসা যাকে পারস্য দেশে বলে—দুম-সিচা। এ পর্যন্ত কোনও শিকারীই এর বাসা দেখতে পারেনি। ভাগ্যক্রমে যে বাড়িতে আমি এখানে ছিলাম সেখানে একটা বাসা দেখা গেল। সেই বাসা থেকে দুটো বাচ্চা নামানো হলো।

১৯শে তারিখ বৃহস্পতিবার দিনের তিন প্রহর অতীত হলে বেগমদের সঙ্গে নিয়ে সক্কর হ্রদের ধারে মালবের পূর্বতন শাসকদের প্রাসাদ ও দরবারকক্ষ দেখতে বের হই। এই মনোরম স্থানে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করি। চারদিকের মুক্ত ক্ষেত্রের সবুজ শোভায় মুগ্ধ হই। সান্ধ্যনমাজ ও জপমালায় গণনা শেষ করে আমাদের নির্দিষ্ট আবাসে ফিরে যাই।

২৬শে তারিখ (১৪ই সাবান) বৃহস্পতিবারে সব-ই-বরাত উৎসবের দিন নূরজাহান বেগমের প্রাসাদের একটি কক্ষে সম্মেলন হয়। নূরজাহান বেগমের প্রাসাদটি বড় বড় পুষ্করিণীর মাঝখানে অবস্থিত। নূরজাহান বেগম আয়োজিত এই ভোজ-সম্মেলনে আমির ও সভাসদ্‌দের আহ্বান করি। প্রত্যেকের ইচ্ছামত নানা রকমের সুরার পেয়ালা পরিবেশন করার নির্দেশ দিই। অনেকেই সুরার পেয়ালা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আদেশ দিই যে এক পেয়ালা পান করার পর প্রত্যেকে মনসব ও পদ অনুযায়ী আসন গ্রহণ করবে। নানা রকম ভাজা মাংস ও ফল প্রত্যেককে দেওয়া হয়। উৎসবটা খুবই জমজমাট হয়েছিল। সন্ধ্যার প্রারম্ভে পুষ্করিণী ও প্রাসাদের চারধারে আলোকসজ্জা করা হয়। এরকম আলোকসজ্জার আয়োজন সম্ভবতঃ পূর্বে আর কোনও জায়গায় হয়নি। লণ্ঠন ও প্রদীপের আলোর প্রতিবিম্ব জলের ওপর পড়ে। দেখে মনে হচ্ছিল যে পুকুরের জলের ওপরটা যেন আগুনের মাঠ। চমৎকার উৎসব হলো। সুরাপায়ীরা মাত্রা ছাড়িয়ে সুরা পান করলো।

রাতের তিন-চার ঘড়ি অতীত হলে আমি পুরুষদের বিদায় দিয়ে বেগমদের আহ্বান জানাই। রাতের শেষ প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এই মনোরম স্থানে আনন্দে কাটাই। বৃহস্পতিবারেই কয়েকটি বিশেষ ব্যাপার ঘটেছিল। প্রথম এটি আমার সিংহাসন আরোহণের দিন। দ্বিতীয় এই দিনটিতেই সব-ই-বরাত। তৃতীয় এটি রাখি বন্ধনের দিন যার বিবরণ আগেই দিয়েছি। হিন্দুদের এটি বিশেষ দিন। সৌভাগ্যের তিনটি ব্যাপারই এই দিনেই পড়ায় এর নাম দিই 'মুবারক সম্বা'।

মুবারক সম্বা যেমন আমার ভাগ্যে সৌভাগ্যজনক হয়েছিল বুধবার ঠিক তার বিপরীত হয়। এই জন্য আমি এই দিনের নাম রাখি—'কাম সম্বা'—যাতে এমন দিন যেন জগৎ থেকে মুছে যায়।

২রা শাহরিয়ার মুবারক সম্বার এক প্রহর তিন ঘড়ি অতীত হলে আমি ঘোড়ায় চড়ে নীলকুণ্ড ও তার কাছাকাছি জায়গা দেখতে যাই। তারপর একটা উঁচু স্তূপের ওপর উঠে সমতল ভূমির সবুজ শোভা দেখি। সেখানে চাঁপা এবং আরও অনেক রকম সুগন্ধি ফুলের গাছে এত অজস্র ফুল ফুটেছে যে যেদিকেই চোখ ফেরাই না কেন মনে হয় যেন জগৎটা সবুজ রং আর ফুলে ভরা। রাতের এক প্রহর হলে প্রাসাদে ফিরে আসি।

কথাপ্রসঙ্গে পত্রবাহী পায়রার কথা উঠলে আমাকে জানানো হয় যে

বাগদাদের খলিফাদের আমলে পায়রাদের পত্রবাহকের কাজে শিক্ষা দিয়ে নেওয়া হতো। পায়রাগুলো বুনো পায়রার দেড়গুণ। পায়রা-পালকদের তাদের পায়রাকে এই কাজে তালিম দেওয়ার জন্য আদেশ দিই। তারা কতকগুলি পায়রাকে এমন শিক্ষা দেয় যে তাদের মাণ্ডু থেকে উড়িয়ে দিলে তারা দিনের আড়াই প্রহরে এমন কি দেড় প্রহরের মধ্যেই বুরহানপুর পৌঁছে যায়। (সোজাসুজি ভাবে বুরহানপুর থেকে মাণ্ডুর দূরত্ব একশ মাইল)।

৩রা তারিখ বাবা খুররামের পত্র আসে। তাতে আফজল খাঁ ও রায়-রায়ানের পৌঁছানোর কথা এবং আদিল খাঁয়ের দূতদের নানা উপযুক্ত উপঢৌকন—রত্ন, রত্নখচিত জিনিস, হাতি ঘোড়া নিয়ে আসার সংবাদ আছে। সে জানিয়েছে যে এমন উপঢৌকন কোনও সময়ে কোনও রাজার সময় আসেনি। সে উক্ত খানের আনুগত্য, কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়ে তাঁকে 'ফারজান্দের' (পুত্রপ্রতিম) সম্মান দিয়ে ও আরও নানা-বিধ অনুগ্রহ দান করে মহান রাজকীয় ফার্মান জারি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। আমার পুত্রকে সুখী করা আমার পক্ষে অতীব আনন্দদায়ক। তা ছাড়া তার অনুরোধ সুবিবেচিত মনে হওয়ায় আমি মুন্সীদের আদিল খাঁর নামে ফার্মান লেখার আদেশ দিই যাতে আমার প্রীতি ও অনুগ্রহের এমন অভিব্যক্তি থাকবে যে আমার আগের ফার্মানগুলির চেয়ে দশ-বারো গুণ প্রশংসা তাতে লেখা হবে। ফার্মানে তাঁকে 'ফারজান্দ' রূপে সম্বোধন করতে আদেশ দিই। ফার্মানে এই কবিতাটি নিজ হাতে লিখে দিই :—

"শা' খুরামের অনুরোধে
তুমি হলে জগতে বিখ্যাত।
'ফারজান্দ' রূপে এখন থেকে
তুমি হবে পরিচিত।"

৪ঠা তারিখ নকল সহ ফার্মানটি পুত্র খুররামের কাছে পাঠাই যাতে সে নকলটি রেখে আসলটি পাঠিয়ে দিতে পারে।

৯ই মুবারক সম্বা আমি বেগমদের নিয়ে আসফ খাঁর বাড়ী যাই। তাঁর বাড়ীটি উপত্যকার ওপর। অত্যন্ত সুন্দর, ঝকঝকে। চারদিকে উপত্যকা। কোনও কোনও জায়গায় জল ঝরছে, কোনও কোনও জায়গায় আম ও অন্যান্য বৃক্ষ—সবুজ, ছায়াবহুল, নয়ন-আনন্দদায়ক। দুই-তিনশ কেওড়ার ঝোপ। মোটের ওপর দিনটা খুব ভাল কেটেছে। সুরাপান উৎসব হলো। সুরার

পেয়ালা আমির ও অন্তরঙ্গদের দেওয়া হলো। আসফ খাঁর উপঢৌকন আমার সম্মুখে রাখা হলো। অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস এর মধ্যে ছিল। আমি আমার মনোমত জিনিসগুলি গ্রহণ করে অবশিষ্টগুলি তাঁকেই দিলাম।

১১ই তারিখ পুত্র খুররামের কাছ থেকে একটি চিঠি আসে। সে জানিয়েছে রাজা বাসোর পুত্র রাজা সুরযমল—যাঁর রাজ্য কাংগ্রা দুর্গের কাছে—অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি এক বছরের মধ্যে ঐ দুর্গ বিজয়ী সাম্রাজ্যের দখলে এনে দেবেন। সে রাজার প্রতিশ্রুতি-পত্রও তার চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছে। আমি আদেশ পাঠাই যে রাজার অভিলাষ ও প্রার্থনা জেনে নিয়ে এবং সে বিষয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করার আশ্বাস দিয়ে যেন আমার কাছে তাঁকে পাঠানো হয়—যাতে তিনি অবিলম্বে তাঁর কর্তব্যকাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

১১ই সোমবার (১লা রমজান, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৬১৭) দিনের চার ঘড়ি সাত পল অতীত হলে আমার পুত্রের অন্যান্য সন্তানের জননী আসফ খাঁর কন্যার গর্ভে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুর নাম রাখি রোশেনারা বেগম।

মাণ্ডু এলাকার মধ্যে জৈতপুরের জমিদার (সম্ভবতঃ কাঠিওয়ার) ধৃষ্টতা বশে আমার ফটক চুম্বন করতে আসেনি। তার এই দুষ্টবুদ্ধির শাস্তি দিতে ফিদাই খাঁকে কয়েকজন মনসবদারকে ও চার-পাঁচশ সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে তার দেশ লুণ্ঠন করতে আদেশ দিই।

২৫শে তারিখ ফিদাই খাঁকে একটি সম্মানসূচক পোশাক দান করে অন্যান্য মনসবদারদের সঙ্গে নিয়ে জৈতপুরের জমিদারকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যাত্রা করতে অনুমতি দিই।

ফিদাই খাঁর নিবেদনে জানা যায় যে বিজয়ী সৈন্য জৈতপুরে পৌছালে জমিদার পালিয়ে যাওয়াই ভাল মনে করে। ফিদাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তার সামর্থ্যে কুলায়নি। তার দেশ লুণ্ঠন করা হয়। এখন সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত এবং জগতের আশ্রয় দরবারে এসে তার আনুগত্য ও বশ্যতা জানাতে অভিলাষী। তাকে খুঁজে বের করে বন্দী অবস্থায় দরবারে আনতে, তার দেশ ধ্বংস করতে, তার স্ত্রী ও আশ্রিতদের—যারা নিকটের অন্যান্য জমিদারিতে পালিয়ে গিয়েছে—বন্দী করতে রুহউল্লার সঙ্গে একদল সৈন্য পাঠাই।

৮ই মিহর খাজা নিজাম 'মোচা' বন্দর থেকে ১৪টি বেদানা নিয়ে আসে। এইগুলি সুরাটে আসতে চোদ্দ দিন ও সেখান থেকে মাণ্ডুতে আসতে আরও

আট দিন লেগেছে। থাটার বেদানার মতই এর আকার। তবে থাটার বেদানা বীচিশূন্য, এগুলিতে অল্প বীচি থাকলেও স্বাদে ও রসে থাটার চেয়ে ভাল।

৯ই তারিখ সংবাদ আসে যে রুহুউল্লা গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় জানতে পারে যে জৈতপুরি জমিদারের স্ত্রী ও আত্মীয়রা কোনও একটি গ্রামে আছে। সে নিজে গ্রামের বাইরে থেকে তার লোকজনকে ঐ গ্রামের ভিতরে গিয়ে অনুসন্ধান করে তাদের নিয়ে আনতে পাঠায়। তারা গ্রামে অনুসন্ধান চালানোর সময় জমিদারের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রুহুউল্লা যেখানে ছিল সেইখানে আসে। তার লোকজনরা তখন চারদিকে ছড়িয়ে আছে আর রুহুউল্লা তার ভৃত্যদের দিয়ে আসবাবপত্র বের করে গালিচার ওপর বসেছে। এমন সময় জমিদারের সেই বিশ্বাসী চাকর তার পেছন দিক থেকে এসে তাকে বর্শাবিদ্ধ করে। আঘাত মর্মন্তুদ হয়। বর্শার ফলক তার হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করে। বর্শা টেনে বার করার সঙ্গে সঙ্গেই রুহুউল্লার মৃত্যু ঘটে। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা সেই শয়তানকে নরকে পাঠায়। যে সব লোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা অস্ত্র নিয়ে সেই গ্রাম আক্রমণ করে। গ্রামের অভিশপ্ত লোকগুলি—যারা বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছিল এক ঘণ্টার মধ্যেই হত হয়। তারা এই গ্রামবাসীদের স্ত্রী ও কন্যাদের আটক করে। তারপর আগুন জালিয়ে এমন অবস্থা করে যে সমস্ত গ্রামে ছাই ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তারা রুহুউল্লার মৃতদেহ তুলে এনে ফিদাই খাঁর কাছে আসে। রুহুউল্লার বীরত্ব ও কর্মানুরাগ সম্বন্ধে কোনও বিতর্ক নাই। শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে তার অসতকর্তাই তার ভাগ্যবিপর্যয় এনেছে। ঐ দিকের কোনও জনবসতির চিহ্ন নাই। ঐ জায়গার জমিদার পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। তারপর সে ফিদাই খাঁর কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তার অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করে। তাকে আশ্রয় দিয়ে দরবারে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

আমার মহাসৌভাগ্যবান পুত্র শা' খুরাম কর্তৃক প্রেরিত লোকজন উপঢৌকন সহ আদিল খাঁর দূতদের সঙ্গে নিয়ে বুরহানপুর ফিরে আসে।

দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারের সাফল্যে আমার পুত্রের মন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেছে দেখে আদিল খাঁ বেরার, খান্দেশ ও আমেদনগরের সুবেদারি, প্রধান সেনাপতির পদ এবং খান্‌খানান পদবির জন্য প্রার্থনা জানান এবং তাঁর পুত্র

শা' নওয়াজ খাঁর সঙ্গে বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে বিজিত দেশগুলিতে দখল নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখানকার প্রত্যেকটি জায়গায় এক-একজন বিশ্বস্ত লোককে জায়গীর দিয়ে ঐ প্রদেশ শাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়।

বাবা খুররাম তার সৈন্যবাহিনীর ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, সাত হাজার সশস্ত্র পদাতিক সেখানে রেখে অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার গোলন্দাজ. সৈন্য সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসার জন্য যাত্রা করে। মিহর মাসের ২০শে তারিখ, বৃহস্পতিবার (মুবারক সন্ধ্যা)আমার রাজ্যাভিষেকের পর দ্বাদশ বর্ষে (১৪ই সাওয়াল, হিজরা ১০২৬ সন, ১১ই অক্টোবর, ১৬১৭) দিনের তিন ঘড়ি এক প্রহর অতীত হওয়ার পর সে মনের আনন্দে শুভ মুহূর্তে মাণ্ডুগড়ে প্রবেশ করে ও আমার সাক্ষাৎলাভের সম্মানলাভ করে। পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদকাল ছিল ১১ মাস ১১ দিন। সে ভূমি চুম্বন করে আমাকে অভিবাদন জানানোর পর আমি তাকে ঝরোকার মধ্যে আসার জন্য আদেশ করি। অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে ও আনন্দের আতিশয্যে আমার আসন থেকে উঠে তাকে স্নেহালিঙ্গন করি। সে যতটুকু নম্র হয়ে শিষ্টতা প্রদর্শন করে আমিও সেই অনুপাতে তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে নিজের কাছে বসাই। সে এক হাজার আসরফি ও এক হাজার টাকা নজরানা এবং অনুরূপ অর্থ খয়রাতির জন্য দেয়। আদিল খাঁ প্রদত্ত সমস্ত উপঢৌকন দাখিল করার সময় না থাকায় সব চেয়ে সেরা 'সরনাক' (সর্পশীর্ষ ?) নামে হাতি ও মূল্যবান রত্নের পেটিকা আমার সম্মুখে আনে।

এর পর, যে সব আমির পুত্রের সঙ্গে আমাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন তাঁদের মনসব অনুযায়ী পরপর সাজাতে বক্সিদের আদেশ দিই। আমার দর্শনলাভের প্রথম সম্মান পান খানজাহান। তাঁকে ডেকে এনে আমার পদচুম্বনের প্রথম গৌরব দান করি। নজর হিসাবে তিনি এক হাজার মোহর ও এক হাজার টাকা দেন এবং পেশকোষ হিসাবে রত্ন ও রত্নখচিত দ্রব্যপূর্ণ একটি পেটিকা দেন। তাঁর উপঢৌকনের মধ্যে ৪৫ হাজার টাকা মূল্যের জিনিস গ্রহণ করি।

এর পর আবদুল্লা খাঁ আমার পদ চুম্বনের সম্মান লাভ করে ১০০টি মোহর নজরানা দেন। তারপরে সম্মান লাভ করেন মহবত খাঁ। তিনি নজরানা দেন একশ মোহর এবং এক হাজার টাকা, তার সঙ্গে এক গাঁটরি মণি-মাণিক্য

ও রত্নখচিত নানা দ্রব্য যার মূল্য এক লাখ চব্বিশ হাজার টাকা। এর মধ্যে একটা চুনীর ওজন হলো এগার মিশকাল। একজন ফিরিঙ্গি বণিক এইটি গত বৎসর আজমীঢ়ে বিক্রয় করার জন্য নিয়ে আসে। দাম চায় তুই লক্ষ টাকা। জহুরিরা এর মূল্য ঠিক করে আশি হাজার টাকা। এই জন্য চুনীটি কেনা হয় না, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেও এটি নিয়ে চলে যায়। সে বুরহানপুর এলে মহবত খাঁ এটিকে এক লাখ টাকায় কিনে নেয়।

এর পর আসেন রাজা ভাও সিং। তিনি এক হাজার টাকা নজর এবং পেশকোষ হিসাবে কিছু রত্ন ও রত্নখচিত জিনিস দেন। এইভাবে খানখানানের পুত্র দরাব খান, আবদুল্লা খাঁয়ের ভাই সর্দার খাঁ, সাজাত খাঁ আরবি, দয়ানত খাঁ, সাবাজ খাঁ, মহম্মদ খাঁ বক্সি ও নিজাম-উল-মুলকের প্রধান আমিরদের মধ্যে উদারাম নামে আমির যিনি খুরামের আশ্বাসে অনুগত শ্রেণীভুক্ত হয়ে এসেছেন—সকলে তাঁদের মনসব অনুযায়ী পর পর আমার দর্শন লাভ করেন।

এরপর আদিল খাঁর ভকিলরা আমার সামনে এসে ভূমি-চুম্বনের সম্মান লাভ করেন এবং আমাকে আদিল খাঁর চিঠি অর্পণ করেন। রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য পূর্বেই আমার মহাভাগ্যবান পুত্রকে কুড়ি হাজার পদাতিক এবং দশ হাজার অশ্বারোহীর মনসব দেওয়া হয়েছিল। যখন সে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য যাত্রা করে তখনই তাকে শা' উপাধি দিই। তার বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শনের পুরস্কার স্বরূপ এখন তাকে ত্রিশ হাজার পদাতিক ও কুড়ি হাজার অশ্বারোহীর মনসব প্রদান করে তাকে 'শাজাহান' পদবীতে ভূষিত করি। আদেশ দেওয়া হয় যে এখন থেকে স্বর্গসদৃশ দরবারে আমার সিংহাসনের পাশেই আমার পুত্রের সিংহাসন থাকবে। এটি আমার পুত্রের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। এরকম রীতি পূর্বে প্রচলিত ছিল না। একটি বিশেষ সম্মান-সূচক পোশাক—সোনার কাজ করা চিরকাব যার হাতার প্রান্তভাগ এবং নীচের অংশে মুক্তা বসানো, মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা; একটি রত্নখচিত পরদল (কটিবন্ধ) সহ রত্নখচিত তরবারি এবং একটি রত্নখচিত ছোরা তাকে দেওয়া হয়। তার সম্মানে আমি ঝরোকা থেকে নেমে এসে তার মাথার ওপর একটি ছোট ট্রে বোঝাই স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দিই।

সারনক হাতিটিকে কাছে এনে দেখলাম। হাতিটির সৌন্দর্য ও গুণের যে প্রশংসা শুনেছিলাম—তা সম্পূর্ণ সত্য। আয়তনে, গঠনে এবং সৌন্দর্যের সমস্ত

পরীক্ষাতেই যে উত্তীর্ণ হলো। এমন হাতি অল্পই দেখা যায়। গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় হাতিটি নিজে চালিয়ে আমার নিজ প্রাসাদে নিয়ে আসি। হাতির মাথায় কিছু স্বর্ণমুদ্রা ছিটিয়ে দিয়ে আমার প্রাসাদের ভিতর বেঁধে রাখতে আদেশ দিই। এর নাম রাখি—নুর বখ্‌ত (সৌভাগ্যের আলো)।

২৪শে তারিখ শুক্রবার বগলানার জমিদার রাজা ভরজিব আমার কাছে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যেই সেখানকার রাজা হোন না কেন তাঁকেই ভরজিব বলা হয়। মাইনে করা তাঁর দেড় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আছে। প্রয়োজনের সময় তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আনতে পারেন। গুজরাট, খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্যের মাঝে বগলানা প্রদেশ অবস্থিত। এখানে দুটি সুদৃঢ় দুর্গ আছে—সালের ও মালের। মালের জনবহুল দেশের মধ্যে হওয়ায় তিনি সেখানেই বাস করেন। বগলানায় অনেক সুন্দর প্রস্রবণ ও স্রোতস্বতী আছে। এই দেশের আম খুব মিষ্টি ও আকারে বড়। কাঁচা থেকে পাকা পর্যন্ত এদিকের আম নয় মাস ধরে তোলা হয়। এখানে আঙ্গুরও অনেক আছে কিন্তু খুব ভাল জাতের নয়। উক্ত রাজা গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও খান্দেশের শাসকদের সঙ্গে ব্যবহারে সাবধানতা ও প্রাজ্ঞতা অবলম্বন করে চলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে কখনও দেখা করতে যান না। যদি তাঁর রাজ্য কেড়ে নেওয়ার জন্য কেউ হাত বাড়ান, তাহলে তিনি অন্যের সাহায্য পাবেন বলে নিশ্চিন্ত মনে থাকেন। শাজাহান বুরহানপুর যাওয়ার সময় তিনি উপঢৌকন স্বরূপ সাতটি হাতি দেন। আমার পুত্রের সঙ্গে তিনি দরবারে আসেন। বন্ধুত্বের ও কর্মের মর্যাদানুযায়ী তিনি রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রত্নখচিত তরবারি, একটি হাতি, একটি ঘোড়া ও একটি সম্মানসূচক পোশাক উপহার স্বরূপ পান। কয়েকদিন পর আমি তাঁকে ইয়াকুত, হীরা ও চুনীর তিনটি অঙ্গুরী দিই।

আমার কাছে প্রায়ই সংবাদ আসতে থাকে যে খান দুরাণ বৃদ্ধ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ায় কাজের অনুপযুক্ত হয়েছেন। কাবুল ও বংগাশ যুবা বিদ্রোহের জায়গা। সেখানকার আফগানদের বশে রাখতে হলে অশ্বারোহণে পটুতা ও গতির ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন। শাসনকার্যে সাবধানতা অবলম্বনই প্রধান নীতি। সুতরাং কাবুল ও বংগাশের সুবেদারপদে মহবত খাঁকে নিযুক্ত করে তাঁকে সম্মানসূচক পোশাক দান করি এবং খান দুরাণকে থাটা প্রদেশের সুবেদার পদে উন্নীত করি।

আমার জন্য সোনা কলা আনা হয়। এমন কলা এর আগে খাইনি। কলা এক আঙ্গুলের সমান। খেতে খুব মিষ্টি ও সুগন্ধি। এই কলার সাথে অন্য জাতের কলার কোনও মিল নাই। কিন্তু এ কলা হজম করা কঠিন। দুটো কলা খেয়েই আমার পেট ভারি মনে হলো। কিন্তু সকলেই বলে তারা সাত-আটটা খেতে পারে। কলা মাত্রই খাওয়ার অযোগ্য। কিন্তু সব জাতের কলার মধ্যে এই জাতের কলাই খাওয়ার উপযুক্ত। এ বছর মিহর মাসের ২৩শে পর্যন্ত মুকারব খাঁ গুজরাটি আম ডাকচৌকিতে পাঠিয়েছে।

১০ই আবান, মুবারক সম্বা পুত্র সাজাহান তার নিজের উপঢৌকন—মণিরত্ন, রত্নখচিত জিনিস, সূক্ষ্মবস্ত্র এবং আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য আমার সম্মুখে নিয়ে আসে। ঝরোকার সন্নিহিত উঠানে এই জিনিসগুলি সোনা ও রুপার সরঞ্জামে সজ্জিত হাতি ও ঘোড়ার সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি ঝরোকো থেকে নেমে এসে সমস্ত জিনিসগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করি। এইসব জিনিসগুলির মধ্যে ছিল একটি সুন্দর চুনী—যা গোয়া বন্দর থেকে দুই লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছিল। এর ওজন ১৯॥০ টাঁকা অর্থাৎ ১৭ মিশকাল ও ৫॥০ সুরখ্। ১২ টাঁকের বেশী ওজনের কোন চুনী আমার দরবারে নাই। জহুরিরা ঐ মূল্যই ঠিক বলে ধার্য করেছিল। আদিল খাঁর উপঢৌকনের মধ্যে আর একটি ছিল নীলকান্ত মণি, ওজন ছয় টাঁক, সাত সারখ্—দাম এক লক্ষ টাকা। আমি এমন আকারের ও এমন সুন্দর রংয়ের এই জাতীয় মণি আগে দেখিনি। আর একটিও আদিল খাঁর উপঢৌকনের মধ্যে—চম্‌কোরা হীরা ওজন এক টাঁক ছয় সারখ্—যার মূল্য জহুরিরা স্থির করে চল্লিশ হাজার টাকা।—চমকোরা নামটি এসেছে দাক্ষিণাত্যের সাগ্-ই-চমকোরা নামের এক জাতের গাছ থেকে। যখন মুর্তজা নিজাম-উল-মুলক বেরার জয় করেন সেই সময় তিনি বেগমদের নিয়ে একটি বাগানে যান। সেই সময় একজন বেগম চমকোরা গাছের ঝোপের মধ্যে এই হীরকটি পেয়ে নিজাম-উল-মুলকের কাছে নিয়ে যান। তখন থেকে এই হীরকটির নাম হয় চমকোরা হীরক। এটি বর্তমানে ইব্রাহিমের হাতে আসে যখন তিনি আমেদনগর রাজ্য পান। আদিল খাঁর উপঢৌকনের মধ্যে আর একটি—পান্না। এটি নব আবিষ্কৃত খনি থেকে পাওয়া গেলেও এর রং এমন সুন্দর যে এরকম আমি পূর্বে দেখিনি। এ ছাড়াও ছিল দুটি মুক্তা যার একটির ওজন ৬৪ সারখ্ অর্থাৎ দুই মিশকাল এগারো সারখ্—মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা। আর একটির ওজন ১৬

সারথ দেখতে গোলাকার ও অতি সূক্ষ্ম। এর মূল্য বারো হাজার টাকা। আর একটি হীরক—কুতুব-উল্-মুলকের উপঢৌকনের মধ্যে। এর ওজন এক টাঁক। মূল্য ত্রিশ হাজার টাকা। এ ছাড়া ছিল ১৫০টি হাতি—তার মধ্যে তিনটির হাওদা, শিকল ইত্যাদি সোনার এবং নয়টি রূপার। আমার ব্যক্তিগত হাতিশালে কুড়িটি রাখা হলেও পাঁচটি ছিল বৃহৎ আকারের এবং খুবই প্রসিদ্ধ। প্রথমটি নূর বখ্‌ত যেটা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন আমার পুত্র দিয়েছিল। মূল্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। দ্বিতীয়টি মহীপতি। সেটা আদিল খাঁর উপঢৌকনের মধ্যে—মূল্য এক লক্ষ টাকা। আমি এর নাম দিই দুর্জন-সাল। আর একটি তাঁরই উপঢৌকনের মধ্যে—নাম বখ্‌ত বুলন্দ, মূল্য এক লক্ষ টাকা। এর নাম রাখি গিরাণবার। আর একটি কুদ্‌স খাঁ এবং পঞ্চমটি ইমাম রিজা। প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ টাকা। এরা কুতুব-উল-মুলকের উপঢৌকন। এ ছাড়াও ছিল ১০০টি আরবি ও ইরাকি ঘোড়া। প্রত্যেকটি খুবই ভাল জাতের। এদের মধ্যে তিনটির রত্নখচিত জিন। আমার পুত্রের নিজস্ব এবং দাক্ষিণাত্যের শাসকদের উপঢৌকনের কথা বিস্তারিত ভাবে লিখতে হলে একটি বিশাল ব্যাপার হবে। পুত্রের উপঢৌকন স্বরূপ যা গ্রহণ করি তারই মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকা। এরই সঙ্গে তার সৎমা নূরজাহান বেগমকে দুই লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য মা ও বেগমদের ষাট হাজার টাকা মূল্যের জিনিস উপহার দেয়। মোটের উপর আমার পুত্রের উপঢৌকনের মূল্য দাঁড়ায় বাইশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা কিংবা ইরাজের মুদ্রামানে পঁচাত্তর হাজার তুমান কিংবা সাতষট্টি লক্ষ আশি হাজার বর্তমানে তুরাণখানি মুদ্রা। এই বংশে এরকম উপঢৌকনের ঘটনা আর পূর্বে কখনও ঘটেনি। আমি পুত্রকে বহুত অনুগ্রহ দেখাই। বাস্তবিকপক্ষে সে দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য পুত্র। সর্বশক্তিমান খোদা তাকে দীর্ঘজীবন দান করে সমৃদ্ধিতে রাখুন এই আমার প্রার্থনা।

আমি জীবনে কোনও দিন হাতি শিকার করিনি। আমার গুজরাট প্রদেশ দেখার বিশেষ আগ্রহ। সেখানে লমনাম্বু সমুদ্র দেখবো। শিকারীরা প্রায়ই সেখানে বন্যহস্তী দেখেছে ও শিকারের জায়গা নির্বাচিত করে এসেছে। মনে হলো যে আমেদনগরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমুদ্র দেখবো। তারপর ফেরার পথে যখন গরম পড়বে তখন হাতি শিকার শেষ করে আগ্রায় ফিরে যাব। এই মতলবে আমি হজরত মরিয়ম উজুমান (মা), অন্যান্য বেগমদের ও হারেমের মহিলাদের তাঁদের মালপত্র ও লোকজন সঙ্গে দিয়ে আগ্রায়

পাঠালাম। আর নেহাত প্রয়োজনীয় মালপত্র ও লোকজনসহ শিকারের উদ্দেশ্যে সুবা গুজরাট যাত্রা করি।

আবান মাসে শুক্রবারে (সম্ভবতঃ ১১ই তারিখ) আমি মনের আনন্দে শুভ সময়ে মাণ্ডু থেকে যাত্রা করে নালাদার পুষ্করিণীর তীরে শিবির ফেলি।

আদিল খাঁর ভকিলদের দাক্ষিণাত্যের ফ্যাসান অনুযায়ী রত্নখচিত শির-প্যাচ উপহার দিই—যার একটির মূল্য পাঁচ হাজার ও আর একটির চার হাজার টাকা। আফজল খাঁ ও রায়রায়ান আমার পুত্রের ভকিল হিসাবে কর্তব্যকর্ম ভাল ভাবে সম্পন্ন করায় তাঁদের দুইজনেরই মনসব বাড়িয়ে দিই। রায়রায়ানকে বিক্রমজিৎ উপাধিতে সম্মানিত করি। হিন্দুদের মধ্যে এই উপাধিটি সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে তিনি মর্যাদালাভের উপযুক্ত কর্মচারী। ১২ই শনিবার আমি শিকারে গিয়ে দুইটি নীলগাই মারি। আমার বিশ্রামশিবিরের অনেক দূরে শিকারক্ষেত্র হওয়ায় সোমবার সাড়ে চার ক্রোশ পথ চলে কৈদ হাসান গ্রামে তাঁবু ফেলি। ১৫ই মঙ্গলবার তিনটি নীলগাই শিকার করি। বড়টির ওজন হলো ১২ মণ।

১৬ই বুধবার ৪টি নীলগাই শিকার করি। মুবারক সম্বায় শিবিরের কাছেই একটি পাহাড়ী উপত্যকা দেখতে পাই। সেখানে একটি প্রস্রবণ আছে। এই ঋতুতে ঝর্ণার জল খুবই কম। দুই-তিনদিন আগে থেকে বাঁধ দিয়ে রাখায় এবং আমি এখানে পৌঁছালে বাঁধ ভেঙ্গে দিলে বেশ ভাল ভাবেই জল গড়িয়ে আসে। ঝরণার উচ্চতা ২০ গজের মত। পাহাড়ের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে নীচে পড়ছে। পথ চলতে এই ঝরণার জল আশীর্বাদের মত।

১৮ই তারিখ শুক্রবার একটি বড় নীলগাই ও ১৯শে দুটি নীলগাই শিকার করি। আমার শিকারীরা নিবেদন করে হাসিলপুর পরগণায় অনেক শিকার আছে। এই বিশ্রামস্থলে বড় শিবির রেখে ২০শে রবিবার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী নিয়ে তিন ক্রোশ দূরে হাসিলপুর যাই। এই দিন কাবুল থেকে বীচিশূন্য হুসেনি আঙ্গুর আসে। আঙ্গুরগুলি খুবই টাটকা। কাবুল থেকে দাক্ষিণাত্য তিন মাসের পথ। তা সত্ত্বেও এমন টাটকা আঙ্গুর এসে পৌঁছাতে আল্লার দরবারের দীন সেবকের জিহ্বা কিভাবে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে!

২১শে সোমবার তিনটি ছোট নীলগাই, ২২শে মঙ্গলবার একটি মর্দা ও তিনটি মাদি নীলগাই ও ২৩শে কাম সম্বা (বুধবার) একটি মাদি নীলগাই শিকার করি। ২৪শে মুবারক সম্বা হাসিলপুরের পুষ্করিণীর তীরে সুরাপান উৎসব হয়।

সাজাহান, কয়েকজন আমির ও ব্যক্তিগত ভৃত্যদের পেয়ালা পরিবেশন করা হয়। এই দিন বন্দুক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গুলি ছুঁড়ি। প্রাসাদের কাছে একটি খিরট গাছ আছে। সেই গাছের একটি উঁচু ডালে একটি কুরিশা (সবুজ পায়রা) পাখী বসে ছিল। ডালপালার মধ্যে পাখীটার বুক দেখতে পাই। পাখীটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। সেটা বুকের মাঝখানে লাগে। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে গাছের ডালটা ২২ গজ উঁচু।

২৬শে শনিবার দুই ক্রোশ পথ চলে কমালপুর গ্রামে আসি। এই দিন একটি নীলগাই শিকার করি। পুত্র সাজাহানের একজন প্রধান ভৃত্য রুস্তম খাঁকে বুরহানপুর থেকে একদল রাজকীয় সৈন্যসহ গন্দওয়ানার জমিদারের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল। সে ১১০টি হাতি এবং এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা কর আদায় করে এই দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ২৭শে রবিবার শিকারী বাজ দিয়ে শিকার করি। সোমবার একটি বড় নীলগাই ও বুক্রা (?) শিকার করি। নীলগাইটি ওজনে হলো সাড়ে বারো মণ। ২৯শে মঙ্গলবার একটি নীল-গাই মারি।

১লা আজর, কাম সম্বা (বুধবার) শিকারে যাই। একটি নীলগাই মারি। এই দিন আমার কাছে কাশ্মীরের রিপোর্ট পেশ করা হয়। একটি সংবাদ আসে একজন রেশম ব্যবসায়ীর দুইটি মেয়ে দাঁত নিয়ে জন্মেছে। তাদের পিঠ কোমর পর্যন্ত জোড়া, কিন্তু মাথা হাত-পা পৃথক। তারা জন্মাবার পর অল্প সময় বেঁচে ছিল। ২রা মুবারক সম্বা পুকুরের ধারে যেখানে আমার শিবির পড়েছে—সুরাপানের উৎসব হয়। ৩রা শুক্রবার সওয়া চার ক্রোশ পথ চলে রাজকীয় পতাকা দিখতান পরগণায় এসে থামে। শনিবার সাড়ে চার ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে ধার শহরে এসে বিশ্রাম নিই।

ধার একটি পুরাতন নগর। হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ নরপতি রাজা ভোজ এখানে বাস করতেন। তাঁর সময় থেকে এক হাজার বছর চলে গিয়েছে। মালবের সুলতানদের সময় এইস্থানে তাঁদের রাজধানী ছিল। সুলতান মহম্মদ তুগলুক যখন দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন সেই সময় একটি পাহাড়ের ধারে কাটা পাথর দিয়ে দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গটি বাইরে থেকে দেখতে খুবই জমকালো ও সুন্দর কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা। আমেদ সা ঘোরি—যিনি দিলওয়ার খাঁ নামে পরিচিত এবং যিনি দিল্লীর সম্রাট সুলতান ফিরোজের পুত্র সুলতান মহম্মদের সময় মালব প্রদেশের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব

লাভ করেছিলেন—দুর্গের বাইরে লোকালয়ে জামি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের ফটকের বিপরীত দিকে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ স্থাপন করেন। গুজরাটের স্থলতান বাহাদুর মালব প্রদেশ দখল করার পর স্তম্ভটি গুজরাটে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন। কারিগররা স্তম্ভটা নামানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন না করায় এটা ভেঙ্গে দুই খণ্ড হয়ে যায়—একটা সাড়ে সাত গজ, আর একটি সাড়ে চার গজ। স্তম্ভটির বেষ্টনী সওয়া গজ। স্তম্ভটি এখানে অকেজো হয়ে পড়ে আছে দেখে বড় খণ্ডটি আগ্রায় নিয়ে গিয়ে মহামান্য সম্রাট আকবরের সমাধিস্থলে স্থাপন করে রাত্রে এর ওপর প্রদীপ জ্বালানোর আদেশ দিই। মসজিদের দুইটি ফটক। একটি ফটকের খিলানের সম্মুখে একটি প্রস্তর-ফলকে গদ্যে কয়েকটি পংক্তি খোদাই করা আছে। তার সংক্ষিপ্ত সার এই ঃ আমেদ সা ঘোরি এই মসজিদ ৮০৭ সনে নির্মাণ করেন।

দিলওয়ার খাঁর দেহাবসানের সময় হিন্দুস্থানের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনও রাজা ছিল না। তখন বিশৃঙ্খলা চলছিল। দিলওয়ার খাঁর পুত্র সৎ এবং সাহসী হুসাং এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আধিপত্যের আসনে উপবেশন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাগ্যক্রমে হুসাংয়ের মন্ত্রী খান জাহানের পুত্র মামুদ খালজির হাতে শাসনভার আসে। তারপর গিয়াসউদ্দিনের পুত্র নাসিরুদ্দিন রাজা হয়। নাসিরুদ্দিন পিতাকে বিষ দিয়ে হত্যা করে এই পাপের সিংহাসনে বসে। তারপর তার পুত্র মামুদ রাজা হয়। গুজরাটের স্থলতান বাহাদুর তার কাছ থেকে মালব প্রদেশ অধিকার করেন।

৭ই মঙ্গলবার ধারের পুষ্করিণীতে একটি ঘড়িয়াল শিকার করি। শুধু উপরের অংশ দেখা গেলেও শরীরের অবশিষ্টাংশ জলের ভেতর ছিল। আমি আন্দাজ করে গুলি ছুঁড়ে হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে এক গুলিতেই শেষ করি। ঘড়িয়াল কুমীর জাতীয় প্রাণী। হিন্দুস্থানের প্রায় প্রত্যেক নদীতেই দেখা যায়। আকারে বেশ বড় হয়। এটা অবশ্য তেমন বড় ছিল না। আট গজ লম্বা, এক গজ চওড়া ঘড়িয়ালও আমি দেখেছি।

রবিবার সাড়ে চার ক্রোশ পথ চলে সদলপুরে আসি। এই গ্রামে একটি নদী আছে। নাসিরউদ্দিন খালজি এই নদীর ওপর একটি সেতু এবং নদীর মধ্যে বাড়ী তৈরি করেছিলেন। জায়গাটি কালিয়াদহের মত এবং দুটোই তাঁর কাজ। অট্টালিকাটি প্রশংসাযোগ্য না হলেও নদীর তলদেশে তৈরী হওয়ায় এবং জলাধার ও নালা থাকায় স্থানটি দ্রষ্টব্য হিসাবে ভালই হয়েছে। রাতে

নালা ও নদীর ধারে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য আদেশ দিই।

৯ই, মুবারক সম্বা (বৃহস্পতিবার) সুরাপান উৎসব হয়। এইদিন পুত্র শাজাহানকে এক রঙের ন' টাঁক পাঁচ সারখ ওজনের এবং এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি চুনী এবং দুইটি মুক্তা উপহার দিই। এই চুনীটি আমার পিতাকে আমার জন্মসময়ে সম্রাট আকবরের মাতা হজরত মরিয়ম মকানি আমার মুখ দেখার সময় উপহার স্বরূপ দেন। এইটি তাঁর শিরপ্যাচে অনেকদিন আঁটা ছিল। তাঁর পরে আমিও আনন্দে এটিকে আমার শিরপ্যাচে রাখি। এর মূল্য ও সৌন্দর্য ছাড়াও, এটা চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের পক্ষে শুভদায়ক চিহ্ন হিসাবে এতদিন চলে আসায় আমি আমার পুত্রকে দান করি।

১০ই শুক্রবার আমি বিশ্রাম করি। ১১ই শনিবার পৌনে চার ক্রোশ পথ চলে হালওয়াত গ্রামে আসি। ১২ই রবিবার পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হয়ে বাদ্‌নোর পরগণায় যাই। এই পরগণা আমার পিতার আমল থেকে কেশোরাম মারুর জায়গীরভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানই তাঁর নিজের দেশের মত হয়েছে। এখানেই তিনি বাড়ী ও বাগান করেছেন। রাস্তার ধারে তিনি একটি ইঁদারা করেছেন যা দেখতে খুবই সুন্দর এবং ভাল ভাবে তৈরী। মনে হলো যদি রাস্তার ধারে কোনও কূপ কোথায়ও করতে হয় তা হলে এই রকমই করতে হবে। অন্ততপক্ষে দুইটি কূপ এই রকম করতেই হবে।

১৩ই তারিখ সোমবার শিকারে গিয়ে দুইটি নীলগাই মারি। যেদিন থেকে নূর বখত হাতিটিকে বিশেষ হাতিশালে রাখা হয় সেইদিনই আদেশ দিই যে তাকে দরবারপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে বেঁধে রাখতে হবে। জন্তুদের মধ্যে হাতি জল খুবই পছন্দ করে। শীতকালেও ঠাণ্ডা বাতাসেও তারা জলে নামতে ভালবাসে। যদি তারা জলে নামার মত জায়গা না পায় তাহলে জলের থলির (মশক) মধ্যে শুঁড় দিয়ে জল নিয়ে সারা গায়ে ছিটোয়। মনে হলো, জলে হাতিরা যতই আমোদ পাক আর জল তাদের মেজাজের সঙ্গে যতই খাপ খাক, শীতকালে ঠাণ্ডা জলে নিশ্চয়ই তাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। সেই জন্য আমি আদেশ দিই জল কিছুটা গরম করে তাদের সহমান দিতে হবে যাতে তারা শুঁড় দিয়ে সেই গরম জল গায়ে দিতে পারে। অন্য সময় ঠাণ্ডা জল গায়ে দিলে তারা দৃশ্যতই কেঁপে কেঁপে উঠতো কিন্তু গরম জলে তাদের বেশ স্ফূর্তি দেখা গেল। এই রীতিটি সম্পূর্ণ আমার নিজের প্রবর্তিত।

১৪ই তারিখ মঙ্গলবার ছয় ক্রোশ এগিয়ে শিলাগড়ে এবং ১৫ই তারিখ মাহি

নদী পেরিয়ে রামগড়ের কাছে এসে থামি। ১৬ই বৃহস্পতিবার ছয় ক্রোশ পথ চলে একটা প্রস্রবণের ধারে বিশ্রামশিবির পড়ে। সেখানে সুরাপান উৎসব হয়। ১৭ই তারিখ আমি ধাওলা গ্রামে। ১৮ই শনিবার কোরবান উৎসব। কোরবানের রীতি পালন করার পর তিন ক্রোশ পথ চলে 'নাগরের' পুষ্করিণীর তীরে শিবিরে আসি। ১৯শে রবিবার পাঁচ ক্রোশ এগিয়ে সামরিয়া গ্রামের এক পুকুরপাড়ে রাজকীয় পতাকা ওড়ে। ২০শে সোমবার সওয়া চার ক্রোশ পথ চলে আসি দোহাদ পরগণার একটি গ্রামে। এই পরগণা মালব ও গুজরাটের সীমান্তে। ২১শে মঙ্গলবার বিশ্রাম নিই। কাম সম্বা (বুধবার), ২২শে তারিখ সওয়া পাঁচ ক্রোশ পথ চলে 'রনিয়াদ' গ্রামে থামি। ২৩শে তারিখ, বৃহস্পতিবার বিশ্রামের দিন। গ্রামের পুষ্করিণীর তীরে সুরাপান উৎসব হয়। ২৪শে শুক্রবার আড়াই ক্রোশ পথ চলে জালোট গ্রামে রাজপতাকা উড্ডীন হয়। এই বিশ্রামস্থলে কর্ণাটিকের কয়েকজন ভোজবাজিকর তাদের খেলা দেখায়। তাদের মধ্যে একজন সাড়ে পাঁচ গজ লম্বা এবং এক সের দুই দাম ওজনের লোহার শেকল গলার কাছে ধরে জল দিয়ে সেই শেকল গিলে ফেলে। পেটের মধ্যে শেকলটা কিছুক্ষণ রেখে সেটা আবার বের করে। ২৫শে শনিবার বিশ্রাম নিই। ২৬শে রবিবার পাঁচ ক্রোশ এগিয়ে নিম্‌দা গ্রামে আসি। ২৭শে সোমবার পাঁচ ক্রোশ চলে একটি পুকুরপাড়ে তাঁবু ফেলি। ২৮শে মঙ্গলবার পৌনে চার ক্রোশ পথ এগিয়ে 'সারা' শহরের কাছে একটি পুকুরপাড়ে রাজ-পতাকা উড্ডীন হয়। এই পুকুরে লালপদ্ম ফুটে আছে দেখলাম। আমি এর আগে নীল ও সাদাপদ্ম দেখেছি লাল দেখিনি। সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে ফুলটি যে অতুলনীয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই জাতের আর এক ফুল কুমুদিনী।

'কনওয়াল' (কমল ?) ফুল কুমুদিনীর চেয়ে বড়। এই ফুল লাল। আমি কাশ্মীরে একশ পাঁপড়ির অনেক কনওয়াল দেখেছি। এটা নিশ্চিত যে এই ফুল দিনে পাঁপড়ি মেলে, রাতে আবার কুঁড়ি হয়। কুমুদিনী এর বিপরীত—দিনে কুঁড়ি, রাতে ফোটা ফুল। কালো মৌমাছি যাকে ভারতীয়রা বলে ভোমরা সর্বদাই এই ফুলে বসে। ফুলের মধ্যে ঢুকে যেয়ে এই দুই রকম ফুলেরই মধু পান করে। এমনও প্রায়ই হয়—কমল তার পাঁপড়ি বুজলে মৌমাছিও তার মধ্যে সারারাত থাকে। এইভাবে কুমুদিনীর মধ্যেও সারাদিন মৌমাছি আটক পড়ে। যখন ফুল ফোটে তখন উড়ে যায়। মৌমাছি এই ফুলগুলির

সর্বসময়ের সাথী। এইজন্য ভারতের কবিরা মৌমাছিকে ফুলের প্রেমিক রূপে বর্ণনা করে উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখে থাকেন। এই কবিদের মধ্যে সর্বপ্রধান তানসেন কালোয়াত। তিনি আমার পিতার সময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক ছিলেন (বস্তুতঃ কোনও সময়েই তাঁর মত গায়ক হয় নাই)। তাঁর একটি কবিতায় একটি যুবকের মুখকে সূর্য এবং তার চক্ষু উন্মীলনকে পদ্মের পাঁপড়ি মেলা এবং মৌমাছির বেরিয়ে আসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর এক জায়গায় প্রেমিকার কটাক্ষের সঙ্গে মৌমাছির ভারে কমলের কম্পনের তুলনা করেছেন।

২৯শে, কাম সম্বা (বুধবার) এবং ৩০শে, মুবারক সম্বা (বৃহস্পতিবার) এইখানেই থাকি। ১লা দাই, শুক্রবার পৌনে চার ক্রোশ পথ চলে ঝাসোদ (যশোদা ?) পুষ্করিণীর পাড়ে থামি। এই জায়গায় খিদমতিয়ার সর্দার রায়মান একটা রুইমাছ ধরে আনে। আমি মাছের খুব পক্ষপাতী, বিশেষ করে রুইমাছ। এই মাছ হিন্দুস্থানের মধ্যে সেরা। আমি অনেক অনুসন্ধান করেও 'খাটিচাঁদ' গিরিসঙ্কট অতিক্রম করার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত এগারো মাস এই মাছ পাইনি। এখানে এই মাছ পাওয়ায় আমার খুবই আনন্দ হলো। রায়মানকে একটি ঘোড়া দিলাম। দোহাদ পরগণা গুজরাটের সীমার মধ্যে হলেও বস্তুত এই জায়গা থেকে সবই ভিন্ন রকমের মনে হতে লাগলো। খোলা মাঠ ও মাটি অন্য রকমের, জনসাধারণ অন্য ধরনের, ভাষাও ভিন্ন। রাস্তার ধারে যে জঙ্গল দেখা গেল তাতে অনেক ফলের গাছ—যেমন আম, খিরণি ও তেঁতুল। চষা ক্ষেত রক্ষা করা হয় 'জাকুমের' বেড়া দিয়ে। কৃষকরা পরস্পরের জমি পৃথক করে ক্যাক্‌টাস্ দিয়ে। মাঝখানে সরু রাস্তা রাখে যাতায়াতের জন্য। এ দেশের জমিতে বালুর ভাগ বেশী থাকায় চলাফেরার সময় এমন ধুলো ওড়ে যে মানুষের মুখ খুব কষ্টে দেখা যায়। এইজন্য আমেদাবাদকে লোকে বলে—'গর্দাবাদ' (ধুলোর রাজ্য)।

২রা দাই চার ক্রোশ পথ চলে মাহি নদীর তীরে শিবির ফেলি। ৩রা, রবিবার বরদোলা গ্রামে, ৪ঠা সোমবার চিত্রসীমায় এবং পরদিন মোণ্ডা পরগণায় রাজকীয় পতাকা ওড়ে। বুধবার ছয় ক্রোশ এগিয়ে নারিয়াদ পরগণায় আসি। শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় দেড় হাজার টাকা ছড়াই। ৭ই বৃহস্পতিবার সাড়ে ছয় ক্রোশ এগিয়ে পিতলাদ পরগণায় বিশ্রাম নিই। গুজরাট প্রদেশে এর চেয়ে বড় পরগণা আর নেই। এখানকার রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা। শহরের জনসংখ্যাও খুব বেশী। এই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময়

এক হাজার টাকা ছড়াই। সব সময়ে আমার মনে এই চিন্তাই জাগে যে—যে কোনও ছলেই আল্লার সৃষ্ট মানবদের উপকার হোক।

এ দেশে জনসাধারণের মধ্য দিয়ে যেতে হলে শকটই শ্রেষ্ঠ যান। আমি শকটেই যেতে ইচ্ছা করি। দু ক্রোশ আমি শকটেই বসেছিলাম। ধুলোয় আমার অত্যন্ত কষ্ট হতে থাকে। তারপর গন্তব্যস্থলের শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যাই। পথেই মুকারব খাঁয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমেদাবাদ থেকে আসছেন। আমাকে শ্রদ্ধা জানানোর সৌভাগ্য তাঁর ঘটে। তিনি ত্রিশ হাজার টাকায় কেনা একটি মুক্তা আমাকে উপঢৌকন দেন। ৮ই শুক্রবার সাড়ে ছয় ক্রোশ পথ চলে সৌভাগ্যের অবতরণের নির্দিষ্ট জায়গা লবণাক্ত সমুদ্র-তীরে পৌঁছে যাই।

ক্যাম্বে পুরাতন বন্দরগুলির মধ্যে একটি। ব্রাহ্মণদের মতে এই বন্দরের সৃষ্টি হাজার হাজার বছর পূর্বে। প্রথমে এর নাম ছিল ত্র্যম্বাবতি। তখন রাজা ত্র্যম্বক এই দেশের শাসক ছিলেন। এই রাজার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা যে বিবরণ দেন তা লিখতে গেলে অনেক লিখতে হয়। সংক্ষেপে কিছু লিখছি। উপরোক্ত রাজার কুমার নামে পৌত্র যখন এখানকার রাজা সেই সময় ঈশ্বরের বিধানে এই নগর ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে পড়ে। এমন ধূলা ও মাটি এই শহরের ওপর পড়তে থাকে যে সমস্ত বাড়িঘর তাতে ঢাকা পড়ে যায়। অনেক লোকের রুজি-রোজগার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এই বিপদ ঘটবার কিছু আগে রাজা যে বিগ্রহ পূজা করতেন তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে এইরূপ ঘটনা যে ঘটবে সেই কথা জানান। রাজা তাঁর পরিবারবর্গসহ একটি নৌকায় ওঠেন। এই বিগ্রহ ও তাঁর পেছনে যে স্তম্ভটি ছিল সেটিও নিয়ে যান। হঠাৎ দুর্ভাগ্যসূচক ঝড় উঠে নৌকাটিকেও ডুবিয়ে দেয়। তখনও রাজার আয়ুর কিছু অবশিষ্ট থাকায় এই স্তম্ভটিই তাঁর জীবনতরণী বয়ে নিয়ে কূলে ভিড়ায়। তারপর তিনি নগরটি পুনরায় গড়ে তোলার ইচ্ছা করেন। তিনি ঐ স্তম্ভটিকে পুনরায় লোক আগমন ও জনবসতির প্রতীক স্বরূপ স্থাপন করেন। হিন্দুস্থানের ভাষায় একে বলে স্তম্ভ অথবা খাম্বা। সেইজন্য এই নগরীর নাম হয় স্তম্ভনগরী অথবা খাম্বাবতি। কখনও কখনও পূর্বতন রাজার নামে ত্র্যম্বাবতীও বলা হতো। খাম্বতীর উচ্চারণ ক্রমে ক্রমে খাম্বাইতে (ক্যাম্বে) পরিণত হয়।

হিন্দুস্থানের বড় বন্দরগুলির মধ্যে এটি একটি। বন্দরটি নদীর মোহনার নিকট। বন্দরটি নদীর মোহনার কাছে হওয়ায় বড় বড় জাহাজ এই বন্দরে

আসতে পারে না। জাহাজ নোঙ্গর করে 'গোগা' বন্দরে যা ক্যাম্বের একটি উপবন্দর। এটা সমুদ্রের নিকট। সেখান থেকে 'ঘুরাবে' (সাধারণত তাকে বলা হয় 'গ্রাবি', আবুল ফজল বলেছেন 'তাওয়ারি') পণ্য বোঝাই করে ক্যাম্বে বন্দরে আনা হয়। জাহাজে মাল বোঝাই করার সময়েও এই বন্দর থেকে 'ঘুরাবে' মাল নিয়ে যাওয়া হয়। বিজয়ী আগন্তুকের (জাহাঙ্গীর) এখানে আগমনের পূর্বেই ইউরোপের বন্দর থেকে কয়েকটি 'ঘুরাব' ক্যাম্বেতে এসেছিল কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে। এখন ফেরার উদ্যোগ করছিল। ১০ই রবিবার তারা ঘুরাবগুলি সুসজ্জিত করে আমাকে দেখায়। তারপর আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাদের কাজে চলে যায়। ১১ই সোমবার একটা 'ঘুরাবে' চড়ে ক্রোশখানেক জলের ওপর বেড়াই।

১২ই মঙ্গলবার আমি চিতা নিয়ে বেরিয়ে দুইটি হরিণ ধরি। ১৩ই বুধবার আমি তারংসায়র দেখতে যাই। বাজার ও রাস্তায় যেতে যেতে পাঁচ হাজার টাকা ছড়াই। মহামান্য সম্রাট আকবরের সময়ে (আল্লার আলোই তাঁর কাজের সাক্ষী হোক) এই বন্দরের তত্ত্বাবধায়ক কল্যাণ রায় সম্রাটের আদেশে এই নগরের চারদিকে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করেন। অনেক বণিক নানা দেশ থেকে এসে এখানে বাস করতে আরম্ভ করেন। সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্মাণ করে তাঁরা অতি সহজভাবেই জীবিকা অর্জন করতে থাকেন। বাজারটি ছোট হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন ও জনাকীর্ণ। গুজরাটের সুলতানদের আমলে এই বন্দরের শুল্ক খুব বেশী আদায় হতো। আমার রাজত্বকালে চল্লিশ ভাগের এক ভাগের বেশী শুল্ক আদায় করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করি। অনেকে অন্যান্য বন্দরে দশ ভাগ অথবা আট ভাগ আদায় করে বণিক ও পর্যটনকারীদের নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে। মক্কার বন্দর কেড্ডাতে তারা চার ভাগের এক ভাগ এমন কি এর চেয়েও বেশী হারে শুল্ক আদায় করে। কারও পক্ষে কল্পনা করা কঠিন নয় যে গুজরাটের বন্দর থেকে পূর্বের শাসকদের আমলে কি রকম উচ্চহারে শুল্ক আদায় হতো। আল্লার মহিমায় তাঁর সিংহাসনের এই অনুগত ভৃত্য তার সাম্রাজ্য থেকে শুল্ক আদায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং এখানে 'তমঘা' (বাণিজ্য শুল্ক) নামের আর অস্তিত্ব নাই।

এই সময় আদেশ জারি করি যে সোনা ও রূপার তঙ্কা এমন ভাবে করতে করতে হবে যে তার ওজন সাধারণ মোহর ও টাকার ওজনের দ্বিগুণ হবে। সোনার মুদ্রার একপিঠে খোদাই থাকবে—'জাহাঙ্গীর সাহি—১০২৭'। অপর

দিকে থাকবে—'দ্বাদশ বর্ষ রাজত্বকালে ক্যাম্বেতে নির্মিত'। রৌপ্যমুদ্রার একদিকে লেখা থাকবে—'সিক্কা জাহাঙ্গীর সাহি—১০২৭' ও এই কথাগুলি ঘিরে লেখা থাকবে—'বিজয়ী জ্যোতিষ্মান সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রচলিত'। অপর পিঠে লেখা থাকবে 'দ্বাদশ বর্ষ রাজত্বকালে ক্যাম্বেতে নির্মিত'। এই কথাগুলি ঘিরে লেখা থাকবে—'দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর মাণ্ডু থেকে গুজরাট আগমনকালে'।

আমার রাজত্বকালের পূর্বে কোনও রাজার আমলে তাম্রধাতু ভিন্ন অন্য কোনও ধাতুর তঙ্কা মুদ্রা ছিল না। সোনা ও রূপার তঙ্কার চলন আমারই আবিষ্কার। আমি এর নাম জাহাঙ্গীরি মুদ্রা বলে অভিহিত করতে আদেশ দিই।

আমি যে অল্প কয়েকদিন লবণাক্ত সমুদ্রতটে শিবিরে অবস্থান করি সেই সময় বণিক, ব্যবসায়ী, দরিদ্র এবং ক্যাম্বে বন্দরের অন্যান্য অধিবাসীদের আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করি। আমি প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী তাদের সম্মানসূচক পোশাক অথবা ঘোড়া অথবা ভ্রমণব্যয় কিংবা জীবনধারণের সাহায্য হিসাবে অর্থদান করি। আমি সমুদ্রের জোয়ারভাটা দেখার ইচ্ছা করায় দশ দিন এখানে অবস্থান করি। ১৯শে দাই, মঙ্গলবার রাজকীয় পতাকা আমেদাবাদের দিকে যাত্রা করে। এই জায়গার সব চেয়ে ভাল মাছের নাম—'আরবিয়াৎ'। এখানকার জেলেরা সেই মাছ ধরে আমার কাছে নিয়ে আসতো। এ দেশের অন্য মাছের সঙ্গে তুলনা করলে এই মাছ নিঃসন্দেহে বেশী সুস্বাদু। কিন্তু স্বাদে এ মাছ রুই মাছের তুল্য নয়। তুলনা করলে নয় আর দশ অথবা আট আর দশের মধ্যে যে পার্থক্য এই দুই মাছের স্বাদের তুলনাও তদনুরূপ। গুজরাটবাসীদের বিশেষ খাদ্য হচ্ছে—বাজরার খিচুরি (জোয়ার ও ভাঙ্গা মটরের সংমিশ্রনে জলে ফোটানো)। একে তারা বলে—'লজিজা'। এটা এক ধরনের চূর্ণ শস্য যা হিন্দুস্থান ভিন্ন কোনও জায়গায় জন্মে না। ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানের তুলনায় গুজরাটেই এই শস্য বেশী ফলে। এর দামও অন্য শস্যের চেয়ে কম। আমি পূর্বে কখনও এ জিনিস খাইনি। আমি এই খিচুরি রান্না করে আনার জন্য আদেশ দিই। এর স্বাদ ভাল। আমার খাদ্যের উপযোগী বলে মনে হলো। আমার সংযম উদ্‌যাপনের দিনগুলিতে যেদিন আমি নিরামিষ আহার গ্রহণ করি সেদিন এই খিচুরি আমার আহারের জন্য কয়েকবার দিতে আদেশ দিই।

মঙ্গলবারেই আসি কোশালা গ্রামে। ২০শে বুধবার বাবরা পরগণার

ভেতর দিয়ে এসে নদীর তীরে শিবির পড়ে। ২১শে, মুবারক সন্ধা বিশ্রাম এবং সুরাপান উৎসব। ২২শে শুক্রবার আমি বাবিরা গ্রামে। পথ চলার সময় রাস্তার ধারে ধারে আড়াই-তিন গজ লম্বা দেওয়াল অনেকগুলি চোখে পড়লো। অনুসন্ধানে জানা গেল যে দৈব-পুরস্কারের কামনায় লোকেরা এগুলি নির্মাণ করেছে। পথে চলতে চলতে কোনও মালবাহক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে তার বোঝা এই দেওয়ালের ওপর রেখে একটুখানি বিশ্রাম করে অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই অনায়াসে তার বোঝা তুলে নিয়ে তার গন্তব্যস্থলে যেতে পারে। গুজরাটবাসীদের এটা একটা অদ্ভুত খেয়াল। এই দেওয়াল তৈরীর ব্যাপারটি আমার খুবই ভাল লাগলো। আদেশ দিলাম—সমস্ত বড় বড় শহরে এইরকম দেওয়াল তৈরী করতে হবে। খরচ দেওয়া হবে রাজ্যের কোষাগার থেকে।

২৩শে তারিখ শনিবার কঁকারিয়া পুকুরের ধারে শিবির পড়ে। আমেদাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আমেদের পৌত্র কুতুবউদ্দিন মহম্মদ এই পুষ্করিণী খনন করে চারপাশে পাথর ও সিমেণ্টের সিঁড়ি নির্মাণ করেন। পুষ্করিণীর মাঝখানে একটি ছোট উদ্যান এবং কয়েকটি অট্টালিকাও তৈরী করেন। পুষ্করিণীর তীর থেকে অট্টালিকাতে যাওয়ার জন্য বাঁধও নির্মাণ করান। এসব অনেক দিন আগের কথা। এখন বেশীর ভাগ অট্টালিকাই ধ্বংস হয়েছে। বসবার উপযুক্ত জায়গাও একটা অবশিষ্ট নেই। যখন এই সৌভাগ্যবানের দল আমেদাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ করছে, সেই সময় সরকারী ব্যয়ে গুজরাটের বক্‌শি সফি খাঁ ভগ্নদশাপ্রাপ্ত অট্টালিকাগুলি মেরামত করে এবং ছোট্ট বাগানটি পরিষ্কার করে সেখানে একটি নতুন অট্টালিকা নির্মাণ করে। সত্যই জায়গাটি অত্যন্ত উপভোগ্য ও নয়নমনোহর। এর গঠনরীতি আমাকে মুগ্ধ করে।

এই পথে শা' আলমের সমাধি পড়ে। পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি 'ফতেহা' আবৃত্তি করি। এই সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করতে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। শা' আলম ছিলেন কুতুব আলমের পুত্র। এঁরা মুখদুম-ই-জাহানিইয়ায়ের (মুলতানের সিদ্ধপুরুষ) বংশধর। এ দেশের উচ্চনীচ সবারই তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস। তারা বলে থাকে যে মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান করার তাঁর ক্ষমতা ছিল। কয়েকজন মৃত ব্যক্তির জীবনদান করার পর তাঁর পিতা এই সংবাদ শুনে তাঁকে এই কাজ করতে নিষেধ করেন।—তাঁকে জানান যে ঈশ্বরের কর্মশালায় হস্তক্ষেপ করা অন্যায়, তাঁর প্রতি প্রকৃত আনুগত্যের পরিপন্থী।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। শা' আলমের একজন পরিচারিকা ছিল। তার কোনও সন্তান ছিল না। শা' আলমের প্রার্থনায় সর্বশক্তিমান আল্লা তাকে একটি পুত্রসন্তান দেন। পুত্রটি সাত-আট বছরের হলে মারা যায়। পরিচারিকাটি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলে—"আমার একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে। আপনারই অনুগ্রহে আল্লা আমাকে এই ছেলেটি দিয়েছিলেন। আমি আশা করি যে আপনারই প্রার্থনায় আমার ছেলে আবার জীবন ফিরে পাবে।"

শা' আলম কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর তাঁর কক্ষে চলে গেলেন। পরিচারিকা শা' আলমের ছেলের কাছে যায়। পরিচারিকাকে সে খুবই ভালবাসতো। তার বাবার কাছে গিয়ে তার ছেলের জীবনদান করার কথা বলার জন্য সে তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। পুত্রটির বয়স অল্প। সে তার পিতার কাছে গিয়ে তাঁর কাছে অনেক অনুরোধ করতে থাকে। শা' আলম পুত্রকে বলেন, "তুমি কি এই মৃতের জন্য তোমার জীবনদান করতে পারবে? তা হলে হয়তো আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে।" পুত্র নিবেদন করে—"আপনার ইচ্ছা আর আল্লার অভিলাষ আমি হৃষ্টচিত্তে পূরণ করতে প্রস্তুত।"

শা' আলম তাঁর পুত্রের হাত ধরলেন। তারপর তাকে মাটি থেকে ওপরে তুলে মুখ আকাশের দিকে ঘুরিয়ে বললেন—"খোদা, ঐ বাচ্চাটির পরিবর্তে এইটিকে নেও।" বলা মাত্র বালকের প্রাণ আল্লার দরবারে চলে গেল। শা' আলম পুত্রকে নিজের শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরিচারিকাকে বললেন—"বাড়ী যাও। ছেলের সংবাদ নাও। হয়তো সে মরেনি, অজ্ঞান হয়ে আছে।" পরিচারিকা বাড়ীতে ফিরে দেখে তার ছেলে বেঁচে আছে।

গুজরাটে শা' আলম সম্বন্ধে এই রকম অনেক কাহিনী শোনা যায়। আমি নিজে তাঁর সমাধিস্থানের তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ মহম্মদকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচারবুদ্ধির অভাব ছিল না। তিনি বললেন —"আমিও এই কথা আমার পিতা ও পিতামহের মুখে শুনেছি। বংশ-পরম্পরায় এই কাহিনী মুখে মুখে চলে এসেছে। একমাত্র আল্লাই এর রহস্য জানেন।" কাহিনীটি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য হলেও এত প্রসিদ্ধিলাভ করেছে যে এই অদ্ভুত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ না করে পারলাম না। নশ্বর পৃথিবী থেকে

তাঁর তিরোধান ঘটে ৮৮০ হিজরা সনে (১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ), সুলতান মামুদ বিগরোর রাজত্বকালে সমাধিস্থানে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন মামুদের পুত্র সুলতান মুজাফ্‌ফরের তাজ খাঁ তুরাণি নামে একজন আমির।

২৫শে সোমবার আমি মনের আনন্দে শুভ সময় আমার প্রিয় হস্তী 'সুরৎগজে' আরোহণ করে নগর অভিমুখে যাত্রা করি। যদিও হস্তীটির মস্তিকাল (মদক্ষরণ) আগত, তবুও আমার হস্তীচালনার নিপুণতার ওপর আস্থা ছিল। অগণিত স্ত্রী ও পুরুষের জনতা রাস্তায়, বাজারে, ফটকে এবং প্রাচীরের কাছে অপেক্ষা করছিল। আমেদাবাদ নগরটির যত প্রশংসার কথা শুনেছিলাম আমার কিন্তু ততটা সুন্দর মনে হলো না। বাজারের প্রধান পথটি বেশ প্রশস্ত করা হলেও পথের ধারের দোকানগুলি এই চওড়া পথের সঙ্গে খাপ খায়নি। দোকানঘরগুলি কাঠের তৈয়ারী। খুঁটিগুলি সরু সরু। রাস্তা ধূলায় পূর্ণ। কাঁকরিয়া পুকুর থেকে নগর-দুর্গ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাই ধূলিময়। এ দেশের ভাষায় দুর্গকে বলে—'ভাদর'। 'ভাদরে'র (ভদ্র) অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্যশালী। সুলতানদের আবাস 'ভাদরে'র অভ্যন্তরে। সেগুলি ৫০।৬০ বছর পূর্বেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তার কোনও চিহ্ন নেই। যাহোক, আমার কর্মচারীরা কয়েকটি নতুন অট্টালিকা তৈরী করেছে। আমার বসবার স্থান যেমন ঝরোকা, দরবারকক্ষ ইত্যাদিও নির্মাণ করেছে।

আজ পুত্র সাজাহানের ওজন নেওয়ার উৎসবের পক্ষে শুভদিন হওয়ায় আমি প্রচলিত নিয়মানুসারে সোনা এবং অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা করি। তার সপ্তবিংশতি জন্মদিবসটি বেশ আনন্দ উপভোগের মধ্যে উদ্‌যাপিত হলো। আশা করি অনুগ্রহ বিতরণকারী আল্লা তাঁর দরবারে এই দীন সেবকটিকে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন উপভোগ করার অনুগ্রহ দেখাবেন। এই পুত্রকে গুজরাট প্রদেশটি জায়গীর হিসাবে দিলাম।

মাণ্ডু দুর্গ থেকে ক্যাম্বে দুর্গ পর্যন্ত দূরত্ব ১২৪ ক্রোশ। এই পথ আমি ২৮ দিন চলে এবং ৪০ দিন থেমে অতিক্রম করি। ক্যাম্বেতে আমি দশ দিন ছিলাম। সেখান থেকে আমেদাবাদ নগর ২১ ক্রোশ। পাঁচদিন চলে এবং দুইদিন থেমে এই পথ অতিক্রম করি। মাণ্ডু থেকে ক্যাম্বে এবং ক্যাম্বে থেকে আমেদাবাদ সবসুদ্ধ ১৪৫ ক্রোশ। এই দূরত্ব দুই মাস পনেরো দিনে অতিক্রম করি। তার মানে তেত্রিশ দিন রাস্তায় চলেছি আর বিয়াল্লিশ দিন বিশ্রাম করেছি।

২৬শে মঙ্গলবার আমি মসজিদে যাই। সেখানে উপস্থিত ফকিরদের নিজ হাতে ৫০০ টাকা বিতরণ করি। মসজিদটি আমেদাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা স্থলতান আমেদের একটি স্মরণিক। এখানে আছে তিনটি ফটক। প্রত্যেক ফটকের কাছেই একটা করে বাজার। পূব মুখের ফটকের বিপরীত দিকে উক্ত স্থলতান আমেদ, তাঁর পুত্র মহম্মদ এবং তাঁর পৌত্র কুতুবউদ্দিনের সমাধি। মসজিদের আঙ্গিনা দৈর্ঘ্যে ১০৩ হাত ও প্রস্থে ৮৯ হাত। ২৭শে তারিখ বুধবার আমি সেখ ওয়াজিহুদ্দিনের আশ্রমে যাই। আশ্রমের প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধিস্থলের মাথার দিকে 'ফাতিজা' পড়া হয়। আমার পিতার আমলের একজন বিশিষ্ট আমির এই আশ্রম নির্মাণ করেন। সেখ ওয়াজিহুদ্দিনের বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপনের সময় এইটা। এই উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেড় হাজার টাকা দিই। সেখ ওয়াজিহুদ্দিনের পৌত্রকেও পাঁচশ টাকা দিই।

বৃহস্পতিবার আমি 'রুস্তম খাঁ বাড়ী' দেখতে যাই। পথে দেড় হাজার টাকা বিতরণ করি। এখানকার লোকেরা হিন্দুস্থানের ভাষায় বাগানকে 'বাড়ী' বলে। এই বাগান আমার ভাই মুরাদ তার পুত্রের নামে তৈরী করেছিল। দিনের শেষে এই বাগানের কাছাকাছি শেখ সিকেন্দারের হাওয়ালি সংলগ্ন ছোট্ট বাগানে যাই। সেখ সিকেন্দার গুজরাটে বংশসম্ভূত। গুজরাটের স্থলতানদের সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ তার জানা আছে। সাত-আট বৎসর যাবৎ সে সাম্রাজ্যের কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। পুত্র সাজাহান আমেদাবাদ সরকারের কাছে তার প্রধান কর্মচারী রুস্তম খাঁকে নিযুক্ত করায় তার অনুরোধে তার নামের সঙ্গে মিল থাকায় তাকে রুস্তম বাড়ী উদ্যানটি উপহার দিই।

বাহমন মাসের ১লা তারিখ শনিবার আমার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে ঐ দিকের আর একজন প্রসিদ্ধ জমিদার চন্দ্র সেন আমার ভূমি চুম্বন করার সৌভাগ্য লাভ করেন ও নয়টি অশ্ব উপঢৌকন দেন। মুবারক সম্বায় (বৃহস্পতিবার) সারখেজ গ্রামে 'জয় উদ্যানে' যাই। পথে পনেরশ টাকা বিতরণ করি। পথে সেখ আমেদ খাটার সমাধিস্থল পড়ে। সেখানে 'ফতিহা' পড়া হয়। নাগোর সরকারে 'খাটা' একটি শহর। এই শহরে শেখ জন্মগ্রহণ করেন। আমেদাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা স্থলতান আমেদের রাজত্বকালে সেখ জীবিত ছিলেন। স্থলতান তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এ দেশের লোকের সেখের প্রতি অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। তারা তাঁকে একজন প্রসিদ্ধ ও প্রকৃত সাধু বলে গণ্য করতো।

প্রত্যেক শুক্রবার রাত্রে উচ্চনীচ বহুলোক তাঁর সমাধি দেখতে যায়। উপরোক্ত সুলতান আমেদের পুত্র সুলতান মহম্মদ সমাধিস্তম্ভ, মসজিদ ও সাধুসন্তদের আশ্রম হিসাবে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেন এই সমাধিস্থলে। তাঁর সমাধির দক্ষিণ দিকে একটি বড় পুষ্করিণী খনন করেন। তার চারপাশ পাথর ও চুনের গাঁথনির দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেন। বাড়ীঘর তৈরীর কাজ উক্ত মহম্মদের পুত্র কুতুবউদ্দিনের আমলে সম্পূর্ণ হয়। সেখের সমাধির পদতলে পুষ্করিণীর পারে গুজরাটের সুলতানদের অনেকেরই সমাধি আছে। সেখের সমাধি অত্যন্ত জমকালো এবং জায়গাটি মনোরম। শোনা যায় সমাধিস্থল নির্মাণ করতে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আল্লা জানেন কথাটা কতটা সত্য।

সমাধিস্থল পরিদর্শন করে আমি 'ফৎবাগে' (জয় উদ্যানে) যাই। বাগানটি যেখানে অবস্থিত সেখানে সৈনাধ্যক্ষ খানখানান আতালিক নবাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন—যে নবা নিজেই নিজেকে মুজাফ্‌ফর খাঁ উপাধি দিয়েছিল। এই কারণেই এর নামকরণ হয় 'বাগ্-ই-ফথ্। গুজরাটের লোকেরা এই বাগানকে বলে 'ফৎবাড়ী'। যুদ্ধের ঘটনাটির বিবরণ বিস্তৃতভাবে 'আকবর-নামা'য় বর্ণিত হয়েছে। সম্রাট আকবর নবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জা খাঁকে নিযুক্ত করে তার সঙ্গে সাহসী সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল আট-নয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আর নবার দলে ছিল কলঙ্কিত ধ্বংসপথের যাত্রী ত্রিশ হাজার সৈন্য। দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুদ্ধ ও হত্যালীলার পর জয়ের দক্ষিণা বাতাসে রাজকীয় সৈন্যের পতাকা আন্দোলিত হয়। নবা পরাস্ত হয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে পলায়ন করে। আমার পিতা এই যুদ্ধজয়ের পুরস্কার স্বরূপ মির্জা খাঁকে পাঁচহাজারি মনসবদারি প্রদান করেন এবং তাঁকে খানখানান পদবীতে ভূষিত করে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। যুদ্ধভূমিতে খানখানান যে উদ্যান তৈরী করেন—সেটা সবরমতী নদীর তীরে। সেই নদীর উঁচু পার বরাবর তিনি অনেক বড় বড় অট্টালিকাও নির্মাণ করেন। উদ্যানটিও পাথর ও সিমেন্টের গাঁথনির প্রাচীরে ঘেরা। এটি অতি মনোহর বিশ্রামের জায়গা। উদ্যান রচনায় দু লাখ টাকা খরচ হওয়া অসম্ভব নয়। আমার খুবই ভাল লেগেছে। গুজরাটে এমন সুন্দর উদ্যান আর নাই। বৃহস্পতিবারে ভোজের ব্যবস্থা করে আমার ব্যক্তিগত ভৃত্যদের সুরার পেয়ালা পরিবেশনের আয়োজন করি। সে রাত এখানেই কাটাই।

রাত প্রভাত হলে অর্থাৎ শুক্রবারে আমি নগরে প্রবেশ করি। পথে এক হাজার টাকা ছিটাই। এই সময় উদ্যানরক্ষক নিবেদন করে যে মুকারব খাঁয়ের একজন ভৃত্য নদীর ধারে বসবার বেঞ্চের পাশের অনেকগুলো চাঁপা গাছ কেটেছে। এই কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে আমি নিজেই প্রকৃত ব্যাপার কি ঘটেছে অনুসন্ধান করি। তদন্তে জানতে পারি যে সত্যই এই লোকটি অপকার্য করেছে। তাঁর দুই হাতের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলার আদেশ দিই। পরিষ্কার বোঝা গেল যে মুকারব খাঁ এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। জানতে পারলে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন।

১১ই মঙ্গলবার নগরের কোটাল একজন চোরকে ধরে নিয়ে আসে। লোকটি আগে অনেকবার চুরি করেছে। প্রত্যেকবারই ধরা পড়ার পর তার দেহের এক-একটি অঙ্গ কেটে দেওয়া হয়েছে—একবার ডান হাত, দ্বিতীয়বার তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল, তৃতীয়বার তার বাঁ কান। চতুর্থবার তার পায়ের শিরা এবং শেষবার তার নাক। এই রকম শাস্তি পেয়েও সে এই দুষ্কার্য থেকে বিরত হয়নি। কাল সে একজন ঘাস-বিক্রেতার বাড়ীতে চুরি করার জন্য প্রবেশ করে। বাড়ীর মালিক ভাগ্যক্রমে তাকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলে। চোরটি ঘাস-বিক্রেতাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে। আমি চোরটিকে মৃতের আত্মীয়দের হাতে দিতে বলি যাতে তার ওপর তারা প্রতিশোধ নিতে পারে।

"তোমার মুখের রেখাগুলিতেই তোমার মস্তিষ্কের চিন্তা ধরা পড়বে।"

১৩ই বৃহস্পতিবার পুত্র শাজাহানের আবাসে যাই। সেখানে মুবারক সন্ধার ভোজের আয়োজন করে আমার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের মধ্যে সুরা পরিবেশন করার ব্যবস্থা করি। আমি পুত্রকে 'সুন্দর মালান' নামে হাতীটিকে দিই। আমার ব্যক্তিগত যত হাতি আছে তার মধ্যে দ্রুতগতিতে, সৌন্দর্যে, ছন্দময় পদক্ষেপে এবং অশ্বের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় এই হাতিটি শ্রেষ্ঠ। সর্ব বিষয়েই এর স্থান প্রথম, হাতিটি সম্রাট আকবরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পুত্র শাজাহান হাতিটিকে খুবই পছন্দ করে। বারংবার এই হাতিটি পাওয়ার জন্য আমাকে বলতো। উপায়ান্তর না দেখে তাকে হাতিটি দিলাম —হাতিটির সঙ্গে একটি হস্তিনী আর সাজসরঞ্জাম যেমন সোনার শিকল ইত্যাদি।

এই সময় সংবাদ আসে যে উড়িষ্যার শাসক মুয়াজ্জম খাঁয়ের পুত্র মুকারম

খাঁ খুরদা অঞ্চল জয় করেছে এবং সেখানকার রাজা রাজমহেন্দ্রে পালিয়ে গিয়েছে। উড়িষ্যা প্রদেশ ও গোলকুণ্ডার মধ্যবর্তীস্থানে দুইজন জমিদার ছিল—একজন খুরদার রাজা আর একজন রাজমহেন্দ্রের রাজা। খুরদা এখন সাম্রাজ্যের অধীনে এলো। এর পর রাজমহেন্দ্র দেশটির পালা। আমার এই আশা আছে যে আল্লার করুণায় আমার শক্তির পদক্ষেপ আরও অগ্রসর হতে পারবে। এই সময় কুতুব-উল-মুলকের একটি আবেদন পুত্র শাজাহানের কাছে আসে। আবেদনে তিনি জানিয়েছেন যে খুরদা রাজ্যের সীমানাতেই তাঁর নিজের রাজ্য। তিনি বরাবরই সাম্রাজ্যের অনুগত হয়ে আছেন। সুতরাং তিনি আশা করেন যে মুকারম খাঁকে এমন আদেশ দেওয়া হবে যে সে যেন তার হাত তাঁর রাজ্যের দিকে প্রসারিত না করে। তাঁর এই আশঙ্কা মুকারম খাঁর সাহস ও শক্তির পরিচায়ক। কুতুব-উল-মুলকের মত একজন শক্তিশালী ব্যক্তিও মুকারম খাঁকে প্রতিবেশীরূপে ভাবতে ভয় পাচ্ছে।

২৩শে বৃহস্পতিবার জয়-উদ্যানে (ফৎবাগ) যাই। সেখানে লাল গোলাপের বাহার দেখি। একখণ্ড ভূমিতে বেশ ভাল ভাল লাল গোলাপ ফুটেছে। এ দেশে নানা ধরনের লাল গোলাপ নাই। এখানে অনেক জাতের লাল গোলাপ দেখে খুবই ভাল লাগলো। এনিমোনের (টিউলিপ) কেয়ারিগুলিও মন্দ নয়। ফিগও পেকেছে। আমি নিজের হাতে কয়েকটি ফিগ্ পাড়ি। বড় আকারের একটিকে ওজন করে দেখা গেল সাড়ে সাত তোলা। এই দিনেই কারিজ থেকে দেড় হাজার খরমুজ আসে। খান আলম উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছে। আমার পরিচারকদের মধ্যে এক হাজার বিতরণ করি আর পাঁচশ দিই অন্দরমহলের স্ত্রীলোকদের। আমি মনের আনন্দে চারদিন এই বাগানে কাটাই। ২৪শে সোমবার নগরে ফিরে আসি। কয়েকটি খরমুজ আমেদাবাদের সেখদের দিই। তারা বিস্মিত হলো এই দেখে যে এর তুলনায় গুজরাটের খরমুজ কতটা নিকৃষ্ট। তারা আল্লার দয়া দেখে খুশী হলো।

১লা ইস্ফানদারমুজ সোমবার আমেদাবাদ ত্যাগ করে মালবের দিকে অগ্রসর হই। কাঁকরিয়া পুষ্করিণীর তীরে পৌছানো পর্যন্ত রাস্তায় টাকা পয়সা ছিটোতে ছিটোতে যাই। এখানে তিনদিন বিশ্রাম করি। ৫ই শুক্রবার আমেদাবাদ নদীর তীরে শিবির ফেলি।

বাতো (বানো) গ্রামে শা' আলম বুখারির পিতা কুতুব আলমের সমাধিস্থল।

গ্রামটি আমার যাওয়ার পথে পড়ায় সেখানে যাই। সমাধিস্থলের তত্ত্বাবধায়কদের পাঁচশ মুদ্রা দিই। ৬ই শনিবার মামুদাবাদ নদীর ওপর নৌকায় উঠে মাছ ধরতে যাই। এই নদীর তীরেই সৈয়দ মুবারক বুখারির সমাধি। তিনি গুজরাটের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ মিরাণ এই সমাধিগৃহ নির্মাণ করে। অট্টালিকাটি খুব উঁচু। তার চারধারে পাথর ও চুনের শক্ত প্রাচীর। এটা তৈরী করতে দু লাখ টাকার বেশী খরচ হয়েছে। গুজরাট সুলতানদের সমাধিগৃহ যতগুলি আমি দেখেছি তার কোনটিই এর দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। তাঁরা সবাই ছিলেন রাজা। সৈয়দ মিরাণ ছিল একজন কর্মচারী মাত্র। প্রজ্ঞা ও আল্লার কৃপা এই ফলদান করেছে। পিতার এমন সমাধিগৃহ যে পুত্র নির্মাণ করেছে হাজার আশীর্বাদ তার মাথায় বর্ষিত হোক। "পৃথিবীতে তাঁর স্মৃতি জাগরূক হয়ে থাক।"

রবিবার এখানে থেকেই মাছ ধরি। চারশ মাছ ধরা পড়ে। এদের মধ্যে একটার কোনও আঁশ নাই।—এই মাছকে বলে 'সং-মাহি' (পাথুরে মাছ)। পেটটা খুব বড় এবং স্ফীত দেখে মাছটাকে আমার সামনেই কাটতে বলি। এর পেটের ভেতর আঁশওয়ালা আর একটা মাছ—যাকে একটু আগেই বড় মাছটা গিলেছে। সে মাছের আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। দুটো মাছই ওজন করতে বলি। পাথুরে মাছটি ওজনে হলো সাড়ে ছ'সের এবং আর একটি প্রায় দুই সের।

৮ই সোমবার মোদা গ্রামে শিবির পড়ে। এখানকার বাসিন্দারা গুজরাটের বর্ষাঋতুর খুব প্রশংসা করে। আগের রাতে এখানে বৃষ্টি হয়েছে। আজ প্রাতরাশের পূর্বেও কিছু বর্ষণ হয়েছে। এর ফলে ধুলোটা কমেছে। এ দেশটা বালুকাময়। সুতরাং বর্ষাকালে এখানে ধুলো কিংবা কাদা হবে না। মাঠ সবুজ রংয়ে মনোরম হয়ে উঠবে। যাহোক, বর্ষাঋতুর একটু নমুনা দেখলাম।

মঙ্গলবার জরসিমা গ্রামে আসি। এইখানে সংবাদ আসে যে মানসিং সেওরা নরকের প্রভুদের কাছে তার আত্মা সমর্পণ করেছে। সেওরাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে এরা বিধর্মী। হিন্দুদের মধ্যেই একটি উপজাতি যারা সব সময়ে নগ্নপদে ও নগ্নশিরে চলাফেরা করে। তাদের মধ্যে একদল তাদের মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ উপড়ে ফেলে ও আর একদল ক্ষুর দিয়ে কামায়। তারা সেলাই করা পোশাক পরে না। তাদের বিশেষ নীতি—কোনও

জীবন্ত প্রাণীর ক্ষতি করতে নেই। বেনিয়ারা এদের পীর ও শিক্ষাগুরুর সম্মান দেয়, এমন কি তাদের পূজা পর্যন্ত করে। সেওরাদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। একটিকে বলা হয়—পতা (তপা)। আর একটিকে কন্‌থাল (করতাল)। মানসিং শেষোক্ত শ্রেণীর এবং বালচাঁদ তপা শ্রেণীর নেতা। তারা দুইজনই সম্রাট আকবরের সঙ্গে দেখা করতো। তিনি মারা যাওয়ার পর এবং খসরুর পলায়নের সময় যখন তাকে আমি অনুসরণ করি সেই সময় বিকানিরের জমিদার রাজসিং ভরতিয়া—যাঁকে আকবর অনুগ্রহ প্রদর্শন করে আমির শ্রেণীতে উন্নীত করেন—মানসিংকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমার রাজত্ব কতদিন স্থায়ী হবে এবং আমার সফলতা লাভের সম্ভাবনা কতটা। এই কলুষিত জিহ্বাবিশিষ্ট লোকটি—যে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং খাঁটি ভবিষ্যৎ-বক্তা বলে নিজেকে জাহির করতো—তাঁকে বলে যে আমার রাজত্ব বড় জোর দুই বছর স্থায়ী হবে। সেই বৃদ্ধ বেকুবটি (রাজসিং) তার কথায় বিশ্বাস করে কোনও অনুমতি না নিয়েই তার দেশে চলে যায়। যখন মহিমময় খোদা এই অধীনকে কৃপা করেন এবং আমি বিজয়ী হয়ে রাজধানীতে ফিরে আসি সেই সময় তিনি লজ্জিত ও ভগ্নহৃদয়ে দরবারে উপস্থিত হন।

অবশেষে মানসিং তিন-চার মাসের মধ্যেই কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তার অঙ্গ খসে পড়তে থাকে। তার অবস্থা ক্রমে এমন হয়ে দাঁড়ায় যে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই তার কাম্য হয়। সে তখন বিকানিরে ছিল। তার কথা আমার মনে পড়ায় তাকে ডেকে পাঠাই। পথেই সে অতিমাত্রায় শঙ্কিত হয়ে বিষ খেয়ে নরকের প্রভুর কাছে তার আত্মা সমর্পণ করে। যতদিন এই আল্লার কিঙ্কর ন্যায় ও সৎ পথ থেকে বিচ্যুত না হবে ততদিন কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে সে তার কার্যের গুরুত্ব হিসাবে প্রতিফল নিশ্চয়ই পাবে।

সেওরারা ভারতবর্ষের অধিকাংশ নগরেই বাস করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা গুজরাটেই বেশী। এখানে বেনিয়ারাই প্রধান ব্যবসায়ী। সেইজন্য সেওরারাও অধিক সংখ্যায় এখানে বাস করে। বেনিয়ারা সেওরাদের জন্য বিগ্রহ মন্দির তৈরী করা ছাড়াও তাদের বাসের জন্য বাড়ী নির্মাণ করে তাদের পূজার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই গৃহগুলিই রাজদ্রোহ প্রচারের প্রধান স্থান। বেনিয়ারা তাদের স্ত্রী-কন্যাদেরও সেওরাদের কাছে পাঠায়। তাদের না আছে লজ্জা না আছে সতীত্ব। আমি এই জন্য আদেশজারি করি যে সেওরাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। আমার সাম্রাজ্যে এই ফারমান

বিলি করা হয়—যেখানে সেওরারা আছে তাদের সেখান থেকে দূর করে দিতে হবে।

১১ই বৃহস্পতিবার পুকুরের ধারে সুরাপান উৎসবের আয়োজন করি। পুত্র শাজাহান তার কাছে ফারা থেকে প্রেরিত ডালিম ও কুইন্স (টকজাতীয় ফল) আমাকে উপঢৌকন দেয়। এত বড় ফল আমি আগে দেখিনি। ফল ওজন করতে বলি। কুইন্স ওজনে হলো ২৯ তোলা নয় মাসা আর ডালিম সাড়ে চল্লিশ তোলা।

আমেদাবাদে রাজকীয় পতাকা উড্ডীন হয়ে যখন থেকে এই নগরের শোভা বর্ধন করেছে তখন থেকে আমার দিনরাতের কাজ হচ্ছে নানা উপযুক্ত লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাদের অর্থ ও ভূমি দান। সেখ আমেদ সদর এবং আরও কয়েকজন বিচক্ষণ কর্মচারীকে আমার সম্মুখে দরবেশ ও অভাবী লোকদের উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিই। আমি আমেদাবাদ পরিদর্শনে সন্তুষ্ট না হলেও আমার এইটুকু তৃপ্তিলাভ হয়েছে যে আমার আগমন বহু দরিদ্র লোকের উপকারের হেতু হয়েছে।

১৬ই মঙ্গলবার কামার খাঁর পুত্র কেকিব ধরা পড়ে। সে ফকিরের পোশাকে বুরহানপুরে ছিল এবং অরণ্যচারী হয়েছিল। সে মির আবদুল লতিফের পৌত্র। তিনি ছিলেন সইফি সৈয়দ বংশের একজন। এই দরবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। কেকিব দাক্ষিণাত্য সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হয়। কিছুদিন তাকে দারিদ্র্য ও দুর্গতির মধ্যে কাটাতে হয়। ছয় মাস সে দৌলতাবাদ, বিদর, বিজাপুর, কর্ণাটক ও গোলকুণ্ডা সহ সমস্ত দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করে দাবল বন্দরে আসে। সেখান থেকে জাহাজে সে 'গোগা' বন্দরে যায় এবং সুরাট, ব্রোচ ইত্যাদি বন্দর ঘুরে আমেদাবাদ পৌছায়। এই সময় জাহিদ নামে শাজাহানের একজন ভৃত্য তাকে আটক করে দরবারে নিয়ে আসে।

আমি তাকে ভাল ভাবে শৃঙ্খলবদ্ধ করে আমার সামনে হাজির করতে আদেশ দিই। তাকে দেখার পর বলি—তোমার পিতা ও পিতামহের সম্মানের কথা বিবেচনা না করে এবং তুমি সম্ভ্রান্ত খানজাদা বংশের একজন হয়ে কেন তুমি এমন হীন আচরণ করেছ?

সে উত্তর দিল যে সে তার কিবলা এবং প্রকৃত শিক্ষকের সম্মুখে মিথ্যা বলবে না। সত্য কথা এই যে সে অনুগ্রহের আশা করেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে নিরাশ হয়ে বাহুবন্ধন ছিন্ন করে প্রবাসের জীবন গ্রহণ করেছিল।

তার কথায় সত্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছে দেখে আমার মনে দাগ কাটলো। আমার কণ্ঠস্বরের রূঢ়তা ত্যাগ করে জিজ্ঞাসা করি যে সে তার দুর্ভাগ্যের সময় আদিল খাঁ কিংবা কুতুব-উল-মুলক অথবা অম্বরের সঙ্গে দেখা করেছিল কিনা। সে উত্তরে বলে যে যদিও সে এই দরবারের কাছে অকর্মা রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং এই উদারতার অসীম সাগরেও তার তৃষ্ণা মেটেনি তবুও সে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অন্য কোনও প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হয়নি। তবে সেই শির স্কন্ধচ্যুত হোক যদি সে সত্যই সেই শির অন্যের কাছে নত করে থাকে। যে সময় সে প্রবাসজীবনে চলে যায় সেই সময় থেকে সে রোজনামচা রেখেছে যাতে তার দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা আছে। সেটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে সে কিরূপ আচরণ করেছে।

এই কথা শুনে তার ওপর অনুকম্পা আরও বেড়ে গেল। তার কাগজপত্র আনিয়ে পড়লাম। তা থেকে জানতে পারি যে সে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে, বেশীর ভাগ সময়ই সে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছে, অনাহারে তাকে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে। তার ওপর সদয় ভাব আমার মনকে আচ্ছন্ন করলো। পরদিন আমি তাকে ডেকে পাঠাই। তার হাত-পা শৃঙ্খলমুক্ত করতে আদেশ দিই। তারপর তাকে একটি অশ্ব, একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ এবং তার খরচের জন্য এক হাজার টাকা দিই। তাকে এমন অনুগ্রহ দেখাই যা সে কখনো কল্পনায়ও আনেনি।

সে এই কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করতে থাকে :—

"আল্লা, কি দেখছি আমি ?
এ কি স্বপ্ন না জাগ্রত অবস্থা আমার ?
এমন সুখ কি সম্ভব এত যন্ত্রণার পরে ?"

১৭ই তারিখ বারসিনর গ্রামে পৌছাই। আগেই উল্লেখ করেছি যে কাশ্মীরে প্লেগ দেখা দিয়েছে। এই দিন সংবাদ-সংগ্রাহকের রিপোর্ট আসে। তাতে লেখা আছে যে এই ব্যাধি ঐ দেশে শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে। অনেকেই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। রোগের লক্ষণ প্রথম দিন মাথা ধরে ও জ্বর হয় আর নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। দ্বিতীয় দিনেই রোগী মারা যায়। কোনও বাড়ীতে একটি লোক মারা গেলে অন্যান্য লোকও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। যে কেউ রোগীর অথবা মৃত ব্যক্তির কাছে যায় সেও এই রোগের কবলে পড়ে। একবার একটি মৃতদেহ ঘাসের ওপর ফেলে রাখা

হয়। একটা গরু এসে সেই ঘাস খায়। গরুটি মারা যায়। কয়েকটি কুকুর সেই মৃত গরুর মাংস খাওয়ার পর তারাও মারা যায়। এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে মৃত্যুভয়ে বাপেরাও ছেলের কাছে যায় না, ছেলেরাও বাপের কাছে যায় না। যে মহল্লায় এই ব্যাধি আরম্ভ হয় সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। একদিন সেখানে একটি অগ্নিকাণ্ডে তিন হাজার বাড়ী পুড়ে যায়। যখন এই ব্যাধির প্রভাব চরমে উঠেছে সেই সময় নগরের বাসিন্দারা দেখে তাদের দরজায় বৃত্ত আঁকা। তিনটি বৃত্ত। একটি বড়, তার ভেতরে একটি মাঝারি ও তার ভেতরে একটি ছোট। এই রকম বৃত্ত প্রতিটি বাড়ীতে, এমন কি মসজিদে পর্যন্ত দেখা যায়। যেদিন অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং এই বৃত্ত দেখা যায়—লোকে বলে সেই দিন থেকে প্লেগের প্রাদুর্ভাব কমে আসতে থাকে। ব্যাপারটি অদ্ভুত মনে করে এইখানে সেটা লিপিবদ্ধ করলাম। বুদ্ধির আইনে একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। আমার বিচারবুদ্ধিও এটাকে মেনে নিতে পারে না। আল্লা জানেন—সত্য কি? তবে একথা বিশ্বাস করি যে সর্বশক্তিমান আল্লা তাঁর পাপী ক্রীতদাসের ওপর অনুকম্পা প্রদর্শন করে তাদের এই বিপত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিদান করবেন।

১৮ই তারিখ মাহি নদীর তীরে বিশ্রামগ্রহণ করি। এইদিন জাম জমিদার আমার ভূমিচুম্বন করার সৌভাগ্যলাভ করেন। তাঁর নাম জুস্সা এবং উপাধি জাম। যিনি এই জমিদারির মালিক হন তাঁকেই 'জাম' বলা হয়। তিনি গুজরাটের একজন প্রধান জমিদার। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁর রাজ্য সমুদ্রের নিকটবর্তী। এই দিনেই বঙ্গ-প্রদেশ সংলগ্ন কুচবিহারের রাজা লছমীনারায়ণ আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পঁচিশ মোহর নজরানা দেন।

১৯শে শুক্রবার বিশ্রামের দিন। ২০শে শনিবার আমি ঝাহুদের পুষ্করিণীর তীরে। রবিবার সাড়ে চার ক্রোশ পথ চলে 'বদরওয়ালা' পুকুরের তীরে পৌঁছাই। এই পুকুরের ধারে একরকম গাছ দেখতে পেলাম। তার পাতা আঙ্গুল বা লাঠির ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই কুঁচকে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই আবার পাতা খোলে। পাতা দেখতে তেঁতুল পাতার মত। আরবিতে এর নাম 'সাজারু-ল-হায়া' অর্থাৎ লজ্জাবতী। হিন্দীতে একে বলে 'লাজবন্তী'। 'হায়'-এর অর্থ লজ্জা। এই গাছ বিশেষত্বহীন নিশ্চয়ই নয়। একে অনেকে বলে 'নাথ্জক'। এরকম গাছ নাকি শুকনো মাটিতে জন্মায়।

২২শে সোমবার বিশ্রামের দিন। শিকারীরা জানায় যে কাছাকাছি একটি বাঘ আছে। সে পথচলা মানুষদের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে। মধ্যাহ্নের পর এই বাঘ শিকার করতে যাই। এক গুলিতেই একে মেরে ফেলি। বাঘটি বড় হলেও এর চেয়েও বড় অনেক বাঘ মেরেছি। বড় বাঘের মধ্যে একটি মারি মাণ্ডু দুর্গে। সে বাঘটির ওজন ছিল সাড়ে আট মণ। এই বাঘটির ওজন হলো সাড়ে সাত মণ অর্থাৎ এক মণ কম।

২৩শে মঙ্গলবার আমি 'মানিব' নদীর তীরে, বুধবার 'নিমদার' তটে। বৃহস্পতিবার বিশ্রাম। ২৬শে শুক্রবার সাড়ে পাঁচ ক্রোশ পথ চলে থামি 'ঝালোদ' গ্রামে। শনিবার তিন ক্রোশ এগিয়ে বোদায় এবং রবিবার পাঁচ ক্রোশ পথ চলে 'দোহাদে' রাজকীয় পতাকা ওড়ে। জায়গাটি মালব ও গুজরাটের সীমান্তে।

পালওয়ান বাহাউদ্দিন একটি বানরশাবক (লেঙ্গুর) ও একটি ছাগল নিয়ে আসে। সে নিবেদন করে যে তার একজন নিশানাদার গাছের ওপর একটি স্ত্রী-লেঙ্গুরকে বাচ্চা কোলে নিয়ে একটা গাছের ডালে বসে থাকতে দেখে। এই নিষ্ঠুর লোকটি মা-টিকে গুলি করলে সে তার বাচ্চাটিকে একটা গাছের ডালে রেখে মাটিতে পড়ে মারা যায়। বাহাউদ্দিন পালওয়ান তখন বাচ্চাটিকে নিয়ে একটি ছাগীর পালে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাখে। ঈশ্বর ছাগীটিকে মাতৃস্নেহে অনুপ্রাণিত করেন। সে এই বানরশাবকের গা চাটতে এবং আদর করতে থাকে। জাতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সে এমন স্নেহ দেখাতে থাকে যাতে মনে হয় যে বানরশাবকটি তারই গর্ভজাত। আমি দুইটিকে পৃথক করে রাখতে বলি। কিন্তু ছাগীটি তৎক্ষণাৎ বিলাপ শুরু করে দেয়। লেঙ্গুর শাবকটিও অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে ওঠে। বানরের ভালবাসা ততটা বিচিত্র নয়। কেননা সে দুগ্ধপান করতে চায়। কিন্তু ছাগীর বানরশিশুর প্রতি বাৎসল্যভাব অতি অসাধারণ। বানরজাতির মধ্যে লেঙ্গুর একটি শ্রেণী। কিন্তু বানরের চুল পীতাভ, মুখের রং লাল। লেঙ্গুরের চুল সাদা আর মুখ কালো। লেজও বানরের লেজের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো এর বৈচিত্র্য। ২৯শে সোমবার বিশ্রাম নিই। সেদিন নীলগাই শিকার করতে যাই। দুইটি নীলগাই মারি। ৩০শে মঙ্গলবার এখানেই থেকে যাই।

(সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের দ্বাদশ বর্ষের বিবরণের সমাপ্তি)

পরিশিষ্ট

জাহাঙ্গীরনামায় মাসের নাম উল্লেখ করতে পারস্য দেশে চলতি ফারসী মাসের নামও দেওয়া হয়েছে। পারস্য দেশে প্রচলিত মাস এবং তার সমসাময়িক বাংলা ও ইংরাজি মাস এখানে দেখানো হলো।

ফারসী	বাংলা	ইংরাজি	ঋতু
১। ফারওয়ারদিন	চৈত্র	মার্চ-এপ্রিল	বসন্ত
২। উর্দিবিহিস্ত	বৈশাখ	এপ্রিল-মে	
৩। খুরদাদ	জ্যৈষ্ঠ	মে-জুন	
৪। তির	আষাঢ়	জুন-জুলাই	গ্রীষ্ম
৫। আমুরদাদ	শ্রাবণ	জুলাই-অগাস্ট	
৬। শাহরিয়ার	ভাদ্র	অগাস্ট-সেপ্টেম্বর	
৭। মিহর	আশ্বিন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	হেমন্ত
৮। আবন	কার্ত্তিক	অক্টোবর-নভেম্বর	
৯। আজর	অগ্রহায়ণ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	
১০। দাই	পৌষ	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	শীত
১১। বাহমন	মাঘ	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	
১২। ইস্ফানদারমুজ	ফাল্গুন	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	